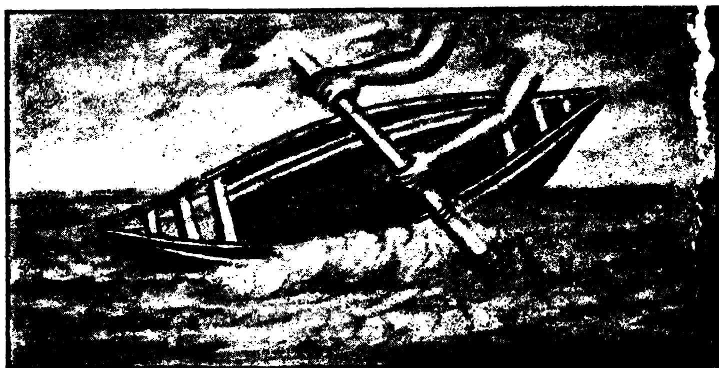
বিশ্বজনীন

ধর্ম্ম-নীতি-শিক্ষাসংস্কারাদি সম্বন্ধীয় বর্ত্তমান যুগোপযোগী

তত্ত্বমসি মঠের মুখপত্র



" সত্যমেব জয়তে নানৃতম্ "



৩য় বর্ষ—১ম সংখ্যা

বৈশাখ, ১৩৩৯ সাল।

Viswajanin

The Organ of Tattwamasi Math.

সম্পাদক—স্বামী নির্ব্বাণানন্দ

বিশ্বজনীন কার্য্যালয়।

[redacted] ৩২।১ রাজা দিনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রতি [redacted]

সূচীপত্র

"বিশ্বজনীন" এর নিয়মাবলী।

বিশ্বজনীনঃ—তত্ত্বমসি মঠের মুখপত্র। ধর্ম্ম, নীতি, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয় ইহাতে সাধারণতঃ আলোচিত হয়। বৈশাখে বর্ষারম্ভ। প্রতি মাসে শেষ সপ্তাহে বাহির হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ দুই টাকা। ভিঃ পিঃতে ২।০ দুই টাকা চারি আনা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ তিন আনা। নমুনার জন্য ৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়।

কোন গ্রাহক কোন মাসের কাগজ না পাইলে, পর মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে ডাক ঘরে অনুসন্ধান করিয়া ডাক বিভাগের উত্তর সহ পত্র লিখিলে উহা বিনামূল্যে পাইতে পারিবেন। অন্যথা মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হইবে। পত্র ব্যবহার কালে গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন। উহা পত্রিকার মোড়কের উপর লেখা থাকে।

লেখকগণের প্রতি নিবেদন, প্রবন্ধের সহিত নিজ নিজ নাম, উপাধি, ঠিকানা প্রভৃতি স্পষ্টরূপে লিখিয়া দিবেন। উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প দেওয়া থাকিলে, প্রবন্ধ মনোনীত হওয়ার সংবাদ ; অথবা অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয়। যে প্রবন্ধের সহিত ষ্ট্যাম্প না থাকে, সে প্রবন্ধ সম্বন্ধে লেখকগণ পরে রিপ্লাই কার্ড লিখিলে আমরা তাহার উত্তর দিতে অক্ষম, কারণ অমনোনীত প্রবন্ধ ছিঁড়িয়া ফেলা হয়। নকল রাখিয়া প্রবন্ধ পাঠাইবেন।

বিশ্বজনীন সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে, রিপ্লাই কার্ড বা ষ্ট্যাম্পসহ কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র লিখিতে হয়।

বিশ্বজনীন কার্য্যালয়,
৩২।১ রাজা দিনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কার্য্যাধ্যক্ষ
ব্রহ্মচারী নির্ম্মলচৈতন্য।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-
শ্রীচরণ ভরসা।

বিশ্বজনীন।

৩য় বর্ষ } বৈশাখ ১৩৩৯ { ১ম সংখ্যা

সামবেদ-সংহিতা।

ছন্দ আর্চ্চিকঃ। কৌথুমী শাখা। আগ্নেয়ং পর্ব্ব। ১প, ১অ, ১খ, ১প্র, ১০দ।

সোম৺রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে।
আদিত্যং বিষ্ণু৺সূর্য্যং ব্রহ্মাণং চ বৃহস্পতিং॥ ১।

হে সৌম্য করুণাধার! জ্ঞানময় পুরুষ প্রধান।
সর্ব্বদেবময় তুমি করি যেন তোমার সম্মান॥
সর্ব্বভাবে সর্ব্বরূপে পূজা যেন করি গো তোমার।
মম চিত্ত পাশমুক্ত কর দেব, করুণা আগার॥

ইত এত উদারুহন্ দিবঃ পৃষ্ঠান্যারুহন্।
প্র ভূর্জ্জয়ো যথা পথোদ্যামঙ্গিরসো যযুঃ॥ ২।

নানাপথে নরগণ গ্রামান্তরে করয়ে গমন।
নানাভাবে জ্ঞানিগণ তোমা ধনে করেন পূজন॥
আত্মকর্ম্ম করি যেন পাই মোরা তব পুণ্যালোক।
যে ধনে হইয়া ধনী ভুলে ভক্ত সর্ব্ব দুঃখ শোক॥

রায়ে অগ্নে মহে ত্বা দানায় সমিধীমহি।
ঈড়িষ্বা হি মহে বৃষন্‌দ্যাবা হোত্রায় পৃথিবী ॥ ৩।

পরম কল্যাণকর হে দেবতা ! কর জ্ঞান দান
ইহ পর হিত হেতু তোমারেই করিব সম্মান ॥
সর্ব্ব দেবভাব আজি মম হৃদে করগো সঞ্চার।
জয় জয় জ্ঞানদেব, কল্পতরু কৃপা পারাবার

দধগ্নে বা যদীমনু বোচদ্‌ব্রহ্মেতি বেরুবৎ ।
পরি বিশ্বানি কাব্যা নেমিশ্চক্রমিবভূবৎ ॥ ২।

লও দেব লও দেব আমাদের ভক্তি উপহার।
কর দান শুদ্ধসত্ত্ব বরণীয় প্রসাদ তোমার ॥
বিবেক বৈরাগ্য ভক্তি জ্ঞানিগণ চিত্তের ভূষণ।
তোমার প্রদত্ত তাহা আমরাও করি আরাধন

প্রত্যগ্নে হরসা হরঃ শৃণাহি বিশ্বতস্পরি।
যাতুধানস্য রক্ষসো বলং ন্যুব্জ বীর্য্যং ॥ ৫ ।

অমিত প্রভাবশালি জ্ঞানদেব শত্রুবীর্য্য হর।
অন্তঃশত্রু বহিঃশত্রু নাশ কর ওগো শুভকর ॥
সদ্ভাবে ভূষিত কর নাশি মোর কুমতি কলাপ।
কবে গো কৃতার্থ হব লভি তব মধুর আলাপ ॥

ত্বমগ্নে বসূঁ্‌রিহ রুদ্রাঁ্‌ আদিত্যাঁ্‌ উত।
যজা সধ্বরং জনং মনুজাতং ঘৃত প্রুষং ॥ ৬।

সুপ্রতিষ্ঠ হও দেব হৃদিনাথ হৃদয় মাঝার।
তোমার দর্শন দানে জুড়াবে কি হৃদয় আমার ॥
রুদ্র বসু আদিত্যাদি লোভনীয় ভাব সমুদয়।
বিকাশ করিয়া নাথ মম হৃদে হও হে উদয় ॥

নববর্ষের কর্ত্তব্য।

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥"

হে ভূভারহরণ, ভূলোকতারণ সর্ব্বময় দেবতা! তুমি স্বীয় মায়াশক্তিবলে লীলাচ্ছলে শিবশক্তি, সীতারাম, রাধাকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ, সারদেশ্বরী কত রূপেই না প্রকট হইলে। ভবপারাবারতারক, কৃপাসিন্ধো! তুমি ভক্তের ভক্তিসুধা পানে পরিতৃপ্ত হইয়া যুগে যুগে কতভাবে কতবার মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা, সখা, প্রভু, গুরু প্রভৃতি কতরূপে শরণাগত কৃপাপ্রার্থী মানবসংঘের মাঝে সমুদিত হইলে। ভক্ত-অভক্ত, অজ্ঞ-জ্ঞানী, ধনী-নির্ধন-সকলকে সমানভাবে আপনার করিয়া সমুদ্ধার করিলে। স্বয়ং অযোনি-সম্ভব হইয়াও দেব, নর, পশু প্রভৃতি কতরূপ ধারণ করিলে। জগতের গতিমুক্তির জন্য কত নব নব সুন্দর প্রণালী প্রদর্শন করিলে। হে সশক্তিক শ্রীরামকৃষ্ণরূপী সর্ব্বময় দেবতা! তুমি নিত্য বিরাজমান; তুমি নিত্য প্রকট। তুমি আমাদিগের বুদ্ধির গোচর হও। আজ নববর্ষের প্রারম্ভে তুমি আমাদিগের আরব্ধ কর্ম্মকে পরিসমাপ্তির অভিমুখে পরিচালিত কর। কৃপাময়! আশীর্ব্বাদ কর যেন আমাদের পথ মঙ্গলময় হয়।

আজ নববর্ষ। ১৩৩৮ সাল অনন্তকালের স্রোতে মিশিয়া গিয়াছে আর ফিরিয়া আসিবে না। দেখিতে দেখিতে ৩৬৫ দিন পরে এ বৎসরও অনন্তকালের গর্ভে নিপতিত হইবে। এইরূপে একটীর পর একটী বৎসর আসিবে ও চলিয়া যাইবে। প্রত্যেক বৎসরেরই কিছু দেবার আছে। বর্ষ নিরপেক্ষ। ইহা কাহারও প্রতি প্রীত বা রুষ্ট নয়। মানুষ যেমন কর্ম্ম করে, বর্ষ তাহাকে তাহার কর্ম্মানুযায়ী সুফল বা কুফল প্রদান করে। এই সুখ-দুঃখ বিজড়িত বর্ষটী চলিয়া যাইলে মানব ইহার ফলাফল চিন্তা করে। তাই নববর্ষের শুভ প্রথমদিন মানবগণ পূতদেহে শুদ্ধচিত্তে সম্বৎসরের সুফল কামনা করে আর গত বৎসরের হিসাব নিকাশ করিয়া তাহার ফলাফল জানিতে পারে।

প্রভুর কৃপায় "বিশ্বজনীন" তাহার দ্বিতীয় বৎসর অতিক্রম করিয়া আজ তৃতীয় বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। বিশ্বের সহিত একীভূত হইয়া সেও আজ তাহার অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কার্য্যাবলী আলোচনা করিতেছে। বিশ্বের কল্যাণ হউক; বিশ্ববাসী নিরাময় হউক; বিশ্বময় সাম্য, মৈত্রী, প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হউক; জীবগণ শিবত্ব লাভ করুক; অনাথ সনাথ হউক; নিরাশ্রয় আশ্রয় লাভ করুক; ক্ষুধিত অন্ন, রোগী আরোগ্য, অজ্ঞ জ্ঞানধন, পীড়িত শান্তি, অভাবগ্রস্ত সম্পদ্, শ্রদ্ধাহীন স্পর্শমণি ভক্তিরত্ন লাভ করুক, দেবতার জয় হউক, মানবকুল স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হউক; পশুদিগের তমোভাব বিদূরিত হউক, ধর্ম্মের প্রভাব অক্ষুণ্ণ হউক, আধিব্যাধি সব বিনষ্ট হউক, ধর্ম্ম সমন্বয় প্রবল হউক; প্রকৃতিময় "তত্ত্বমসি" মহামন্ত্র প্রতিধ্বনিত হউব—"বিশ্বজনীন" বিশ্বের সহিত সমকণ্ঠে প্রভুর শ্রীচরণে ইহাই প্রার্থনা করিতেছে। বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ তাহার ইচ্ছা পূর্ণ করুন। ধর্ম্মের তরণী ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয় সত্য কিন্তু তার সিদ্ধিকাঙ্ক্ষ লক্ষ্যলাভ সুনিশ্চিত কেন না স্বয়ংই প্রভুই তার কর্ণধার।

ব্যষ্টি লইয়া সমষ্টির সৃষ্টি। ব্যষ্টির উন্নতি না হইলে কখনই সমষ্টির উন্নতি হয় না। আমাদিগের প্রত্যেককে স্ব স্ব জীবন উন্নত ও মহান্ করিতে হইবে; তাহার ফলেই সমগ্র জাতি, সমগ্র সমাজ, সমগ্র দেশ, সমগ্র জগতের উন্নতি সাধিত হইবে। কর্ত্তব্য-পালনই উন্নতির সোপান। আমাদিগের কর্ত্তব্য—মানবজীবনের উদ্দেশ্য স্মরণ করিয়া, তাহাকে প্রতিপালন করিয়া জীবনের মহাব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইবে। এই মহাব্রত কি দেখা যাউক ?

মানব ভগবানের শ্রেষ্ঠ জীব। তাহার হিতাহিত বিবেচনাশক্তি আছে। পশুর তাহা নাই। মানব সৎপথে চলিয়া নিজ নিজ বিবেকবাণীর অনুশীলন দ্বারা দেবতার পদ লাভ করিতে পারে; পশুরা তাহা পারে না। পশুতে মানবে বিস্তর প্রভেদ। সুতরাং পশুর ধর্ম্ম মানবের ধর্ম্ম হইতে পারে না। পশুর জীবনের ব্রত-আহার, বিহার, ভয় ও মৈথুন। মানবের তাহা কখনই জীবনের ব্রত হইতে পারে না। প্রত্যেক বিচক্ষণ ব্যক্তিই পশুজীবন যাপন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। তাহারা পশুজীবনে পরিতৃপ্ত না হইয়া "আরো কিছু"কে জীবনের লক্ষ্য করিয়া

জানিয়াছেন ও তাহারই অনুসরণ করিতেছেন। "বিশ্বজনীন"ও আহারাদি হইতে অতিরিক্ত সেই "আরো কিছু" শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মকে মানবের ধর্ম্ম বলিয়া আজ প্রচার করিতে উদ্গ্রীব। সেই "আরো কিছু" কর্ম্ম কি? (১) জীবসেবা (২) নারায়ণে ভক্তি। জগতের হিতসাধন ও আত্মমোক্ষ; নিজে প্রকৃত মানুষ হওয়া ও অপরের মনুষ্যত্ব লাভে সহায়তা করা।

অজ্ঞানান্ধ ভ্রান্তচিত্ত মানবমন সদসদ্‌বিচারবিহীন; তাহার অন্তর্দৃষ্টি নাই। সে সদসদ্‌বিচারবিহীন। প্রবৃত্তিমার্গ পশুধর্ম্ম তাহার স্বতঃই রুচিকর। তাহাকে সংস্কৃত হইতে হইবে। প্রবৃত্তিপথ পরিত্যাগ করিয়া সংযম অভ্যাস করিতে হইবে। সংযম ও সংস্কার প্রভাবে স্থায়ী শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে হইলে তাহাকে সর্ব্বপ্রথম গুরুজনে শ্রদ্ধা শিক্ষা করিতে হইবে। "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং, তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ জ্ঞানং; লব্ধ্বা পরাং শান্তিম চিরেণাধিগচ্ছতি।" শ্রদ্ধাবান্ একাগ্রচিত্ত সংযত ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করেন। জ্ঞানপ্রভাবে মানব স্থায়ী শান্তির অধিকারী হয়। গুরুজনে শ্রদ্ধা শিক্ষা করিতে হইলে, চরিত্রবান্ বিদ্যানুরাগী ও স্বার্থত্যাগী হইতে হইবে। অসচ্চরিত্র বিদ্যাবিমুখ স্বার্থ সর্ব্বস্ব ব্যক্তি কখন শ্রদ্ধাধন লাভ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি আপনার গুরুজনের প্রতি ভক্তি ও সম্মাননা প্রদর্শন করেন না, সে কিরূপে জীবের সেবা করিতে পারিবে সুতরাং তাহার দ্বারা জীবসেবা বা দেবসেবা কিছুই সম্পন্ন হয় না। এরূপ ব্যক্তি ঈশ্বরকৃপা লাভ করিতে পারে না। শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি জীবসেবা-পরায়ণ ও ভগবদ্ভক্ত সুতরাং ভগবৎকৃপা লাভ করিয়া তিনি স্বীয় জীবন সার্থক করেন। তাহার মহত্ত্ব ও উদারতা সকলের আদর্শ। কামক্রোধাদি জীববৃত্তিসমূহ তাহার হৃদয়কে কলুষিত করিতে পারে না। কর্ত্তব্যের পথে তিনি বিভীষিকা দর্শন করেন না। সদালাপ, সৎসঙ্গ, সদভ্যাস প্রভৃতি দেবোচিত গুণসমূহ তাহার চরিত্রের ভূষণ। বিদ্যার আলোকে তাহার হৃদয় দীপ্ত। কলহ বিবাদ বিসংবাদ তাহার অন্তরে স্থান পায় না। একপক্ষে যেমন আত্মসংস্কার এবং আত্মোন্নতি চেষ্টার অভিপ্রায় তাহার হৃদয়কে অধিকার করে, অপরপক্ষে সর্ব্বভূতে সহানুভূতি ও ধর্ম্ম-প্রাণতা তাহার চিন্তার একমাত্র বিষয় হইয়া পড়ে। বিষয় সম্পদ্ বা অর্থাভাব, অনুকূল বা প্রতিকূল কোনরূপ অবস্থা তাহার পরোপকারপ্রবৃত্তিকে বিনষ্ট করিতে পারে না। মাতার চিন্তা ও ভালবাসা সকল সন্তানের প্রতি বর্ত্তমান থাকিলেও উহা যেমন সমগ্রভাবে বা বিপুলভাবে সুস্থ সন্তানের মঙ্গল কামনায় নিয়োজিত হয়,

তদ্রূপ সদ্ব্যক্তির যথাবস্থিত শারীরিক, মানসিক বা আর্থিক শক্তি তেলা মাথায় তেল না দিয়া—যথার্থ সাহায্যপ্রার্থীর অভাবমোচনের জন্য ব্যয়িত হয়। তাহাতে তিনি আপনাকে ধন্য মনে করেন। তাহার ত্যাগের গভীরতা ও অকপটতা দেখিয়া ভগবান্ তাহার শক্তি ও সম্পদ্ সকলই বর্দ্ধিত করিয়া দেন। কারণ সৎব্যক্তি সাধারণের সেবক।

সকল দেশেই চাষাভূষা, তাঁতি প্রভৃতি জাতি যাহাদের আমরা নগণ্য ও ঘৃণার পাত্র মনে করি, তাহারাই চিরকাল হাসিমুখে অনন্ত সহিষ্ণুতা ও অপার প্রীতির সহিত কষ্টকর ছোট ছোট কাজগুলি লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রাণপাত করিয়া সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন। বড় বড় কাজে, দশজনের সম্মুখে যশোলাভের আশায় সকলেই বীর সাজেন। কিন্তু ছোট ছোট নিত্য প্রয়োজনীয় কাজ করার ভার, অত্যাবশ্যক অভাবগুলি পরিপূর্ণ করিবার ভার আমাদিগের উপেক্ষিত তথাকথিত ঘৃণিত ব্যক্তিগণই করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে বিদ্যা ও শক্তি প্রবেশ করান, স্বাস্থ্য ও সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি সাধনা একান্ত আবশ্যক। তাহারা জাতীয়তা তথা মানবজাতির মেরুদণ্ড স্বরূপ। যে দেশ যে পরিমাণে ইহাদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন, তাহারা তত উন্নত। দেশে দেশে পল্লীতে পল্লীতে ঘৃণিত ও দুর্দ্দশাপন্ন ব্যক্তিগণের উন্নতি-প্রার্থী কর্ম্মবীরের আবির্ভাব হউক।

আর এককথা, সকল উন্নতির মূলাধার ধর্ম্মপ্রাণতা। যাহাতে স্বধর্ম্মে বিশ্বাস ও নিষ্ঠা বৃদ্ধি পায়, ধর্ম্মবিদ্বেষভাব দূর হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পবিত্রতা, সততা ইত্যাদি গুণসকল কোন ধর্ম্মের একচেটিয়া সম্পদ্ নয়। উহা সর্ব্বধর্ম্মের সাধারণ সম্পত্তি। ধর্ম্মমূলক উন্নতি দোষবর্জ্জিত ও কালের কঠোর আঘাতে বিনষ্ট হয় না। তাই ধর্ম্মকেই কর্ণধারস্বরূপ স্মরণ করিয়া কর্ত্তব্যকর্ম্মময় সংসারসমুদ্রে অবতীর্ণ হইতে হয়।

নববর্ষের কর্ম্মক্ষেত্র আজ বিশাল ও বিপুলায়তন হইয়া আমাদিগের সম্মুখে প্রসারিত হইয়াছে। আমাদিগের কর্ম্মক্ষেত্র কর্ম্মবন্ধন নহে, উহা আমাদের সাধনা, উহা নিঃকাম নিঃস্বার্থ পরোপকারব্রত বা সেবাধর্ম্ম। ভগবান্ আমাদিগকে উক্ত কর্ম্ম সাধনার জন্য নির্ব্বাচিত করিয়াছেন, তাহার অধিকার প্রদান করিয়াছেন, দুর্লভ মানবজন্ম দান করিয়াছেন, তাই আমরা মনে প্রাণে মহা গৌরব ও সৌভাগ্য অনুভব করি। এই গৌরব ও সৌভাগ্যের অধিকারী আমরা, আমাদের বন্ধুবর্গ, বিশ্বজনীনের

গ্রাহক, অনুগ্রাহক, লেখক, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ ও বিশ্ববাসী প্রত্যেক মানব। আমরা জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল সহৃদয় নর-নারীকে উক্ত সদানুষ্ঠান সাধনের জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছি। প্রভু! আমাদের কর্ম্ম দাও। কর্ম্মেই আমাদের অধিকার, ফলে নহে। প্রভু! আমাদের উদ্বুদ্ধ কর, বিকশিত কর, ক্ষুদ্র আমিত্বের দিক হইতে বিশ্বের দিকে ফিরিতে ও দেখিতে শিক্ষা দাও। ওঁ তৎসৎ।

—:*:—

শ্রীশ্রীতুকারাম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বাল্যজীবন:—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভক্তিপ্রাণতা তুকারামের পূর্ব্বপুরুষগণের বিশিষ্টতা। তাঁহারা ভক্তি ও ভাবের জন্য দেবতার প্রিয় ও জনসাধারণের বিশেষ সম্মানের পাত্র হইয়াছিলেন। তুকারামের মাতাপিতাও তাহাদিগের কুলপ্রথানুযায়ী প্রতিদিন যথারীতি দেব দ্বিজ অতিথি প্রভৃতি সকলের সেবা করিতেন। সাধারণ ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানবের ন্যায় তাহারা ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া কখনই ঈশ্বরকে ভুলিয়া যান নাই। সংসারের কর্ম্মময়জীবন, ব্যবসায়, বাণিজ্য, লোকব্যবহার তাহাদিগের স্বভাবজ সদ্ভাবকে কিছুতেই ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। মাতাপিতার জীবন্ত ও চাক্ষুষ মহাদর্শ তাহাদিগের সন্তানগণের জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বাল্যকাল হইতে তুকারামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সংসারে উদাসী। দেবসেবা, সাধুসঙ্গ, পরোপকার প্রভৃতি তাহার জীবনের ব্রত ছিল। পিতার আদেশে তিনি দারপরিগ্রহ করিলেও সংসারে তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হইল না। জ্যেষ্ঠ পুত্রকে গৃহকর্ম্মে উদাসীন দেখিয়া পিতা বোল্হোবা তদীয় দ্বিতীয় পুত্র তুকারামের হস্তে গৃহকর্ম্মের ভারার্পণ করিলেন। তখন তাহার বয়স মাত্র ত্রয়োদশবর্ষ। তুকারাম অল্পবয়স্ক হইলেও গৃহকর্ম্মসমূহ সম্পন্ন করিতে ও পিতার ব্যবসায়ে সাহায্য প্রদান করিতে বিশেষ পটু ছিলেন। অল্পবয়সে তাহার কার্য্যদক্ষতা

দেখিয়া সকলেই তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করিত। এ ছাড়া, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের বংশগত হরিভক্তি, সাধুসেবা, ব্রাহ্মণে শ্রদ্ধা ও পরোপকার প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

তুকারামের দুই বিবাহ। প্রথম পত্নী রুক্মাবাঈ কাশরোগগ্রস্ত ছিলেন; এ কারণে তুকারাম দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। তাহার উভয় পত্নী ধর্ম্মভীরু ও গৃহকর্ম্মে নিপুণ ছিলেন। তাহার দ্বিতীয় পত্নী জিজিবাঈ তাহার সহিত কখন কখন কলহ করিলেও তাহার উদ্দেশ্য অতি সৎ ও উদার ছিল।

তুকারাম যখন সপ্তদশ বর্ষে পদার্পণ করিলেন, তখন তাহার পিতৃবিয়োগ হয়। এই ঘটনার কয়েক মাস পরে তাহার জননী ও পশ্চাৎ তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। মাতাপিতা ও স্ত্রী বিয়োগে তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সংসারবন্ধন মুক্ত হইয়া গৃহত্যাগপূর্ব্বক তীর্থপর্য্যটন, সাধুসঙ্গ ও ধর্ম্মচর্চ্চার উদ্দেশ্যে বহির্গত হইলেন। মাতাপিতা ভ্রাতৃজায়াও জ্যেষ্ঠভ্রাতার গৃহত্যাগে তিনি বিশেষ মর্ম্মাহত হন। এক্ষণে কনিষ্ঠ ভ্রাতাভগিনী সংসারের কার্য্য ও কৌলিক ব্যবসায় প্রভৃতি সকল কর্ম্মের ভার তাহার স্কন্ধে নিপতিত হইল। এইবার তাহার জীবনে এক নূতন পটপরিবর্ত্তন হইল। পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত সুখস্বচ্ছন্দতার কোলে লালিত পালিত হইয়া অভাব দুঃখ কষ্ট শোক ইত্যাদি কাহাকে বলে, তিনি তাহা জানিতেন না। এক্ষণে এককালে এক বৎসরের মধ্যে মাতাপিতার বিয়োগাদি নানা দুর্ঘটনা আসিয়া ব্যবসায়ও এ সময় হইতে অবনত হইতে লাগিল। এইবার তাহার সৌভাগ্যে ভাঁটা পড়িল। ফলে তাহার লুপ্তপ্রায় আচ্ছন্ন জন্মগত বৈরাগ্য ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। এক্ষণে তিনি স্পষ্টতঃ সংসারের অনিত্যতা, বিশেষরূপে বুঝিতে শিখিলেন। বাধা পাইলে পার্ব্বত্য নদীর প্রবাহবেগ যেমন অধিকতর বলশালী ও তেজীয়ান হয়, তদ্রূপ তাহার চিত্তের শুদ্ধভাব, বিপত্তিরূপ সংসারানলে দগ্ধ হইয়া, স্বর্ণের ন্যায় মলমুক্ত হইয়া বিকশিত হইতে লাগিল। বিপদ্ তাহার সম্পদের কার্য্য করিতে লাগিল। তিনি পার্থিব সম্পত্তি ও সুখভোগ হইতে ভ্রষ্ট হইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু ইহা তাহাকে পরমার্থ ধনলাভে প্রয়াসী করিল। তাহার বিষয়াসক্তির গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া উহা ঈশ্বরাভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল। সুখের মধ্যে সাধনভজনে বহু বিঘ্ন আছে বলিয়া কি পরমেশ্বর তাহাকে সুখের পিচ্ছিল পথ হইতে ফিরাইয়া দুঃখের পথে চালিত করিতে লাগিলেন? দুঃখ তুকারামের অশেষ মঙ্গল সাধন

করিল। তিনি তাঁহার ইষ্টের শ্রীচরণ বিশেষরূপে আশ্রয় করিলেন। সংসারের মায়া মমতা সমূলে পরিত্যাগ করতঃ তিনি ধর্ম্মজীবন যাপন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এখন হইতে তিনি অন্য ধরণের মানুষ হইলেন। ব্যবসায়ে আর মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না। ফলতঃ ব্যবসায়ের বিশেষ ক্ষতি হইতে লাগিল। পরের দুঃখ এখন তাহাকে বিশেষরূপে অভিভূত করিতে লাগিল। যদি ক্রেতারা কৃত্রিম সাংসারিক দুঃখ বর্ণনা করিয়া কোন বস্তুর স্বল্পমূল্য দান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিত, তাহা হইলে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও অধমর্ণের কল্পিত দুঃখ দূর করিবার জন্য স্বল্পমূল্যে বা বিনামূল্যে তাহার পণ্যদ্রব্য দ্বারা তাহাদিগকে সাহায্য করিতেন। অল্পকাল মধ্যে তিনি ব্যবসায়ে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। তাহার পৈত্রিক ব্যবসায় নষ্ট হইয়া গেল। অনন্যোপায় হইয়া তিনি মুদিখানার দোকান খুলিলেন। কিন্তু ইহাতেও তাহার বিশেষ সুবিধা হইল না। তিনি কোনরূপে তাহার পূর্ব্বাবস্থা লাভ করিতে পারিলেন না। তাহার কারণ তাহার ব্যবসায়ের রীতি সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র। তিনি ব্যবসায়ী কিন্তু ব্যবসায়ের ক্ষতি বৃদ্ধির প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই; তিনি ক্রেতাদিগের কষ্ট নিবারণ করিবার জন্য নিজ পণ্যদ্রব্য দ্বারা তাহাদিগকে সাহায্য করিতে ব্যস্ত সুতরাং এরূপ ব্যবসায় কিছুতেই স্থায়ী বা শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন হইতে পারে না। তাহার মুদিখানার দোকান লোপ পাইল। লক্ষ্মী চিরকাল চপলার ন্যায় চঞ্চলা। তাহার উপর সেবক তাহার পূজায় বিমুখ। "একে মনসা, তার উপর ধুনার গন্ধ।"

(ক্রমশঃ)

ভগবৎপ্রাপক।

গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমুখে বলিয়াছেন, প্রেমভক্তিই ভগবৎপ্রাপক। আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না, আমি যোগিগণের হৃদয়ে থাকি না, আমার ভক্ত যেখানে থাকেন, আমি সেইখানে বসবাস করি। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলিতেন, ভক্তহৃদয়ই ভগবানের বৈঠকখানা। তাহার হৃদয়েই ভগবান্ বিরাজ করেন, সেখানে তিনি লীলাভিনয়

করিয়া থাকেন। সর্ব্বশাস্ত্রে ভক্তির মাহাত্ম্য উচ্চরূপে প্রশংসিত হইয়াছে। বৈষ্ণব সাধকগণও তাই কীর্ত্তন করিয়াছেন :—

আমি মুক্তি দিতে কাতর নই, আমি ভক্তি দিতে কাতর হই।
আমার ভক্তি যেবা পায়, তারে কেবা পায়, সে যে সেবা পায়, হয়ে ত্রিলোকবিজয়ী।
শুন চন্দ্রাবলী ভক্তির কথা কই, মুক্তি মিলে কভু, ভক্তি মিলে কই।
আমি ভক্তির কারণে বলির দুয়ারে দ্বারী হয়ে সদা রই।

ভগবানের প্রতি অনুরাগের নাম ভক্তি। আত্মসুখেচ্ছার নাম কাম। ঈশ্বরে প্রীতির নাম প্রেমভক্তি। প্রেমভক্তির সাহায্যে সাধক ঈশ্বরকে লাভ করিয়া থাকেন। প্রেমের দুইটী লক্ষণ:—প্রথমতঃ, আত্মদেহের সুখের প্রতি বিরাগ বা বিস্মরণ; দ্বিতীয়তঃ জগৎ বিস্মরণ; মাত্র ইষ্টানুধ্যানই বর্ত্তমান। অপর কোন চিন্তা নাই। প্রেমভক্তিই ভগবানকে মিলাইয়া দেয়। ভক্তিহীন আচার বিচার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইলেও উহা কোন কাজে লাগে না। আচার বিচার যাহার নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহারই পূজা ও সেবা, দর্শন ও গুণগান আমাদের কামনার বিষয়। আচারাদি অনুষ্ঠানপূর্ব্বক আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলে জীবন সফল হইবে না; জীবনের উদ্দেশ্য, পরমপুরুষার্থ—শ্রদ্ধাভক্তি লাভ। এই মর্ম্মে পরমভক্তিমতী সাধিকা মীরাবাই বলিয়াছেন :—

নিত্যস্নানে যদি হরি মিলে, তবে জল জন্তুর মিলিবে।
ফলমূল খেলে যদি হরি মিলে, বাদুড় বানরে পাইবে॥
ঘাস খেলে যদি হরি মিলে, তবে পাবে যত মৃগ অজা।
স্ত্রী পরিহরি যদি হরি মিলে, আছে তো অনেক খোজা॥
দুধ খেলে যদি হরি মিলে, পাবে বাছুর বালক-বালা।
মীরা কহিতেছেন, প্রেম বিনা নাহি মিলে কভু নন্দলালা॥

কাশীবাস বা অরণ্যবাস, মস্তকমুণ্ডন বা জটাধারণ, এ সকল বাহ্যিক অনুষ্ঠান কথনই ভগবান্ লাভের উপায় নয়। ঈশ্বরলাভ করিতে হইলে তাঁহার ভজন আবশ্যক। অকপটভাবে, কাতরস্বরে তাঁহাকে ডাক। অশ্রুতে বক্ষ ভাসিয়া যাউক, তাঁহার বিরহে জীবন মরুময়—প্রাণে প্রাণে ইহা অনুভব কর; তাহা হইলে অবশ্যই ঈশ্বর তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।

প্রাতঃস্মরণীয় লোকগুরু মহাত্মা কবীর বলিয়াছেন :—

কবীর ! ইহ্‌তনকো দীয়ালা করো, বাতী মেলো জীউ।
লছমী যো তৈল কবি, তব মুখ দেখোগে পিউ ॥

এ দেহকে প্রদীপ কর, জীবনকে সলিতা কর, শোণিতকে তৈল কর, তাহা হইলে প্রিয়ের মুখ দর্শন করিতে পারিবে। তীব্র জীবনব্যাপী অনুরাগে এ প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিলে তাহার দিব্য আলোকে প্রিয়তমের শ্রীমুখ দর্শন করিতে পারিবে। সৎনাম লাঙ্গলে দেহক্ষেত্র কর্ষণ করিলেও তাহাতে ঈশ্বরের নামস্মরণবীজ বপন করিলে, উহারদ্বারা নিশ্চয়ই পরম মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। যদিও সসাগরা এই ধরা শুকাইয়া যায়, তথাপি ভক্তিবীজ কখনও বৃথা হয় না। সত্য ভক্তিবীজ কখনও মিথ্যা হইবার নয়। কাঞ্চন বিষ্ঠায় পড়িলেও তাহার মূল্য কখনই হ্রাস পায় না। ভক্তিমান্ ধর্ম্মব্যাধ, গুহক চণ্ডাল, চণ্ডালী শবরী, ইহারা ভক্তির পরম সাধক ও ভক্ত জগতের পূজনীয়। ভক্তি বয়স বিচার করে না। বালক ধ্রুব ও প্রহ্লাদ—ইহারা কুমার তপস্বীর শিরঃস্থানীয়। পরমহংস রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, ভ্রান্তে, অভ্রান্তে, জ্ঞাস্তে, অজ্ঞাস্তে যে কোনরূপে একবার জলে পড়িয়া গেলে, জল যেমন তাহাকে সিক্ত করে, তদ্রূপ যে কোনরূপে ভগবানের নাম গ্রহণ কর না কেন, নামের অমোঘ প্রতাপ ভক্তের ইহপর-কালের মঙ্গল সাধন করিবে। অনুরাগের সহিত দেবতার পূজা করিলে অবশ্যই তাঁর কৃপা লাভ করা যায়, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিশ্বাস।

তোমার প্রকৃত স্বরূপ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

হে আত্মরূপী মানব ! সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বভাবে সর্ব্বকর্ম্মের মধ্যে তুমি সর্ব্বদাই তোমার প্রকৃত স্বরূপ-শান্তিময় চিন্মাত্র আত্মদেবের পূজা করিতেছ। যখন তুমি কোন কাজ কর বা কর না, তখনও তাহার দ্বারা তোমার আত্মদেবের পূজা সাধিত হয়। আত্মদেব এইরূপে সকলকালে সকল অবস্থাতে পারমার্থিকভাবে পূজিত হইয়া প্রচুর আনন্দ

প্রাপ্ত হইয়া মায়ামুক্ত হন। যেমন বহ্নি হইতে বহ্নিকণা পৃথক্ নহে, তদ্রূপ রাগদ্বেষাদি-ভাব, সৌভাগ্য বা দারিদ্র্য, এ সকল ভাবও আত্মদেব হইতে অপৃথক্। এক আত্মা হইতে জাগ্রতাদিভাব—এই নিখিল প্রপঞ্চ সকলই বিবর্ত্তিত হইয়াছে। তাহার সত্তাতে জগতের সত্তা। এই বিশ্ব আত্মাতে পরিপূর্ণ, সকলই আত্মময়। আত্মা হইতে পৃথক্ পরিচ্ছন্ন কোন দেবতা নাই। যাহারা পরমেশ্বরকে দেশকালে পরিচ্ছন্ন বলিয়া কল্পনা করেন, তাহাদিগকেই উপদেশ দিতে হয়। যাহারা দেখেন, ঈশ্বর ত্রিজগতে প্রসারিত, তাহারা উপদেশের অপেক্ষা করেন না। হে নরদেবতা! তুমি বিষয়াসক্তিশূন্য হইয়া তোমার সম, শান্ত স্বচ্ছ স্বরূপের উপাসনা কর। তিনি অনাদি ও অনন্ত; তিনি অনাভাস বা স্বয়ংজ্যোতি। তিনি সৎ অথচ কিছু নহেন, এ কারণে বোধ হয়, তিনি যেন অকিঞ্চিৎ। ব্রহ্মাকারকারিত সাত্ত্বিকভাবে পরিণত বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা কল্পিত মায়াবরণ ভঙ্গ করিতে হয়। এ আবরণ ভঙ্গ হইলে ব্রহ্মবস্তু স্বয়ং প্রকাশ-মান হন। যিনি মুমুক্ষু, তিনি শমদমাদি সাধনবলে সাত্ত্বিক অবিদ্যাংশরূপে পরিণত হইয়া সৎশাস্ত্র, সদ্‌গুরু ও সৎসঙ্গরূপ সাত্ত্বিক অবিদ্যাংশের সাহায্যে আপন অবিদ্যাংশ ক্ষালণ করিয়া থাকেন। হস্তে অঙ্গারাদি ঘর্ষণ করিয়া প্রথম হস্তকে মলিন করিয়া পরে তাহা ধুইয়া ফেলিলে যেমন হস্ত নির্ম্মল হইয়া যায়, সেইরূপ সৎশাস্ত্রাদিরূপ সাত্ত্বিক অবিদ্যাংশের সাহায্যে পরিশেষে সাত্ত্বিক ও তামসিক উভয়বিধ অবিদ্যা পরিত্যাগ করিতে পারা যায়। তখন কেবল স্বপ্রকাশ নির্ম্মল আত্মাই প্রকাশ পান। আত্মা স্বয়ং বোধস্বরূপ। তিনি সংশয় বা গুরুবাক্য দ্বারা বুদ্ধ হন না। অথচ গুরূপদেশ ও শাস্ত্রজ্ঞান ব্যতীত প্রকৃত আত্মবোধ জন্মে না। লোকে যেরূপ অপরের উপদেশে প্রবুদ্ধ হইয়া নিজকণ্ঠস্থিত হারলাভে কৃতকার্য্য হয়, তদ্রূপ আত্মজ্ঞান বিকাশের জন্য গুরূপদেশ ও শাস্ত্রার্থ কারণ না হইলেও পরম সাধক হইয়া থাকে। যখন কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ মনের সহিত নিজ নিজ ধর্ম্ম ত্যাগ করে, তখন আত্মার বিমল বিশুদ্ধ স্বভাব প্রকাশ পায়। তখন জানিতে পারা যায়, সংসারমায়ায় অলীক ভ্রান্তিতে অলীক জীবে এই অলীক জগদ্দর্শন করিয়া থাকে। কামনাই সংসারের মূল; উহাই কর্ত্তৃত্বাভিমানের কারণ। তাহার কারণেই মনের উন্মেষ। আত্মজ্ঞানের অভাবে মনের লয় ও অজ্ঞানের উপশম হয়। আত্মজ্ঞানের অভাবেই সংসারবন্ধন; তাহারই প্রভাবে মুক্তি। আত্মজ্ঞানের আবির্ভাব ও তিরোভাবে কর্ম্মের আরম্ভ ও অবসান। বাসনারহিত অন্তঃকরণ সুখদুঃখে নির্ব্বিকার। সেই অন্তঃকরণ সমতা ও

সত্যের স্বরূপক্ষেত্র, উহাই তোমার প্রকৃত স্বরূপ। হে মানব! তুমি আপনাকে জান ও মুক্ত হও।

(ক্রমশঃ)

ব্যর্থতা।

আমরা আজকাল বড় কাজের লোক হইয়াছি। নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় নাই। সময় অমূল্য ধন, না—ইহা জীবন, আমাদের এইরূপ ধারণা হইয়াছে। আমরা সকল কাজই করিবার সময় পাই, কিন্তু পরমেশ্বরের নাম লইবার বা পরকাল চিন্তা করিবার সময় আমাদের নাই; উহার নিমিত্ত সময় নিয়োগ করা আমাদের নিকট সময়ের অপব্যবহার করা হয় বলিয়া বোধ হয়। সময়ের ভারী টানাটানি পড়িয়াছে। জনৈক ভক্ত কবি এই মর্ম্মে দুঃখভরে নিম্নলিখিত গীতটী একদিন গাহিয়াছিলেন :—

আমি সকল কাজে পাই হে সময়, তোমায় ডাকিতে পাইনে;
আমি, চাহি দারাসুত সুখ সম্মিলন, তব সঙ্গসুখ চাইনে।
আমি কতই যে করি বৃথা পর্য্যটন, তোমার কাছে ত যাইনে;
আমি কত কি যে খাই, ভস্ম আর ছাই, তব প্রেমামৃত খাইনে।
আমি কত গান গাই মনের হরষে, তোমার মহিমা গাইনে।
আমি, বাহিরের দুটো আঁখি মেলে চাই, জ্ঞান আঁখি মিলে চাইনে;
আমি, কার তরে দেই আপনা বিলায়ে, ও পদতলে বিকাইনে;
আমি, সবারে শিখাই কত নীতিকথা, মনেরে সুধু শিখাইনে।

কাল প্রভাবে আমাদের শিক্ষাদীক্ষা আচার ব্যবহার এরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িয়াছে যে যাহা প্রকৃত সত্য ও শ্রেয়ঃসাধক, তাহা আর আমাদের প্রীতি উৎপাদন করিতে পারে না। কোকিলের পরিবর্ত্তে কাকেও সমাদর পাইতেছে, পলাশ ফুলই মল্লিকাদির অপেক্ষা বিশেষ আদরণীয় হইয়া পড়িয়াছে। এ সকলের কারণ আর অধিকদূর অন্বেষণ করিতে হইবে না। কারণ বলিবার পূর্ব্বেই সকলে বুঝিতে পারিতেছেন।

প্রকৃত কথা বলিতে লজ্জা হয়, ঈশ্বরের অস্তিত্বে সংশয়ই উক্ত হেতুবাদের কারণ। আমরা মানি না বা চাই না বলিয়া আমরা সময় পাই না। আমরা অজ্ঞানান্ধ, বিবেক বুদ্ধিহীন সুতরাং ভালমন্দ বিচার করিবার শক্তি এখনও আমাদের জন্মায় নাই। বিষয়ভোগে প্রমত্ত হইয়া জীবনযাপন করিতেছি বলিয়া আমরা পরমার্থ বুঝিতে পারি না। অপরপক্ষে যাহাদের বিবেক বুদ্ধি সম্যক্ বিকশিত ও যাহারা সত্যের সেবক তাহারা বলেন :—

বিফল জনম বিফল জীবন, জীবনের জীবন না হেরে।
সুখডালে বসি ডাকিছ পাখীরে. চাহিছ কি সেই পরম পিতারে॥
কি বলে ডাকিছ বলে দে আমারে, ডেকে যদি দেখা পাইরে।
গুঞ্জরি ভ্রমর করি গুন্ গুন্, গাইছ কি সেই গুণাকর গুণ,
শিখাও আমারে আমি যে নির্গুণ, কি গুণে ভুলালে তাঁরে।
কেন ফুলকুল হাসিছ সকলে, পেয়েছ কি সেই পরম দয়ালে,
পায়ে ধরি বল কেমনে পাইলে, প্রাণারাম প্রাণেশ্বরে।
সুনীল গগন নীল আবরণে, আবরি রেখেছ কি প্রাণধনে ?
খোল আবরণ, বারেক নয়নে হেরে প্রাণ জুড়াইরে॥
বিশাল সুমেরু ওহে বিন্ধ্যাচল, গ্রীবা উচ্চ করি কি হেরিছ বল,
করেছ কি হেরি জনম সফল, বিশ্বম্ভর বিশ্বেশ্বরে॥

মোহমুগ্ধ ভ্রান্তচিত্ত মানব প্রবৃত্তির পথে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য উন্মত্তবৎ প্রাণপণ ছুটিয়াছে। কিন্তু এ ছুটাছুটী নিষ্ফল। সুখ বাহিরে নাই, সুখ অন্তরে। শান্তি ভোগে নয়, শান্তি ঈশ্বরের অনুধ্যানে। অসংযত মানবমনের প্রেরণায় জড়তার সেবায় প্রকৃতির অধীনতায় জীবনযাপন না করিয়া প্রকৃতিকে জয় করিয়া আত্মানন্দ উপভোগ করিয়া জীবন সফল করাই পরম পুরুষার্থ।

স্বামী সম্ভাবানন্দ।

ছায়া ও আলো

হে মানব! তুমি কি জ্যোতির রাজ্যে প্রবেশ করিতে চাও? ছায়ারাজ্য ত্যাগ করিয়া আলোর প্রদেশে যাইতে কি তুমি একান্ত ইচ্ছুক? তুমি কি স্থির করিয়াছ কিরূপে ছায়াকে অতিক্রম করিতে পারিবে? উপায় কি? ছায়ার পশ্চাদ্‌গামী হইলে কখনই ছায়াকে ধরিতে পারিবে না। সূর্য্যের অভিমুখে ফিরিয়া দাঁড়াও। দেখিবে, আর তোমাকে ছায়ার পশ্চাদ্ধাবন করিতে হইবে না; বরং দেখিবে, ছায়াই তোমার অনুসরণ করিতেছে। প্রবৃত্তিগুলির মোড় ঘুরাইয়া দাও। ক্রোধকে ক্ষমায় পরিণত কর। এইরূপে বৃত্তিগুলির আদর্শ পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেল। দেখিবে হৃদয় আলোকে উদ্ভাসিত হইবে। সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ তোমার পাপতাপ সকলই দূরীভূত হইবে। তুমি পরাশান্তির অধিকারী হইবে।

অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে অগ্নি অধিকতর বৃদ্ধি পায়। ইন্দ্রিয়গণকে ভোগাসক্ত করিলে উহারা কখনই পরিতৃপ্ত হয় না। সংসারবাসনা কখনই চরিতার্থ হয় না। যিনি সংসারের সার তাঁহাকে আশ্রয় না করিলে, কিছুতেই জীবনের সার্থকতা লাভ হয় না। দুগ্ধপান যেমন সর্পের বিষ বৃদ্ধি করে, ভোগাসক্তি তদ্রূপ আত্মার বিমল জ্যোতিকে সমাচ্ছন্ন করিয়া সংসারমোহ উৎপন্ন করে। ছায়ারূপী পাপ মায়া-মোহ ভ্রান্তিরূপ পরম রমণীয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উদ্দেশ্যহীন পথিকের মন হরণ করে। আলেয়ার মত তার প্রাণনাশ করে। মোহের বশে, ছায়ারূপী পাপের প্রভাবে জ্যোতির জ্যোতি, কারুণপ্রাণ করুণানিদান, উজ্জ্বলতার কৌস্তুভমণি, মানবের পুণ্যরাশি, আলোকরূপী ভগবানের আলোকরশ্মি সকল শূন্যে বিলীন প্রায় হইয়া যায়। উহা বুদ্ধির অগম্য হইয়া পড়ে। তুলসীদাস বলেন :—

রাম দূরি মায়া বাড়তি, ঘটতি জান মন মাঁহি।
দূর হোতি রবি দূরি দেখি, শিরপর গমতর চ্ছাহিঁ॥

ইহা নিশ্চয় জানিও, যতদূর শ্রীরাম থাকেন, মায়া ততই বাড়িতে থাকে। সূর্য্য দূরে থাকিলে ছায়া দেখিতে পাই, মস্তকের উপর আসিলে ছায়া অন্তর্হিত হয়। মহাত্মা কবীর বলেন :—

মায়া ছায়া একসি, বিরলা জানে কোয়।
ভগতাকে পায়ে লাগি, সম্মুখে ভোগে মোয়॥

জগতে এমন লোক বিরল, যিনি মায়া ও ছায়াকে একরূপে জানিতে পারিয়াছেন, ভক্তের পশ্চাতেই মায়া লাগিয়া থাকে তাহার সম্মুখ হইতে সে প্রস্থান করে।

অসময়ে

অসময়ে আজ অতিথি এসেছে
হয়নি কুসুম তোলা,
হয়নি সাজানো পূজার অর্ঘ্য
শূন্য পড়িয়া ডালা।
গাহিয়া গাহিয়া নীরব হয়েছে
কোকিল পাপিয়া কুল,
ফুটিয়া ফুটিয়া গন্ধ ঢালিয়া
ঝরিয়া পড়েছে ফুল।
বহিয়া বহিয়া মলয় সমীর
থামিয়া গিয়েছে আজি;
নীরব হয়েছে বীণার তন্ত্রী
উঠে নাকো আর বাজি।
বসন্ত আসিয়া সাধিয়া সাধিয়া
কাঁদিয়া গিয়েছে চলে;
হাসিয়া হাসিয়া আকাশের কোলে
চাঁদিমা পড়েছে ঢলে।

পড়েছে তাহার স্তিমিত কিরণ
　　সুনীল সরসী নীরে,
চল চঞ্চল তটিনী এখন
　　বহিয়া চলেছে ধীরে।
আকুল প্রেম তরঙ্গ পূরতি
　　ছিল যে হৃদয় হায়
আজ সে নীরবে গুমরি গুমরি
　　কেঁদে মরে যাতনায়;
ভরা ছিল মোর হৃদয়কুঞ্জ
　　বিকশিত ফুলদলে,
(আজ)　নিরাশ নিদাঘে শুষ্ক কুসুম
　　লুটায়েছে তরুমূলে।
আশার হাসিতে রঞ্জিত হৃদি
　　রয়েছে আঁধার বেশে,
মিলনের হাসি মলিন হয়েছে
　　বিরহ রবির ত্রাসে।
গাঁথা ফুলমালা বিবশ হইয়া
　　ঝরিয়া পড়েছে আজ,
কি দিয়ে তুষিব অতিথি তোমায়
　　তুমি যে হৃদয় রাজ।

শ্রীমতী বনদেবী।

ধর্ম্ম ও কর্ম্ম

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শাস্ত্র বলেন :—জ্ঞানী, ভক্ত, যোগী ও কর্ম্মী সকলের উদ্দেশ্য: এক। সকলের গন্তব্যস্থল অভিন্ন; এক বই উহা কখনই দুই নহে। ভেদ মাত্র মত ও পথ লইয়া। ভেদ ভাষা ও বর্ণনায়। শাস্ত্র বিভিন্ন অধিকারীর সহজ সাধনা ও সিদ্ধির জন্য আত্ম-স্বভাব বিকাশের জন্য জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্ম্ম এই চতুর্ব্বিধ পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্ব স্ব প্রবৃত্তি অনুযায়ী মনুষ্যগণ বিভিন্ন পথে সেই এক চরম লক্ষ্যে উপস্থিত হইয়া থাকে। কোন পথই স্বতন্ত্র নহে। উচ্চাঙ্গ জীবন লাভের জন্য কথিত চারি প্রকার পথের সামঞ্জস্যগত সাহায্য আবশ্যক। জগতে যাহারা মহাজন-পদবী লাভ করিয়াছেন, তাহাদিগের জীবন এ বিষয়ের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শাস্ত্রে কথিত আছে, মাছের যেমন সন্তরণের জন্য দুইটা ডানা ও গতি স্থির করিবার জন্য একটা পুচ্ছের আবশ্যক, তদ্রূপ জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্ম্মের সামঞ্জস্যগত সাহায্য হইতে জীবনে পরিপূর্ণতা লাভ হয়।

সাম্প্রদায়িক গোঁড়া অবিবেকী ব্যক্তিগণ কর্ম্মের উদার-ভাব গ্রহণে অক্ষম। তাহারা সর্ব্বদা গোঁড়ামীর আশ্রয় করিয়া পরস্পরের নিন্দা ও দোষ বর্ণন করিতে থাকে। আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার জন্য তাহারা স্ব সম্প্রদায়ভুক্ত শাস্ত্র সকল উদ্ধৃত করিয়া থাকে। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়, যে বিশেষ বিশেষ দেবদেবীর প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি করিবার জন্য, তাহাদিগের ভক্তগণের নিষ্ঠাভক্তি দৃঢ় করিবার জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রে সেই সেই দেবদেবীর মাহাত্ম্য বিশেষভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাতে যে অপরাপর দেবদেবীর প্রতি হতাদর প্রকাশ করা হইল, এইরূপ ধারণা মনে করা কখনই উচিত নয়। যাহারা এ সত্যের অপলাপ করেন, তাহাদিগের বাক্যের মূল্য নাই। যোগ, ভক্তি; জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে মাত্র একটীর প্রতি অতিমাত্রায় পক্ষপাতিতা দেখাইলে কিরূপ কুফল প্রসব করে, তাহা নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

শুষ্ক জ্ঞান কোন উপকারে আসে না। অরসজ্ঞ কাক যেমন কটু নিম্বফল আস্বাদন করে, আর রসজ্ঞ কোকিল যেমন প্রেমাম্র মুকুল ভক্ষণ করে, সেইরূপ তার্কিক শাস্ত্রের অসার বস্তু সেবন করিয়া থাকে, সে সার সত্য বস্তুর সেবা করিতে

পারে না। সে সত্যের সন্ধান পায় না। তাহার বিদ্যা-বুদ্ধি, শাস্ত্র-জ্ঞানশূন্য শব্দমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। গণ্ডূষমাত্র জলে যেমন শফরী ফড়ফড় করিয়া বেড়ায়, কিন্তু অগাধ জলধিমধ্যে যেমন রোহিতের কোন বিকার দেখা যায় না, সেইরূপ যাহারা ধর্ম্মের বহিরঙ্গমাত্র সেবা করিয়া থাকে, তাহারা সাধারণতঃ বাক্‌বিতণ্ডা করিয়া কালক্ষেপ করিয়া থাকে। আর যাহারা সত্যদ্রষ্টা, তাহারা আত্মভাবে বিভোর। বিশ্বনাথ স্বর্গীয় মঙ্গলময় হস্তে এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পালন করিতেছেন। সুতরাং জ্ঞানীর আর কি বলিবার আছে? প্রকৃত জ্ঞান ঈশ্বরকে জানাইয়া দেয়, কিন্তু শুষ্ক জ্ঞান পথের ঝাড়ুদার; পথ পরিষ্কার করিয়া থাকে মাত্র কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মলাভ ইহার সাহায্যে হয় না।

ভক্তি হৃদয়ের মধ্যে আলোক ও উপলব্ধি আনিয়া দেয়। কিন্তু জ্ঞান ও বিচার-বিহীন ভক্তি অসংযমে পরিণত হয়। উহা চিত্ত বৃত্তি সকলকে বিকৃত করিয়া দেয় ভাবের প্রাবল্যে অযথা শক্তির ক্ষয় হয়। মন চঞ্চল হইয়া সংযমের শাসনকে উপেক্ষা করে। ভাব-প্রবণ কল্পনাপ্রিয় ব্যক্তি উন্মাদের নামান্তর। তাহাদিগের পরোপকার-প্রবৃত্তি, ধর্ম্মভাব প্রভৃতি ক্ষণিকের উত্তেজনা। সুতরাং উত্তেজনার কারণ অন্তর্হিত হইলে তাহারা সকল বিষয়ে শিথিলপ্রযত্ন হইয়া পড়ে এই সকল কারণ বশতঃ তাহারা জীবনসংগ্রামে সকল সময় পরাজিত হইয়া থাকে।

যাহার জ্ঞান ও ভক্তিতে আস্থা নাই, তাহার আবার যোগসাধনা কি? আত্ম-সংযম, ধ্যান ধারণা প্রভৃতি তাহার নিকট সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক। জ্ঞান ও ভক্তিহীন ব্যক্তি ত জড়োপাসক, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র প্রকৃতির দাসানুদাস। ধর্ম্ম সাধনা ত দূরের কথা, সাংসারিক সামান্য উন্নতিসাধনও তাহাদিগের পক্ষে দুঃসাধ্য।

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শঙ্কর, বুদ্ধ, প্রভৃতি মহাজনগণের জীবনাদর্শে দেখা যায়, তাঁহারা সকলেই মহাধার্ম্মিক ও মহাজ্ঞানী ছিলেন অথচ তাঁহারা সংসারে সাধারণ লোকের ন্যায় ক্রিয়াকলাপ সকলই সাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের আদর্শে জীবকে গঠিত করা সকলের অবশ্য কর্ত্তব্য।

ব্রহ্মচারী নির্ম্মলচৈতন্য।

অক্রূর সংবাদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই বলি গোপী সব কাঁদিতে লাগিল।
বনমালী পুনঃ সবে বুঝায়ে বলিল ॥
ধৈর্য্য ধরি যাও সবে আপন ভবনে।
ত্বরায় আসিব ফিরি আমি বৃন্দাবনে ॥
বুঝায়ে সবারে ধীরে করিয়া গমন।
রথের উপরে কৃষ্ণ বসিল যখন ॥
বুঝিয়া সঙ্কেত বাণী অক্রূর তখন।
চালাইল রথ করি শ্রীহরি স্মরণ ॥
চলিল কৃষ্ণের রথ মথুরায় পথে।
আর সব রথ যায় তার সাথে সাথে ॥
রাখালেরা কৃষ্ণ বলি কাঁদিয়া ভাসায়।
মধুর বচনে কৃষ্ণ সবারে বুঝায় ॥
বায়ু বেগে চলে রথ ধ্বজা দেখা যায়।
অনিমিষে ব্রজবাসী সেই দিকে চায় ॥
দেখিতে দেখিতে রথ অদৃশ্য হইল।
শোকসিন্ধু মাঝে সবে নিমগ্ন হইল ॥
উৰ্দ্ধমুখে রহে ধেনু তৃণ নাহি খায়।
হাম্বারবে বৎস আর পিছে নাহি ধায় ॥
নীরবে দাঁড়ায়ে শিখী করিছে ক্রন্দন।
অলি নাহি ফুলে বসে করিয়া গুঞ্জন ॥
কৃষ্ণ গেল মথুরায় কাঁদে বৃন্দাবন।
আকুল হইয়া কাঁদে স্থাবর জঙ্গম ॥

(শ্রীকৃষ্ণের গমনে বৃন্দাবনের অবস্থা বর্ণনা।)

হরি ! হরি ! এ কি হ'ল গোকুল ময়।
স্থাবর জঙ্গম, কীট পতঙ্গম
বিরহ দহনে দহি রয়॥
তরুকুল আকুল সঘনে ঝরয়ে জল
তেজল কুসুম বিকাশ।
গলয়ে শৈলবর পৈঠে ধর নিপর,
স্থল, জল, কমল হুতাশ॥
শুক পিক পাখী শাখী'পরে রোয়ই,
রোয়ই কাননে হরিণী।
জম্বুকী সহ অহি, রহি রহি রোয়ই
লোবহি পঙ্কিল ধরণী॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি রোয়ই কুলবতী
শ্রীমতীর সই সমুদয়॥

[মথুরা গমন লীলা সমাপ্ত।]

(বর্ণনা)

বৃন্দাবন ত্যজি রথ আইল যখন।
অক্রূর আনন্দে তবে হইয়া মগন॥
হরিনাম গান করে নয়ন মুদিয়া॥
প্রেমানন্দে অশ্রু বহে বক্ষ ভাসাইয়া॥
দেখিতে দেখিতে রথ যমুনার তটে।
উপস্থিত হইল আসি মথুরার ঘাটে॥
রথ হইতে নামি সবে যমুনায় গিয়া।
নিত্যক্রিয়া আপনার লইল সারিয়া॥
কালিন্দীর জলে স্নান করি সমাপন।
ইষ্ট বন্দনাদি করে মুদিয়া নয়ন॥

গীত

ভজহুঁ রে মন নন্দ-নন্দন,
অভয় চরণার বৃন্দয়ে।
তুর্লভ মানব জনম পাইয়ে,
করহ হরিগুণ গান রে .
শীত, আতপ, বাত, বরিখন
এ দিন যামিনী জাগি রে ॥
বিফলে সেবিনু কৃপণ তুরজনে,
চপল সুখ লব লাগি রে ॥
এ ধন যৌবন, পুত্র পরিজন,
ইথে কি আছে পরতিতরে ॥
কমল দল জল জীবন টলমল,
করহ হরিপদ সার রে ॥
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ বন্দন,
পাদ সেবন দাস্যরে ॥
পূজন সখিগণ, আত্ম নিবেদন
গোবিন্দদাস অভিলাষী রে

সহসা অক্রূর দেখে জলেতে চাহিয়া।
রামকৃষ্ণ তুই ভাই আছে দাঁড়াইয়া ॥
বিস্মিত হইয়া মনে রথ পানে চায়।
রথোপরি রামকৃষ্ণে দেখিবারে পায় ॥
মনে ভাবে একি ভ্রান্তি হইল আমার।
জলে স্থলে কেন কৃষ্ণ হেরি অনিবার ॥
এই ভাবি পুন চাহি জলের ভিতরে।
দেখে কৃষ্ণ রহিয়াছে বিষ্ণুমূর্ত্তি ধরে ॥

বাসুকী আসিয়া তার চরণ পূজিছে।
অসংখ্য মণির প্রভা চরণে জ্বলিছে॥
অক্রূর দেখিয়া ভাবে ধন্য ভাগ্যোদয়।
তাই হরি এ দাসেরে হইয়া সদয়॥
অপার মহিমা আজি দেখাইল মোরে।
অজ্ঞান আঁধার মোর সব গেল দূরে॥
এই ভাবি প্রেমানন্দে গদ গদ হিয়া।
সমাপন করি স্নান আসিল উঠিয়া॥
রথের নিকটে আসি কৃষ্ণ পানে চায়।
আঁখি হতে প্রেমনদী হৃদয় ভাসায়॥
কৃষ্ণ বলে হেন ভাব কেন মুনি হেরি।
শীঘ্র করি লয়ে মোরে চল মধুপুরী॥
অক্রূর তখন কৃষ্ণে করজোড়ে কয়।
কি বুঝিব লীলা তব ওহে লীলাময়॥
হরিতে ধরার ভার এসেছে আপনি।
চিন্তার অতীত দেব! তুমি চিন্তামণি॥
নিজগুণে যারে তুমি কর কৃপাদান।
মায়াঘোর হতে সেই পায় পরিত্রাণ॥
তোমারে লইয়া আমি যাব মথুরায়।
দেখাইছ এই লীলা নিজ করুণায়॥
আপন ইচ্ছায় কার্য্য করিছ আপনি।
মোহঘোরে ভাবি কার্য্য করিতেছি আমি॥
ইচ্ছাময় তব ইচ্ছা কে রোধিতে পারে।
এখনি যাইবে রথ মথুরা নগরে॥
তখনি চলিল রথ মথুরার পানে।
উপনীত হৈল গিয়া এক উপবনে॥

অক্রূর সবারে ডাকি বলিল তখন।
এই স্থানে কর সবে বিশ্রাম এখন ॥
অবসান হলে দিবা পুরী প্রবেশিব।
কংসের বৈভব আজি সবারে দেখাব ॥
রামকৃষ্ণ বলে যাব রাজসভা মাঝে।
কেমনে যাইব মোরা রাখালের সাজে ॥
উত্তম বসন কিছু আনি নাই সাথে।
কেবা ঐ যায় ধীরে বস্ত্র লয়ে মাথে ॥
ডাকিয়া তাহারে কৃষ্ণ বলিল তখন।
এত বস্ত্র লয়ে কোথা করিছ গমন ॥
যদি তুমি কিছু বস্ত্র দাও মোরে ভাই।
তা'হলে রাজার কাছে যোগ্য হয়ে যাই ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা রাগে অন্ধ হয়ে।
বলে ছোঁড়া কি বলিস লোক না চিনিয়ে ॥
রাজার রজক আমি জানে সর্ব্ব জনে।
এত টুকু ডর কিরে নাহি তোর প্রাণে ॥
চাহিছ কাহার বস্ত্র জান নাকি তাঁরে।
সুরাসুর বিকম্পিত হয় যার ডরে ॥
বহু মূল্যবান বস্ত্র রাজা যাহা পড়ে।
সে বস্ত্র চাহিতে তোর লজ্জা নাহি করে ॥
অল্পবুদ্ধি গোপ তুই তাই নাহি ভয়।
রাজা যদি শুনে তোরে বধিবে নিশ্চয় ॥
সরে যা এখান হতে শুন মোর কথা।
তা না হলে নাহি রবে তোর কাঁচা মাথা ॥

—০ঃ(*)ঃ০— (ক্রমশঃ)

পশুপতিনাথ

কি জানি কেন মাঝে মাঝে প্রাণটা যেন ছটফট ক'রে উঠে এই বন্ধনের মধ্যে। মনে হয় এ ঘর দোর ফেলে ছুটে যাই সেই অনাবিল আনন্দের মধ্যে। যেখানে সভ্যতার জঞ্জাল নাই, শিক্ষার গৌরব নাই, জীবনে আড়ম্বর নাই—প্রকৃতির সেই উন্মুক্ত দেশে, ভাবের পাগলদের কাছে—দেবতার শ্রীচরণে যেন সেখানে থেকে রাঙ্গা টুকটুকু হ'য়ে ফুটে উঠে, নিশিদিন ঐ পাখীর গানে সেই ঘন অন্ধকারে বনের মাঝে। সেখানে সারা সেই প্রাণ আছে, জঞ্জাল নেই, কিন্তু মাধুর্য্য আছে, ভাষা নেই কিন্তু বোধ আছে।

মার্চ্চের ২ তারিখ সন্ধ্যায় উপেন বাবু আর শশীবাবুর সঙ্গে বেড়িয়ে পড়া গেল আবার হিমালয় উদ্দেশে। সন্ধ্যার পর গঙ্গাবক্ষে দিঘাঘাটের ষ্টিমার ছাড়লো। এ পারে পড়ে রইল যেখানে ভাবনা চিন্তার শত জঞ্জাল আর সামনে সে এক মুক্তির আনন্দ। ক্ষেপা পথের এ আনন্দ জীবনে অনেকবার ভোগ করেছি। তাই তার মধুর স্মৃতি নিত্য টেনে নিতে চায় সেই নিরুদ্দেশেরই পথে; সেখানে ভাবনা নাই, চিন্তা নাই, সুখ সুবিধার বালাই নাই, কিন্তু সে অজ্ঞাত পথের অসুবিধার মধ্যেও যে জিনিষের সন্ধান পাওয়া যায়, সেই চির অজ্ঞাতের মধুর স্পর্শ সেখানে নিত্য যখন সজাগ থেকে ঘুম পাড়ায়, ঐ অজ্ঞাত পথেরই মাঝখানে উদ্বেগ আর অবিশ্বাসের অর্গল বন্ধ করে—সে যে কি আনন্দ—অচেনা পথিকের আদর সম্মান, অজ্ঞাত স্থানের পরিচয়, পরের কাছে সেই যে আপন-করা ভালবাসা, তা যে ভোগ করেছে, সে জানে। ঘরে বসে ঐ ঘরটুকুকেই বিরাট মহান বলে জেনে যে চুপ করে আছে, সে কি জানে অজ্ঞাতের বুকে ঐ যে স্নেহের পরশ, পরের মায়ের কাছে ঐ যে পুত্রস্নেহ, পরের ঘরে ঐ যে আপনকরা স্নেহের অমৃত দিয়া? তা তাকে কি করে বুঝাই?

গঙ্গা পাড় হ'য়ে রেলে চড়ে মজঃফরপুর পৌঁছিলাম রাত্রি ১২টায়। সেখানে গাড়ী বদলে সগৌলি যেতে ৬টা বাজলো। আবার গাড়ী বদল করে আমরা পৌঁছিলাম রকসোল বেলা ৮ টায়। এখানে নেপাল রাজ্যের সীমা। নেপাল গবর্ণমেণ্টের রেল লাইন সেখান থেকে আমলকগঞ্জ পর্য্যন্ত র'য়েছে। শালবনের মধ্য

দিয়ে চড়াই উৎরাইয়ের রেল লাইন। দুই পাশে অঘোর জঙ্গল। এই বনই বোধ হয় নেপাল রাজ্যের সীমান্তে প্রাচীরের কাজ করছে। কেউ গোপনে নেপাল প্রবেশ করলে, অন্তের দৃষ্টি এড়ালেও বোধ হয় বন্য জন্তুর চোখকে এড়াইতে পারে না। এ জঙ্গল নেপালরাজের অমূল্য সম্পত্তি। কত জীবজন্তু কত রকমের কাঠ এতে আছে। আমলকগঞ্জ পৌঁছিতে আমাদের প্রায় সাড়ে বারটা বাজল। সেখানে অনেকটা যায়গা প্রায় সমতল। বাজার, বন্দর, সব আমাদের দেশের মত। বহু বহু হিন্দুস্থানী দোকানদার সেখানে আছে। সেখানে স্নান খাওয়া সেরে আমরা মটরে উঠলাম প্রায় আড়াইটায়।

এবার পাহাড়ের গায় এঁকে বেঁকে নদীর ধার দিয়ে মটর চল্‌লো। রাস্তায় কোথাও ঘন বন, কোথাও পাথরের রাস্তা, কোথাও ঝরণার সুন্দর ধারা। আর তারই পাশ দিয়ে এঁকে বেঁকে বড় রাস্তা। পাশাপাশি দুটা গাড়ী চলতে পারে; এমনি চলে গেছে "ভিমফেটী" পর্য্যন্ত। রাস্তায় একটা বড় ট্যানেল অনেকটা পথ পাহাড়ের ভিতর দিয়ে গেছে। "ভিমফেটী" পর্য্যন্ত পৌঁছিতে আমাদের প্রায় পাঁচটা হ'ল। সেখানে আমাদের কুলি করে "পায়দল" চলতে সুরু করতে হ'ল। ভিমফেটী একটা ছোট সহরের মত। অনেক দোকান পাট সেখানে আছে। একজন অফিসার আছেন। তারই লোকজন এসে আমাদের পাশ দেখে নিলে। পাশ আমরা রকসোল থেকে নিয়ে এসেছিলাম। এ সময় হিন্দুমাত্রকেই শিবরাত্রিতে পশুপতি দর্শনের জন্য পাশ দেয়। অন্য সময় নেপাল যাওয়ার অনুমতির জন্য অনেক বেগ পেতে হয়। এ সময় দেবদর্শন অভিলাষী হিন্দুর কোন কষ্ট নাই। রেলভাড়া এ সময় অর্দ্ধেক করে দেওয়া হয়, মটরের ভাড়াও তদ্রূপ। কুলির বন্দোবস্তও সরকারই করেন। সরকারী কুলি গন্তব্য স্থলে মোট পৌঁছাইয়া দেয় এবং রসিদ লইয়া আসিলে তবে সরকার হইতে সে তার মোটের মাশুল পায়। অবশ্য সরকারে সে টাকাটা পূর্ব্বেই জমা দিতে হয়। এরূপ ব্যবস্থা থাকায় চুরীর আশঙ্কা কম; অন্য unlicensed কুলীও মাল নিতে পারে না।

একজন অফিসার আমাদের সব গাঁঠুরী অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন তাতে কোন সন্দেহজনক জিনিষ আছে কি না। তারপর সরকারী কুলির মাথায় বিছানাটি তুলিয়া দিয়া আমরা অজানা পথের যাত্রা আরম্ভ করিলাম। প্রথম পাহাড়

"শীশাগরী"। প্রায় দুই মাইল সোজা উঠিয়া তবে আবার নামিতে হয়। প্রথম পথে এই রাস্তাটুকু শুধুই চড়াই তাই বড় কষ্টকর। পাহাড়ের গায় একবার বাঁ দিক হইতে ডান দিক আবার ডান দিক হইতে বাঁ দিক এভাবে (zigzag) রাস্তা বহিয়া শীশাগরী পৌঁছিতে আমাদের রাত্রি ৭টা হইয়া গেল। শীশাগরী পাহাড়ের উপর নেপালসরকারের একটি দুর্গ বা ফোর্ট। সেখানে একটি তোড়ন বা "গেট"। তা' সন্ধ্যা ৬টায় বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় আবার ভোর ৬৷৷টায় খোলা হয়। সেখানেই একটী ঘরে কিছু ভাড়া দিয়া আমরা রাত্রি-বাসের ব্যবস্থা করিয়া লইলাম। নিজেরাই রান্না করিয়া কিছু খাইয়া বিছানায় এলাইয়া পড়িতেই গাঢ় নিদ্রা তার শান্তিময় কোলে আমাদের স্থান করিয়া দিলেন।

ভোরে ৬টায়, প্রাতঃকৃত্য সেরে সবাই রওনা হ'লাম আবার। তখনও 'গেট' খোলা হয় নাই। একজন অফিসার আমাদের পাশ, গাঁঠুরী সব আবার অনুসন্ধান করে দেখলেন। তার পর গেট খুললে, আমরা আবার চলতে সুরু করলাম। এবার শুধু উৎরাই প্রায় তিন মাইল। এই রাস্তাটা ভাল নয়। অনেক যায়গায় সোজা নামতে হয়, পাথর সব আলগা হয়ে আছে, অনেকেই পিছ্‌লে পড়তে লাগল। রোদও ক্রমশঃ বাড়তে লাগলো। আমাদের সকলের মাথাতেই হ্যাট্ আর হাতে লাঠি। চেহারার এ অভিনবত্ব অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

"মার্ক" পৌঁছিলাম আটটায়। এখানে একটু জলযোগ করে নেওয়া গেল। মার্ক থেকে চিতলাঙ্গের রাস্তাটা অনেকটা সোজা। চড়াই উৎরাই যে নেই তা নয়—তবে উঁচু নীচুটা অপেক্ষাকৃত কম—আর তত কষ্টকর নয়। এ যায়গায় প্রায় ৫।৬টা ঝুলান সেতু (লছমন ঝোলা বা তিস্তার সেতুর মত) আছে। ঝরণা, আঁকাবাঁকা নদীপথ, মাঝে মাঝে বালুচড়া বেশ মনোরম। এক এক জায়গায় লক্ষ সাদা পাথরের রাশি পড়ে আছে। মনে হয় যেন বিশ্বকোলাহল ভাল লাগেনি বলে তারা এই প্রকৃতির বুকে শুয়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে ঐ ঝরণার গানে মোহিত হ'য়ে। মরি, মরি পাষাণের কি মহিমাময় রূপ। এ যায়গায় মাঝে মাঝে অনেক পাহাড়ীর ঘর। দল বেঁধে কোথাও পুরুষ কোথাও নারী সব কাঠ ও অন্যান্য বোঝা নিয়ে চলেছে গান গেয়ে—সে সুর পাগল পাখীর আকুল করা শিসের চেয়েও মিষ্টি। ঐ প্রকৃতির কোলে থেকে তারা ঐ পাখীর মত সুরই শিখেছে। শিক্ষার জঞ্জাল তাদের ধার করা সুর শিখতে দেয়নি।

কত যাত্রী চলেছে তার গণতি করা চলে না। কেউ রাস্তায় রান্না করে খাচ্ছে, কেউ অকাতরে ঘুমাচ্ছে ঐ পাষাণের গায় নিশ্চিন্ত মনে। কেউ চলেছে সঙ্গে লয়ে স্ত্রী-পুত্র বৃদ্ধ পিতামাতা সব। মাথায় কারো বোঝা, হাতে লাঠি। একটী বাঙ্গালী ভদ্রলোক অন্ধ, তাকেও দেখলাম একটা মুটের সাহায্যে চলেছেন বাবা পশুপতি নাথের উদ্দেশ্যে। সঙ্গে কেউ নেই, আলাপ করে জানলাম এ ভাবেই তিনি বহুতীর্থ করেছেন। দৃষ্টিহীন তবু অন্তরের আকুলতা তাকে টেনে নিয়ে চলেছে এমন দুর্গম দেশে।

"চিতলাং" পৌছিলাম সাড়ে এগারটায়। সেখানেই স্নান আহার সব সেরে নিলাম এক দোকানীর ঘরে। সব চটিতেই দোকানের পাশে পথিকদের থাকবার জন্যে একটা ঘর আছে। তাতেই ভাড়া দিয়ে থাকতে হয়। কাঠ, তেল, নুন, চাল, ডাল, আলু আর কুমড়া সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়, দুধ, ঘি, দৈ কোথাও কোথাও পাওয়া যায়। ধর্ম্মশালাও আছে। তবে সেখানে এত ভিড়ের সময় সুবিধা হয় না। জিনিষ পত্র খুব দাম নয় তবে সব সময় ভাল জিনিষ পাওয়া যায় না। পাহাড়ীরা যেখানে থাকে প্রায়ই দু'চার ঘর এক জায়গায় বাস করে। সেখানে থাওয়া দাওয়া বিশ্রাম সেরে আমরা বেলা আড়াইটায় আবার চলতে সুরু করলাম। দিনটা কেমন অন্ধকার করে র'য়েছে, এক এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ছে। হয়ত বা বৃষ্টি হ'বে এমনি ভয় হ'তে লাগল।

(ক্রমশঃ)

ডাঃ শ্রীঅমলেন্দু কুমার সেন।

এম, ডি (হোমিও) এফ্, আর্, এইচ্, এস্।

সংযম।

এক প্রকার কাঁচ আছে তাহা সূর্য্যের রশ্মিতে ধরিলে নীচে যে আলো পড়ে তদ্দারা দাহ্যবস্তুতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া যায়। বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ইহার কারণ চিন্তা করিয়া আমরা বুঝিতে পারি যে এই কাঁচ বিভিন্ন দিকে বিচ্ছুরিত রশ্মিসমূহকে একই কেন্দ্রে সংহত করে; এবং সেই হেতুই সংহত রশ্মিরাশি অগ্নি স্ফুলিঙ্গের জনক হয়। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শক্তিসমূহকে একই বিন্দুতে স্থির করিতে পারিলে বাস্তবিকই সংসারে অনেক মহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন করা যায়।

আমাদের প্রত্যেকের মন এক একটি শক্তিকেন্দ্র, মস্তিষ্ক তাহার Head office বা কার্য্যালয়। হৃদয় তাহার কারখানা বা work shop. শ্রীভগবান এমনই কৌশলে আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যে প্রত্যেককে জীবনধারণ করিতে ও জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করিতে হইলে যতখানি শক্তির প্রয়োজন ঐ কারখানা বা কার্য্যালয়ে প্রতিদিন ততখানি শক্তি প্রস্তুত হইতেছে। আর আমরা হাঁটিতে, বসিতে, দেখিতে, শুনিতে, কথা বলিতে, চিন্তা করিতে, অনুভব করিতে, ইচ্ছা করিতে-এক কথায় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় সাধ্য সর্বপ্রকার কার্য্য সম্পন্ন করিতে যতখানি শক্তি প্রয়োজন প্রতিনিয়ত ঐ ভাণ্ডার হইতে তাহাই খরচ করিতেছি। এই শক্তি রাশিকে যথেচ্ছভাবে বৃথা কাজে ব্যয়িত হইতে না দিয়া যদি সুসংযত করিয়া রাখি তবে যে কোন কালে যে কোনও কর্ত্তব্যের কেন্দ্রে তাহাকে নিয়োগ করিলে তদ্দারা অসাধ্য-সাধন করিতে পারি। এই কার্য্যেরই নামান্তর সংযম।

কথাটি এই যে, যেমন আমরা যে কথা বলি তাহার দ্বারা ঐ ভাণ্ডার হইতে খানিকটা শক্তি ব্যয় হইয়া যায়। আমরা যদি বাক্‌সংযত হই, অর্থাৎ যে বাক্য উচ্চারণে কোনপ্রকার মঙ্গলকর ফল ফলে না তাদৃশ বাক্য কুত্রাপি উচ্চারণ না করি তাহা হইলে ঐ শক্তি ভিতরে থাকিয়া যায়। বিজ্ঞানবিদ্ বলেন শক্তি কখনও নষ্ট হইবার বস্তু নহে; ঐ শক্তি ভিতরে থাকিয়া কাজ করিতে থাকে। কি কি কাজ করে স্থূল বুদ্ধিতে আমরা হয়ত তাহা বুঝিতে পারি না। সূক্ষ্মদর্শী ঋষি পতঞ্জলি বলেন ঐ শক্তি আমাদের বাক্যকে অবিতথ করিয়া দেয়। যাহার বাক্য সুসংযত সে ইচ্ছাপূর্ব্বক বা অনবধানবশতঃ কোন বাক্য উচ্চারণ করিলে তাহা সত্য হইতেই হইবে। ইহাই বাক্ সংযমের ফল। এই বলে বলীয়ান হইয়াই প্রাচীন ভারতের মননশীল মুনিগণ কাহাকেও বরদান করিয়া তাহাকে অভীষ্ট লাভে সহায়তা করিতে

পারিতেন।

আমাদের সকল ইন্দ্রিয়সমূহই বহির্ম্মুখীন অর্থাৎ তাহাদের মুখ বাহিরের দিকে। কর্ণ বাহির হইতে শব্দ শুনিতে চায়, চক্ষু বাহির হইতে বস্তু দেখিতে চায়, নাসিকা বাহিরের বস্তুর ঘ্রাণ লইতে চায়, রসনা বাহিরের বস্তুর আস্বাদন লইতে চায়, বুদ্ধি বাহিরের বস্তুর কথা ভাবিতে চায়; সংযমের ফলে এই ইন্দ্রিয়সমূহ অন্তর্ম্মুখীন হয়। তখন তাহারা বাহিরের গ্রাহ্যবস্তুসমূহকে পরিত্যাগ করিয়াও অন্তরে এমন বস্তু পায় যাহাতে সর্ব্বেন্দ্রিয় চরিতার্থতা লাভ করে। যিনি কঠোর সংযমের ফলে এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন শাস্ত্রকারগণ তাঁহাকে আত্মারাম কহেন। তিনি তখন আত্মাতে রমণ করেন। রমন অর্থ খেলা করা। খেলিবার জন্য তখন আর তাঁহাকে মাঠে যাইতে হয় না। আপন হৃদয়েই তখন সে গড়ের মাঠ দেখিতে পায়। সে মাঠে খেলার পরিশ্রম নাই, শক্তির অপচয় নাই, যেখানকার শক্তি সেইখানেই থাকিয়া যায়। তাহাতে শক্তি কমে না উত্তরোত্তর বাড়িতেই থাকে। ক্রমে সে পরমাত্মার সাক্ষাৎ করে ও "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈবভবতি" তাহাই হইয়া যায়।

সংযমের ফল অসীম। এই সংযমের ফলেই শাক্যসিংহ বুদ্ধ হইয়াছেন, শঙ্কর শঙ্কর সদৃশ হইয়াছেন। সংযমের ফলেই আর্য্যঋষিগণ উপনিষৎ প্রণেতা ও বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা হইয়াছেন। এই সংযমের ফলেই ঈশা, মুশা, নানক, কবীর, রামমোহন রায় প্রভৃতি, জগতে নবীন বার্ত্তা দিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন। এই সংযমের ফলেই নরেন দত্ত স্বামী বিবেকানন্দ হইয়া বেদান্তের হুঙ্কারে পাশ্চাত্য জগৎ স্তম্ভিত করিয়া তথায় হিন্দুধর্ম্মের বিজয়স্তম্ভ সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন।

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ অধঃপতনের চরমে পৌঁছিয়াছে। এ আমার কথা নহে। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই এ কথা স্বীকার করেন। তবে ইহার কারণ সম্বন্ধে বহু লোকের বহু মত। আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে মনে হয় সংযমহীনতাই এই অধঃপতনের সর্ব্ব প্রধান কারণ। দেশ যে ভীষণভাবে দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে বিলাসিতা তাহার একটি প্রধান কারণ। এই বিলাসিতাও অসংযমতার ফল বই আর কিছুই নহে। দয়া, দাক্ষিণ্য, স্নেহ, প্রীতি ও প্রেম ভক্তি প্রভৃতি মানব হৃদয়ের সংগুণ রাশিও অসংযত হৃদয়ে প্রসারতা লাভ করিতে পারে না। যুবকগণ অস্বাভাবিক উপায়ে যথেচ্ছভাবে শক্তি নষ্ট করিয়া দিনের পর দিন আপনাদিগকে অন্তঃসার শূন্য করিয়া ফেলিতেছে। বালকগণ "লেখাপড়া করে যেই, গাড়ী ঘোড়ায় চড়ে সেই" বাল্যকাল

হইতেই এই বুলি শিখিয়া বিদ্যাশিক্ষার চরম ফল গাড়ী ঘোড়াতেই পর্য্যবসান এইরূপ মনে করিয়া অসৎ শিক্ষায় আপনাদের শক্তিরাশি নানা প্রকারে অসংহত করিয়া ভারতের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। যাহারা প্রকৃত দেশ-হিতাকাঙ্ক্ষী তাদের কর্ত্তব্য দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে, সংযম শিক্ষার ব্যবস্থা করা। মানুষ যাহাতে পশুতুল্য না হইয়া মনুষ্যত্বের স্বর্গীয় সৌরভে সোণার ভারতকে আবার গৌরবান্বিত করিয়া তুলিতে পারে, তজ্জন্য সংযম শিক্ষার যেরূপ প্রয়োজনীয়তা এমন আর কিছুই নহে। জানি না ভারতের সেইদিন আবার ফিরিয়া আসিবে কি না।

সংযমের আটটি অঙ্গ, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি। ক্রমে এতৎ সম্বন্ধে বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিতে ইচ্ছা রহিল।

ব্রহ্মচারী অবিনাশ।

কথা প্রসঙ্গে

লোকে বলে, সুমতি কুমতি দেবার মালিক তিনি—একথা কি যথার্থ? ভগবান্ এক সত্যস্বরূপ কিন্তু সাধারণে তাঁকে দেখিতেছেন দুইভাবে। সেই এক ভগবানই যেন দুই হইয়াছেন—যেমন মটরের খোলার মধ্যে দুইটী দানা আছে; দুইটী দানা লইয়া একটী মটর; সেইরূপ ভগবান যেন দুই হইয়াছেন—জড় ভগবান্, আর চৈতন্য ভগবান্। চৈতন্য ভগবানের মনোময় অবস্থা হইতেছে—বিরাট্ প্রকৃতি অর্থাৎ বিশাল মন। মনুষ্যের মধ্যে সেই চৈতন্যের অংশ আছে। আবার মনের মধ্যেও তাঁহার অংশ আছে। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে "অণু আত্মা" এবং "অণু মন" আছে। আত্মা আর মনের মাঝখানে "আমি"টা ব্যবধান আছে। সে কারণ আত্মার আলোক দৃষ্টিগোচর হয় না। যতক্ষণ "আমি" "আমি" ততক্ষণ স্বাধীন ইচ্ছা। "আমি" চলিয়া যাইলেই সব "তিনি"। আত্মার গুণগুলি নিয়ত নিষ্ঠাপূর্ব্বক ধ্যান করিলে পর আত্মস্বরূপ লাভ করা যায়। তখন জানা যায় একই ভগবান্ দুই হইয়াছেন—আত্মাও বিরাট্ প্রকৃতি।

গুরু হইতে পারেন কে? যিনি আত্মাতে অবস্থিত। তিনিই গুরু হইতে পারেন। যাহার অন্তরে মলিনতা, পাপ প্রবৃত্তি বর্ত্তমান আছে, তিনি কখনই গুরু হইতে পারেন না। সদ্‌গুরু অজ্ঞান নাশ করেন ও জ্ঞানালোক প্রদান করেন। নতুবা অনুপযুক্ত লোকে গুরুর আসন গ্রহণ করিলে গুরু ও শিষ্য উভয়কেই কষ্টভোগ করিতে হয়। যেখানে গুরু জ্ঞানহীন, সেখানে জ্ঞানান্ধ শিষ্য উক্ত গুরু কর্তৃক পরিচালিত হইয়া মোহগর্ভে নিপতিত হয়। তাহাতে উভয়েরই কষ্ট। যেমন ঢোঁরা সাপ ভেককে আক্রমণ করিলে, ভেক চীৎকার করিতে থাকে কিন্তু তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয় না। আবার সর্পও তাহাকে ছাড়িতে পারে না বা তৎক্ষণাৎ গিলিয়া খাইতে পারে না। অর্দ্ধগ্রস্ত অবস্থায় উহাকে ধরিয়া রাখে।

সংঘ ও বার্ত্তা

১। তত্ত্বমসি মিশনের অবৈতনিক বিদ্যালয়ে সকল শ্রেণীর বালকগণকে শিক্ষা দেওয়া হয়। যাঁহারা উক্ত বিদ্যালয় সম্বন্ধে কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মিশন সম্পাদকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সবিশেষ অবগত হউন।

২। তত্ত্বমসি মিশন পরিচালিত অবৈতনিক "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চতুষ্পাঠীর" তত্ত্বাবধানে যাহারা ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি, সাংখ্য, বেদান্ত, বেদ প্রভৃতি বিষয় সকল শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা সত্বর আসিয়া উক্ত মঠের সম্পাদক বা উক্ত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন। এতদুদ্দেশ্যে আমরা সকল শ্রেণীর বিদ্যার্থিগণকে সাদরে আহ্বান করিতেছি। বিদ্যার্থিগণ ইচ্ছা করিলে কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েশন বা অন্যত্র উপাধি পর্য্যন্ত পরীক্ষা দিতে পারিবেন। গত বৎসর উক্ত চতুষ্পাঠী হইতে প্রেরিত ছয়জন ছাত্রই বিশেষ কৃতিত্বের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

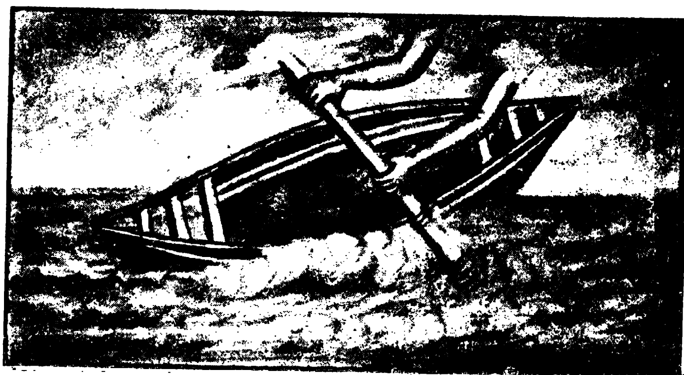
৩। তত্ত্বমসি মিশনের পরিচালনাধীনে সুযোগ্য শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে টেলারিং (শিল্প বিভাগ) এবং ছাপাখানার সকল প্রকার কাজ সকল শিক্ষার্থিগণকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দেওয়া হয়। ১লা হইতে ১৫ই জুলাইএর মধ্যে প্রবেশ প্রার্থিগণের আবেদন গ্রাহ্য হইবে।

৪। তত্ত্বমসি মিশনে সুযোগ্য চিকিৎসকগণের দ্বারা বিনামূল্যে চিকিৎসা করা ও ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

বিশ্বজনীন

ধর্ম্ম-নীতি-শিক্ষাসংস্কারাদি সম্বন্ধীয় বর্ত্তমান যুগোপযোগী

তত্ত্বমসি মঠের মুখপত্র



"সত্যমেব জয়তে নানৃতম্"



৩য় বর্ষ—২য় সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭ সাল।

Viswajanin

The Organ of Tattwamasi Math.

সম্পাদক—স্বামী নির্ব্বাণানন্দ

বিশ্বজনীন কার্য্যালয়।

৩২।১ রাজা দিনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষিক-মূল্য ২৲ প্রতি সংখ্যা ৵০

সূচীপত্র

"বিশ্বজনীন" এর নিয়মাবলী।

বিশ্বজনীন ঃ—তত্ত্বমসি মঠের মুখপত্র। ধর্ম্ম, নীতি, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয় ইহাতে সাধারণতঃ আলোচিত হয়। বৈশাখে বর্ষারম্ভ। প্রতি মাসে শেষ সপ্তাহে বাহির হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ দুই টাকা। ভিঃ পিঃতে ২।০ দুই টাকা চারি আনা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ তিন আনা। নমুনার জন্য ৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়।

কোন গ্রাহক কোন মাসের কাগজ না পাইলে, পর মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে ডাক ঘরে অনুসন্ধান করিয়া ডাক বিভাগের উত্তর সহ পত্র লিখিলে উহা বিনামূল্যে পাইতে পারিবেন। অন্যথা মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হইবে। পত্র ব্যবহার কালে গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন। উহা পত্রিকার মোড়কের উপর লেখা থাকে।

লেখকগণের প্রতি নিবেদন, প্রবন্ধের সহিত নিজ নিজ নাম, উপাধি, ঠিকানা প্রভৃতি স্পষ্টরূপে লিখিয়া দিবেন। উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প দেওয়া থাকিলে, প্রবন্ধ মনোনীত হওয়ার সংবাদ অথবা অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয়। যে প্রবন্ধের সহিত ষ্ট্যাম্প না থাকে, সে প্রবন্ধ সম্বন্ধে লেখকগণ পরে রিপ্লাই কার্ড লিখিলে আমরা তাহার উত্তর দিতে অক্ষম, কারণ অমনোনীত প্রবন্ধ ছিঁড়িয়া ফেলা হয়। নকল রাখিয়া প্রবন্ধ পাঠাইবেন।

বিশ্বজনীন সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে, রিপ্লাই কার্ড বা ষ্ট্যাম্পসহ কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র লিখিতে হয়।

বিশ্বজনীন কার্য্যালয়, — কার্য্যাধ্যক্ষ

৩২।১ রাজা দিনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা। — ব্রহ্মচারী নির্ম্মলচৈতন্য।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-
শ্রীচরণ ভরসা।

বিশ্বজনীন।

৩য় বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯ { ২য় সংখ্যা

সামবেদ-সংহিতা।

ছন্দ আর্চ্চিকঃ। কৌথুমী শাখা। আগ্নেয়ং পর্ব্ব। ১প, ১অ, ১খ, ১প্র, ১১দ।

পুরু ত্বা দাশিবাঁ্‌ বোচেঽরিরগ্নে তব স্বিদা।
তোদস্যেব শরণ আ মহস্য॥ ১।

বহুদানশীল দেব, তাই তব লয়েছি আশ্রয়।
আশ্রিত সেবক আমি, কৃপা করি দাও হে অভয়॥
সামর্থ্যবিহীন আমি স্তুতিশক্তি নাহিক আমার।
সর্ব্বতঃ শরণাগত কৃপা করি করগো উদ্ধার॥

প্র হোত্রে পূর্ব্ব্যং বচোঽগ্নয়ে ভরতা বৃহৎ।
বিপাং জ্যোতীংষি বিভ্রতে ন বেধসে॥ ২।

যাহা শুভকর্ম্ম তাহা অবিরত কর সম্পাদন।
নিষিদ্ধ বর্জ্জন করি ব্রহ্মজ্যোতি ভুঞ্জ অনুক্ষণ॥
শুভকর্ম্ম পরিতৃপ্ত জ্যোতির্ম্ময় বিশ্বের বিধাতা।
করুন আলোক দান জন্মগত নাশি অজ্ঞানতা॥

অগ্নে বাজস্য গোমত ঈশানঃ সহসো যহো।
অস্মে দেহি জাতবেদো মহি শ্রবঃ॥ ৩।

সর্ব্বশক্তি-মূলাধার জ্ঞানদেব পরম দয়াল।
সর্ব্বজ্ঞতা কর দান গুণাকর আশ্রিতকৃপাল॥
ভাবনিধি তুমি দেব! লোকালোক সর্ব্বশক্তিমান্।
অশুভ করিয়া নাশ শুভবুদ্ধি করগো প্রদান॥

অগ্নে যজিষ্ঠো অধ্বরে দেবাং দেবয়তে যজ।
হোতা মন্দ্রো বি বাজস্যতি স্রিধঃ॥ ৪।

যাজক প্রধান তুমি যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞের বিধাতা।
দীনহীন ক্ষুদ্র আমি তুমি যন্ত্রী সর্ব্বকর্ম্মকর্ত্তা॥
চিরতরে নাশ কর জন্মগত অলীক সংস্কার।
জ্ঞানদান কর দেব ঘুচে যাহে মোহের আঁধার॥

জজ্ঞানঃ সপ্ত মাতৃভি র্মেধামাশাসত শ্রিয়ে।
অয়ং ধ্রুব রয়ীণাং চিকেতদা॥ ৫।

অবিনাশী জ্ঞানদেব! চতুর্ব্বর্গ প্রসাদ তোমার।
অশেষ প্রতিভাশালী রক্ষাকর্ত্তা সংসারের সার॥
যজ্ঞের বিধাতা তুমি শুভকর্ম্ম তোমার বিধান।
তোমার সেবার তরে করিতেছি তোমায় আহ্বান॥

উত স্যা নো দিবা মতিরদিতিরূত্যাগমৎ।
সা শন্তাতা ময়স্করদপ স্রিধঃ

সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞাতা তুমি নিরাধার সকল কারণ।
এস নাথ যজ্ঞভূমে বরণীয় অশুভবারণ॥
সুখদাতা শান্তিদাতা, হিতকর লোচনলোভন॥
শত্রু নাশি জ্ঞানদানে মুক্ত কর জ্ঞানহীন জন॥

ঈড়িষ্বা হি প্রতীব্যাং যজস্ব জাতবেদসং ।
চরিষ্ণু ধূমমগৃভীতশোচিষং ॥ ৭ ।

সংশয়বিহীন চিত্তে ডাক সেই শত্রুত্রাসকারী ।
সর্ব্বলোকে অধিষ্ঠিত যেইজন শত্রুভয়হারী ॥
রে প্রমত্ত মন আজি করি সব বন্ধন মোচন ।
শুদ্ধসত্ত্ব লাভ কর আশুতোষে তুষি অনুক্ষণ ॥

ন তস্য মায়য়া চ ন রিপুরীশীত মর্ত্ত্যঃ ।
যো অগ্নায় দদাশ হব্য দাতয়ে ॥ ৮ ।

কর্ম্মজ্ঞানহীন আমি তুমি দেব দয়ার আধার ।
তোমার শরণ তাই মাগিতেছি আমি বারবার ॥
শুদ্ধসত্ত্ব ভাবময় ! ভাব সব প্রভাবে তোমার ।
তোমাতেই হয় লয় কহিতে কি শকতি আমার ॥

অপত্যং বৃজিনং্‌ রিপুং্‌ স্তেনমগ্নে দুরাধ্যং ।
দবিষ্ঠ মস্য সৎপতে কৃধী সুগং ॥ ৯ ।

অজ্ঞানতা মানবের মহাশত্রু কুটিলতাময় ।
মানবের গুণ হরে, আনয়ন করে মৃত্যুভয় ॥
মায়া মোহ পীড়াপ্রদ দুঃখ সবে কর গো বিনাশ ।
ধ্বংস করি শত্রুগণ শুদ্ধসত্ত্ব কর গো প্রকাশ ॥

শ্রুষ্ট্যগ্নে নবস্য মে স্তোমস্য বীর বিশ্‌পতে ।
নি মায়িন স্তপসা রক্ষসো দহ ॥ ১০ ।

শত্রুহন্তা রাজরাজ জ্ঞানদেব ভুবন মোহন ।
তব দীপ্ত তেজোরাশি করে যাক শত্রুরে হনন ॥
কুমতি কলাপ আর বিঘ্নকারী কর্ম্ম সমুদায় ।
ভস্মীভূত হ'ক নাথ, বিশ্বেশ্বর তোমার কৃপায় ॥

তুকারাম।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এদিকে অর্থ বিনা সুচারুরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। পরিবার পালন, অতিথিসেবা, দেবপূজা, সম্মানরক্ষা, লৌকিকতাপোষণ ইত্যাদি কোন ব্যাপারই অর্থ বিনা গৃহস্থের পক্ষে সুসাধ্য নয়। অপর পক্ষে আয়ের কোন পথ নাই। তুকারাম যে ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করেন, তাহাই নষ্ট হইয়া যায়। এ দোষ ত তাহার ব্যবসায়ের নয়। তাহার দেহ, হাত, পা ব্যবসায়ে রত থাকিলেও তাহার মন বেঠোবার শ্রীপাদপদ্ম ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। তিনি ভগবৎপ্রেমের আস্বাদ লাভ করিয়াছেন; সংসারের উন্নতিস্পৃহা কিরূপে তাহার শুদ্ধ হৃদয়কে কলুষিত করিবে? তিনি ত সংসারের লোক নয়; অতএব তিনি কিরূপে সংসারপঙ্কে নিমগ্ন হইবেন? ভগবান্ যে তাহাকে তাঁহার বিশেষ কার্য্য সাধন করিবার নিমিত্ত নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। তাহার ব্যবসায় দোকানদারী নয়; উহা সাংসারিকতা নয়—উহা পরোপকারের উপায় মাত্র। সুতরাং ব্যবসায় কিরূপে স্থায়ী হইবে? তাহার মূলধন নষ্ট হইয়া গেল। তাহার আত্মীয়গণ কয়েকবার তাহাকে ঋণ প্রদান করিলেন; তিনি তদ্দ্বারা নূতন ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এই সকল ব্যবসায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যবসায়ের মত অচিরেই অস্তিত্বহীন হইয়া পড়িল। তাহার আত্মীয়গণ ও মহাজন সকল আসিয়া তাহার হিসাবপত্র দেখিতে লাগিলেন। তাহারা তাহার অর্থনাশ ও ব্যবসায়ে ক্ষতির কথা সম্যক্ উপলব্ধি করিলেন। বিঠোবার প্রতি একান্ত অনুরাগই তাহার সর্ব্বনাশের মূল বলিয়া তাহারা এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন। তাহারা তাহাকে পূজা ত্যাগ করিতে বলিলেন। তাহাদিগের কথা শুনিয়া তাহার দ্বিতীয় পত্নীর মন খারাপ হইয়া গেল। তিনিও বলিতে লাগিলেন— "বাড়ীর কর্ত্তা দেব পূজায় মগ্ন; ছেলেরা উদর পূরিয়া অন্ন পায় না; অর্থাভাবে লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারি না কিন্তু এ সকল বিষয়ে কর্ত্তার ভ্রুক্ষেপ নাই।" সাংসারিকতার অভাবে তাঁহার ব্যবসায় সকল বিনষ্ট হইতে লাগিল। তাহার মূলধন লোপ পাইল; তিনি বাজারে দেউলিয়া বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন। সুতরাং লোকে এখন তাঁহাকে ঋণ দিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। মনের ক্ষোভে তিনি তাহার

সকল দুঃখ বিঠোবার নিকট নিবেদন করিলেন কিন্তু তিনি তাহার শরীর মন সকলই ইষ্টের শ্রীচরণে নিবেদন করিয়াছেন, সুতরাং কিরূপে উহা প্রতিগ্রহণ করিবেন? উহা ত কিছুতেই হইতে পারে না। সংসারের দুরবস্থা লক্ষ্য করিয়া কখন কখন তিনি ক্রন্দন করিয়া ভগবানের নিকট নিবেদন করিতেন, "প্রভু! এ তোমার কি পরীক্ষা? যে তোমার পথানুবর্ত্তী, তাহার ঈদৃশ দুঃখ কষ্ট কেন? তুমি কি তোমার ভক্তের ভারগ্রহণ কর? দুর্ব্বল ক্ষুদ্র মানব তোমার কৃপার ভিখারী। তাহার গর্ব্ব করিবার কিছুই নাই। তাহার শক্তি, ভক্তি, শুভ বুদ্ধি সকলই তোমার দান। সুতরাং আশ্রিতে ছলনা করিও না; তাহার উপর কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ কর। দেব! প্রসন্ন হও। তোমার ইচ্ছার অধীন কর। তোমার সংসার মায়ায় মুগ্ধ করিও না। সংসারাবর্ত্তে পড়িয়া যেন তোমায় বিস্মৃত না হই।" গৃহে, বাহিরে সর্ব্বত্র লাঞ্ছনা ও উপদেশে তুকারাম অস্থির হইয়া পড়িলেন। সংসারের প্রতি অবহেলা করা উচিত নয় ভাবিয়া তিনি পুনরায় ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করিলেন। তাহার চারিটী বৃষ ছিল। তিনি তাহাদিগের পৃষ্ঠে ভারার্পণ করিয়া স্বদেশবাসী অপরাপর বণিক্দিগের সহিত বিদেশে ব্যবসায় করিতে যাত্রা করিলেন। সে সময় পথ ও পথপার্শ্ববর্ত্তী অরণ্যসমূহ দস্যু ও তস্করে পরিপূর্ণ ছিল। সুযোগ পাইলেই তাহারা নিরীহ পথিক ও বণিক্গণের উপর অত্যাচার পূর্ব্বক তাহাদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করিত। তুকারাম যখন অপরাপর বণিক্গণের সহিত বিদেশে যাত্রা করিতেন, তখন তিনি এরূপ উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতেন যে তাহার সঙ্গিগণ তাহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া পড়িত ও তাহার সঙ্গত্যাগ করিতে কামনা করিত। একদিন মধ্যাহ্নে কোন বনপথে তাহার একটী বৃষ পদে আঘাত প্রাপ্ত হয়। বাধ্য হইয়া তাহাকে বনমধ্যে বৃষের আরোগ্যের জন্য অপেক্ষা করিতে হইল। কিন্তু তাহার স্বার্থপর বন্ধুবর্গ কেহই তাহার জন্য অপেক্ষা করিল না। ক্রমে দিনমণি অস্তাচলে গমন করিলেন; সন্ধ্যা হইল; পরে সন্ধ্যা গভীর রাত্রিতে পরিণত হইল। তিনি একাকী তাহার বৃষগুলি লইয়া বনে হরিনাম করিতেছেন। বিঠোবার কৃপায় সেই রাত্রে কোথা হইতে এক অপরিচিত পুরুষ আসিয়া তাহাকে অযাচিতভাবে যথেষ্ট সাহায্য দান করিল এবং তাহার বৃষটী সুস্থ করিয়া তাহাকে বনের বহির্দ্দেশে উপস্থাপিত করিয়া দিল। অনন্তর তিনি গন্তব্য স্থলে তাহার পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে রোগাক্রান্ত হইয়া তাহার তিনটী বৃষ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তিনি

দুঃখিত অন্তঃকরণে দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তাহারই অযত্নে বৃষগুলি প্রাণত্যাগ করিয়াছে এই বলিয়া সকলে তাহাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। কেবল তাঁহাকে নয়, বিঠোবার সেবা করিয়াই তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন, তাহারা এ কথারও উল্লেখ করিতে ক্ষান্ত হইলেন না। বিষ্ণু পূজায় কাহারও মঙ্গল হয় না। নল, হরিশ্চন্দ্র, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি কেহই কখনও দেবতার পূজা করিয়া শ্রীসম্পদ্ লাভ করিতে পারেন নাই। সুতরাং তুকারামের পক্ষেও মঙ্গললাভ করা নিতান্ত দুরাশা। সাংসারিক দুরবস্থায় তাহার দ্বিতীয় পত্নী বড়ই মুখরা ও কলহপরায়ণা হইয়া পড়িলেন। তিনি তাহাকে দিবারাত্র তিরস্কার ও ভৎ'সনা করিতেন। আত্মনিন্দা অপেক্ষা বিঠোবার অপযশ শ্রবণেই তাহার মর্ম্মান্তিক পীড়া হইতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

কাঁচা আমি আর পাকা আমি।

এই হাড় মাসের দেহ, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির কোনটা আমি? বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, যে আমি এ সকলের কেহ নহি। স্থূলবুদ্ধি, মায়াবদ্ধ দৃষ্টিতে দেখিলে "আমি"র কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। পিঁয়াজের খোসা ছাড়াইতে ছাড়াইতে অবশেষে যেমন কিছুই পাওয়া যায় না, তদ্রূপ যিনি মনোজয় করিতে পারেন নাই, যাহার পরমার্থ দৃষ্টি লাভ হয় নাই, তিনি তাহার আমিত্বের কোন সন্ধান পান না। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চিন্তায় রত হইলে অন্ধকার বা শূন্য ভিন্ন অপর কোন বস্তুই উপলব্ধি করিতে পারে না। কিন্তু দিব্যদৃষ্টি শক্তিসম্পন্ন মনোজয়ী জ্ঞানী পুরুষ, দেখেন যেখানে মনোবুদ্ধি বাক্য গমন করিতে পারে না, সেই ইন্দ্রিয়াতীত প্রদেশে শূন্যের সাক্ষী ও শূন্যের দ্রষ্টাস্বরূপে তাহার "আমি" বিরাজ করিতেছে। "আমি" শূন্য নহে, বরং যিনি শূন্যকে উপলব্ধি করিতেছেন, 'আমি' সেই শূন্যের দ্রষ্টা। জ্ঞানী ব্যক্তি জানেন, "আমি" মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, শ্রোত্র, জিহ্বা, ঘ্রাণ, নেত্র, ব্যোম, ভূমি, তেজঃ, বায়ু, প্রাণ, ধাতু, কোষ,

দ্বেষ, রাগ, মোহ, লোভ, মদ, মাৎসর্য্য, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, পাপ, পুণ্য, সুখ, দুঃখ, ইত্যাদি কিছুই নহে। আমি "চিদানন্দরূপ শিবোঽহম্‌, শিবোঽহম্‌"। জ্ঞানী দেহাদিবুদ্ধি রহিত, সুতরাং তিনি তাহার আমি আত্মাকে সর্ব্বভূতস্থ পরমাত্মার সহিত অভিন্ন দেখেন, আর ভক্তগণ তাঁহার 'আমি'কে প্রভুর দাস, যন্ত্র ইত্যাদি জ্ঞান করেন; প্রভুই তাহার নেতা, যন্ত্রী; ভক্তের স্বতন্ত্রত্ব নাই, প্রভুই তাঁহার সর্ব্বময়কর্ত্তা। জ্ঞানী ও ভক্তের এবংবিধ "আমি" বোধ, পাকা আমি; আর যে 'আমি'তে আপনাকে বিশিষ্ট উপাধি বা ধর্ম্মযুক্ত বলিয়া মনে হয়, তাহা কাঁচা 'আমি'। কাঁচা 'আমি'র মূল অভিমান। যতদিন না অভিমানমূলক কাঁচা আমি বিনষ্ট হয়, ততদিন জীবের শান্তি নাই। এই হেতু সাধকগণ আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন :—

কবে আমার আমি যাবে।
তুমি উদয় হয়ে বিদায় দেবে।
আমি জাগি আমি ঘুমাই, ঘুমালে আর আমি নাই।
এমন কাঁচা আমি, কাজ কি আমার—আমি গিয়ে তুমিই রবে॥
আমি থেকে তোমায় হারাই, এমন আমির মুখে দি ছাই।
(এবার) আমার আমি করে কমি,
(তোমার) দাস আমি তুমি বলাবে॥

প্রেমিক তুলসীদাসও বলিয়াছেন :—

দয়া ধরম কা মূল হ্যায়, নরকমূল অভিমান।

সাধক কবি রামপ্রসাদ বলিয়াছেন :—

ছাড়বো না তোর চরণ দুটী তুই যে মা আমার।
ভোলানাথের ভান বুঝেছি, ভুলবো না এবার॥
ছেড়ে, অভিমানের ছলা, পা পেয়েছে পাগল ভোলা।
(ফণি সনে বিষপানে শ্মশানে খেলা)
মরা সেজে বুকের মাঝে ধরেছে চরণভার;
নামটী মা তোর শবাসনা, পায়না চরণ মরা বিনা,
হব মরা "আমি" হারা, আমি রবো না;—
নাশি নিজ অভিমানে রব পদে শবাকার॥

ঈশদূত যীশু বলিতেন, যদি তুমি অনন্ত জীবন চাও, তাহা হইলে তুমি জগতে

মৃত হইয়া যাও, অর্থাৎ শরীর, মন, ইন্দ্রিয়াদি ভোগসুখে মত্ত হইও না, আত্মানন্দে বিভোর হও। আমিত্বের দিক্ হইতে ফিরিয়া বিশ্বের দিকে দৃষ্টিপাত কর। আপনাকে উদ্বোধিত কর, আপনাকে বিকশিত কর ও বিশ্বাত্মার সহিত আপনাকে মিলাইয়া দাও। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব এ সম্বন্ধে অনেক হিতগর্ভ উপাখ্যান বলিতেন।

গীতাতে শ্রীভগবান্ জীবের হিতার্থে সকল কর্ম্ম তাঁহাতে অর্পণ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। ভগবানে কর্ম্মফল সমর্পণ করিলে আর ভাবনা থাকে না। তখন কাঁচা আমি বিনষ্ট হইয়া যায় ও পাকা আমির বিকাশ পায়। অতএব মানবমাত্রেরই কর্ত্তব্য তাঁহাকে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ করা; অহংভাবশূন্য ভক্তের আচরণ সম্বন্ধে গীতার একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া স্পষ্ট উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

মন্মনাঃ ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি কৌন্তেয়! তস্মাদ্ যুদ্ধস্ব ভারত॥

হরিদ্বারে গঙ্গা

[১]

অচ্যুত চরণ চ্যুতা মাতঃ ভাগিরথি!
মুক্তি দিতে অভিশপ্ত সগর সন্তানে,
প্রবাহিত অবনীতে প্রেমানন্দে মাতি
কত তীর্থস্থান রচি সাগর সন্ধানে।

[২]

সগর্ব্বে ধবল শুভ্র চঞ্চল অঞ্চল
দুলাইয়া পাশমুক্ত কেশরীর মত,
হুহুঙ্কারে দিবারাত্র কল কল কল
উদ্ধারিতে পাপী তাপী হয়েছ ধাবিত।

[৩]

বিপদেতে মহাশক্তি শিখাবারে নরে
পাষাণ প্রাচীর বক্ষ করি বিদারণ,
ছুটিয়া চলেছ শক্তি অয়ি মনোহরে
পদভরে দলি কত গিরি উপবন।

[৪]

কর্দ্দম বালুকাশূন্য খণ্ডিত উপল,
পরিপূর্ণ অগভীর শুভ্র স্বচ্ছ নীরে
যোগী ঋষি নরনারী ভকতি বিহ্বল
পূজিতে নিরত তোমা মনোরম তীরে।

[৫]

প্রমত্ত যৌবনরূপা বিশ্রাম বিহীনা
মধুর গম্ভীর ভাবে কর উদ্বোধন,
ঝঙ্কারিয়া মুহুর্মুহু তব বজ্র-বীণা
উত্তিষ্ঠত সুপ্ত আত্মা ছেদহ বন্ধন।

ব্রহ্মচারী নির্ম্মল চৈতন্য

—০:(*):০—

গলদ কোথায় ?

আমাদের দেশে অসংখ্য ধর্ম্মসম্প্রদায় ও বেদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি অসংখ্য ধর্ম্ম-শাস্ত্র রহিয়াছে। ধর্ম্মমতের বা সাধন পদ্ধতির কোন অভাব নাই। কিন্তু এত ধর্ম্ম-শাস্ত্র ও ধর্ম্মমত প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও প্রকৃত ধার্ম্মিক, সত্যদ্রষ্টা পুরুষ দেখা যায় না কেন ? দেশে নিত্যই নূতন নূতন সম্প্রদায় ও সংঘের সৃষ্টি হইতেছে ; একে অপরের প্রচারিত মতবাদের নিন্দা ও কটূক্তি করিতেছে ; সত্যোপলব্ধি ও সাম্যভাব প্রতিষ্ঠাত দূরের কথা, পরস্পরের প্রতি দ্বেষ, হিংসাদি ভাব পর্য্যন্ত পোষণ করিতেছে। অপরের কুৎসা চেষ্টায় যে আপনার নীচ প্রকৃতি প্রকাশ পায়, এ কথা কেহ ভাবিবার সময় পর্য্যন্ত পাইতেছে না। দেশের ধর্ম্মের অধঃপতনের কারণ কি ? ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র সত্য, দেশের ধর্ম্মমতগুলিও সত্য, কিন্তু কালের কুটিলা গতির প্রবাহে দেশের অবস্থার বিষম পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে অধুনা নানা কারণবশতঃ শারীরিক ও মানসিক শক্তির বিলক্ষণ হ্রাস পাইয়াছে। শরীর এখন বিবিধ ব্যাধিযুক্ত ও বলহীন এবং মন চিন্তার ভারে নিষ্পেষিত। কোন গুরুতর বিষয় লইয়া দীর্ঘকাল যথাযথ চিন্তা করিতে সাধারণের মন বিশেষরূপ অক্ষম ; তাহার সঙ্গে শরীরও উক্ত চিন্তার বেগ বা মানসিক পরিশ্রমের ভার বহন করিতে অক্ষম। কোন কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে হইলে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ শক্তির আবশ্যক কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় শরীর ও মন উভয়ই দুর্ব্বল। এমত অবস্থায় কে কার্য্য করিবে ? আর কার্য্য বিনা ফল বা কিরূপে সুলভ হইবে ? শরীর ও মন পরস্পরের প্রতিকূল আচরণ করিতেছে। যেখানে শরীর কার্য্যপটু, সেখানে হয়ত মন দুর্ব্বল ও উপযুক্ত সংস্কার শূন্য। যেখানে আবার ইচ্ছা আছে, সেখানে হয় ত কার্য্য করিবার শক্তি নাই। সুতরাং আমাদের দেশে বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র ও বিবিধ ধর্ম্মমত বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও আশানুরূপ ফললাভ হইতেছে না।

ধার্ম্মিক হওয়া—ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত হওয়া, কল্পনা বা জল্পনা নহে। কার্য্যকর ধর্ম্মানু-ভূতি লাভ করা আয়াস সাধ্য। অন্তর্নিহিত কুবাসনা ও কুসংস্কারগুলি একে একে পরিত্যাগ করিতে হইবে। প্রবৃত্তির গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতে হইবে। শরীরকে উক্ত কার্য্যের উপযোগী করিয়া লইতে হইবে এবং মনকে সিদ্ধি লাভের জন্য উৎসাহী

ও উদ্যোগী হইতে হইবে। অষ্টপাশবদ্ধ জীব, অষ্টপাশ মুক্ত শিব। লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্তিগুলি যতদিন মানবমনের উপর আধিপত্য বিস্তার করে, ততদিন তাহারা জীব। যখন মানব এই সকলের বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, যখন দয়া, প্রেম, প্রীতি, সততা প্রভৃতি তাহার চরিত্রকে অলঙ্কৃত করিতে থাকে। তখনই তাহার মধ্যে দেবমানবত্বের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু জীবভাব পরিত্যাগ করিয়া শিবভাবের বিকাশ করা আয়াস সাপেক্ষ। আগে শক্তির আরাধনা কর। শক্তিহীন পুরুষ কর্ম্মকে কখনই উপলব্ধি করিতে পারে না। শাস্ত্রের ভাবগুলিকে প্রথমতঃ ধারণা করা চাই। সেগুলি পুনঃ পুনঃ শ্রবণ ও মনন করা আবশ্যক; তাহার পর তাহাদিগের নিদিধ্যাসন। এদেশের লোকের এখন সে বল নাই সুতরাং কার্য্য করিবে কে? শাস্ত্র আছে সত্য, ধর্ম্মমত আছে সত্য, কিন্তু তাহা উপলব্ধি করিবার উপযুক্ত অধিকারী কৈ?

অবিনাশচন্দ্র বিশ্বাস

পশুপতিনাথ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এবার চন্দ্রগিরির চড়াই। এ রাস্তাটা বড়ই কষ্টকর বোধ হচ্ছিল। একে খাওয়ার পর, তায় বৃষ্টির ভয়, সন্ধ্যা হ'লে অসুবিধা হ'বে তাই উঠতেও হচ্ছে তাড়াতাড়ি, অথচ পথ একেবারে সোজা উঁচু। শীশাগরিও চড়াই কিন্তু আঁকাবাঁকা রাস্তা আর সে রাস্তাও ভাল। এ একেবারে সোজা উঠতে হয়, পাথর সব খসে খসে আছে, কখন পা পিছ্‌লে একেবারে কোথায় নেবে যেতে হ'বে তার স্থিরতা নাই। মোট কথা যাওয়ার পথে এই চন্দ্রগিরির চড়াইয়ের মত কষ্ট আর কোথাও মনে হয় নাই। এর মধ্যে লোকালয় নাই, জল নাই। তবে পথে দুটী জলসত্র আছে। তাতে "ঠাণ্ডি" সরবতের ব্যবস্থা ছিল। "ঠাণ্ডি" সরবত পশ্চিমের একটা নিজস্ব জিনিষ। মিষ্টি, গোলমরীচ, বাদাম প্রভৃতি দিয়ে তৈরী হয়—সাধুরা এ খুব পসন্দ করেন এবং মধ্যাহ্নে শ্রান্ত অতিথিকে তাঁরা এ দিয়েই সাধারণতঃ অভ্যর্থনা

করেন। জিনিষটীও খুব উপাদেয়। পরে শুনলাম সেখানকার কোন ইঞ্জিনিয়ার নিজের খরচে এ সত্রের ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর দয়ার সীমা নাই।

'চন্দ্রগীর' উঠতে প্রায় সাড়ে চারটা হ'ল। এবার আবার উৎরাই, তবে সে রাস্তাটা অনেক ভাল, একই পাহাড়ের গা ব'য়ে ধীরে ধীরে এঁকেবেঁকে (zigzag) সে পথ নেমে গেছে "আনকট্ পর্য্যন্ত। এই চন্দ্রগীর পাহাড়ের উপর উঠলে শেষ সূর্য্যরশ্মি, শ্বেতপর্ব্বতচূড়া ভারি সুন্দর দেখায়। আর নীচে কাটমুণ্ডের দৃশ্যে যেন স্বপ্নপুরীর সেই ঘুমন্ত রাজকন্যার পিতৃরাজ্যের কথা মনে পড়ে। চারদিকে পাহাড়ের মাঝখানে সেই সমতল ভূমিতে নেপালের রাজধানী কাটমুণ্ড যেন প্রেমিকের গোপন কথার মতই রঙ্গিন সুন্দর। যেন তাকে হিমালয় গোপন করে রেখেছে, পাছে কেউ দেখে। বাবা পশুপতিনাথের জয় গেয়ে আমরা ধীরে ধীরে নেবে যেতে লাগলাম আমাদের অজ্ঞাত পথের অবসানের আনন্দে।

আনকোট যখন পৌঁছেছি তখন ছয়টা। আনকোটেও কয়েকখানা চটি আছে। সেখানেও একজন অফিসার আমাদের অনেক রকম প্রশ্ন করলেন। তার পর সেখানে কুলিকে বিদায় দিয়ে আমরা মটরে চড়লাম। বারবারই কুলিটা জিজ্ঞেস করেছিল তার রসিদে কি লিখলাম। যখন বুঝিয়ে দিলাম তার ব্যবহারে আমারা সন্তুষ্ট হ'য়েছি, আমরা ভালই লিখেছি তখন যে খুসী হ'য়ে চলে গেল। বাস্তবিক নেপাল গভর্ণমেণ্টের এ সব সুব্যবস্থার জন্য প্রশংসা করতে হয়। আনকোটে অন্নসত্রে আমাদের তারা আদর করলে। আমাদের প্রয়োজন ছিল না তাই আমরা তাদের ধন্যবাদ দিয়ে মটরে বাবা পশুপতিনাথের মন্দিরের দিকে রওনা হ'লাম। কাটমুণ্ডের মধ্য দিয়ে মটর মন্দিরের দিকে ছুটলো।

সহরটী ভারতের অন্যান্য সহরেরই মত এর বিশেষত্ব কিছু তেমন দেখলাম না। হাঁসপাতাল, স্কুল, কলেজ, রমনার মাঠ, হাট বাজার চক সবই ভারতের অন্যান্য জায়গার মত। তবে নেপাল সহরটী যে প্রায় ৮।১০ মাইল বড় এ ধারণা পূর্ব্বে আমাদের ছিল না। আর একটী বিশেষত্ব প্রত্যেক রাস্তার মোড়েই প্রায় গণেশ বা বিষ্ণু বা শিব মন্দির আছে—ভারতের অন্যান্য পানের দোকানের পরিবর্ত্তে। সে সব মন্দিরে বৌদ্ধধর্ম্মের ছায়া বর্ত্তমান। কারণ বিগ্রহ হিন্দু দেবতার হইলেও,

বাহিরের ভ্রাগণ আর প্যাগোডার আকারের মন্দিরচূড়া বৌদ্ধ সভ্যতার ভগ্নাবশেষ ছাড়া আর কি বলিব।

মন্দিরদ্বারে পৌঁছিলাম সন্ধ্যার পর। এক ভদ্রলোকের কৃপায় বাগমতী তীরেই এক ধর্ম্মশালায় আশ্রয় জুটিল। বিশ্রাম করিয়া তখনই হাত পা ধুইয়া সন্ধ্যা সারিয়া বাবার মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। ঠাকুরের অশেষ কৃপা, আমাদের মত দুর্ব্বল বাঙ্গালীর পক্ষে এমন দুর্গম পর্ব্বত বহিয়া নির্ব্বিঘ্নে তাঁর শ্রীচরণে এসে পৌঁছান যে কতদূর অসম্ভব তা বেশ উপলব্ধি করিতে পারি।

মন্দিরটী বেশ বড় উপরটা পিতলের ছাউনি, থাকে থাকে সাজান অনেকটা প্যাগোডারই মত নীচে সব কাঠের কাজ করা তাতে বিষ্ণু শিব ও অন্যান্য দেব-দেবী মূর্ত্তি। চারিদিকে শ্বেতপাথরের বারান্দা মধ্যেও বারান্দা তার মধ্যে রেলিং দেওয়া ঠিক মাঝখানে ঘরের মধ্যে সেই জ্যোতির্লিঙ্গ। উপরে লিঙ্গমুখ চারিদিকে পার্ব্বতী, শঙ্কর, শ্রীরাম ও শিবের মুখ আঁকা পাশে দুখানি করিয়া হাত সোনার চোখ, চন্দন, কাপড় ও মাথায় সোনার সাপ দিয়ে বেশ সাজান হয়। মন্দিরের চারিদিকে স্থানও বেশ বিস্তৃত। একদিকে বাহন ষাঁড় তার সামনেই নন্দীর বিরাট মূর্ত্তি। এক পার্শ্বে, লক্ষ্মী নারায়ণ প্রভৃতি দেবতার ভিন্ন ভিন্ন মন্দির। প্রাঙ্গণে পঞ্চমুখ শিব, তাঁর পাশেই শ্রীবিষ্ণুর অনন্তশয্যা। এখানেও কাশীর মত শিবের কাছাড়ী, তাতে অসংখ্য শিবলিঙ্গ। প্রাঙ্গণটী বেশ বিস্তৃত। একপাশে ছোট একটী দ্বার থাকিলেও বস্তুতঃ মন্দিরের প্রাঙ্গণ হইতে বাহির হইবার একটী সিংহদ্বার দক্ষিণদিকে, আর একটী নদীর দিকে (উত্তরদিকে); নীচে বাগমতী অমৃতধারা। অনেক সিড়ি ভাঙ্গিয়া নদীতে নামিতে হয়।

বহুলোক এই উপলক্ষে আসিয়াছিল। এমন দুর্গম রাস্তা তাতেও এত লোক সমাগম বস্তুতঃই জাতির ধর্ম্মপ্রাণতার সাক্ষী দেয়। বাঙ্গালীর সংখ্যাও প্রায় দুই শত হইবে। কত স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ অন্ধের সাহায্যে দেবদর্শনাভিলাষে গিয়াছে। সাধু সন্ন্যাসীও অনেক আসিয়াছিল। বিদেশীদের মধ্যে যুক্তপ্রদেশের লোকই দেখিলাম বেশী।

পরদিন প্রাতে বাবার দর্শনান্তে আমরা স্থানীয় অন্যান্য মন্দির দর্শনের জন্য বাহির হইলাম। "গৌর পার্ব্বতী"—স্রোতধারার বুকে প্রস্তরে মূর্ত্তিচিহ্ন। বহুলোক দর্শনে যায়। সামনেই একখানা ছোট পাহাড়ের উপর "থিরাটেশ্বর" শিবমূর্ত্তি।

"গুহ্যেশ্বরী" মন্দির খুব সুন্দর, উপরে সর্পের চূড়া। মাতৃমূর্ত্তি। সেখানেও খুব ভিড়, সেখানকার এই বোধ হয় একমাত্র দেবীমন্দির। "বিশ্বরূপ" মূর্ত্তিও খুব বিরাট। মন্দিরটীও বড় চারিদিকে আঙ্গিনাও বড়। পাশেই রাম-মন্দির, রত্নেশ্বর, গণেশ, রামসীতা প্রভৃতি মন্দির। দূরে যে সব মন্দির আছে তার মধ্যে নীলকণ্ঠ, "দত্তাত্রেয়" প্রধান। "দাত্তাত্রেয়" নাকি বাবা পশুপতিনাথের গুরু। প্রকৃতপক্ষে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি। এই মন্দিরটী বোধ হয় খুব প্রাচীন। মন্দির গাত্রে সব কাঠের কাজ, দেবদেবী মূর্ত্তি, নানাপ্রকার ফুল লতা আঁকা। তাতে মনে হয় এক সময় এদেশে এ সব কলার খুব আদর ছিল। (ভাডগাওয়ে এমন অনেক প্রাচীন গৃহে ও জানালায় দরজায় অনেক পুরান কাজ দেখিতে পাইলাম। আজ সে সব জিনিষের আদর নাই, স্বাধীন নেপালও সে সম্পদ হারাইয়াছে। দত্তাত্রেয় মন্দিরের পাশে "অষ্টভূজ বিষ্ণু" মন্দির। ভীমসেনের মন্দিরে ভীমসেনের বিরাট মূর্ত্তি। তাতে এত ভিড় হইয়াছিল যে আমাদের বাহির হইতেই প্রণাম করিতে হইয়াছিল। "ত্রেতানাথ" মন্দির, সেখানে যাওয়ার আমাদের সময় এবং সুবিধা হয় নাই। "মুক্তিনাথ" নেপাল হইতেই যাইতে হয়, সে বহুদূরে হিমালয়ের জঙ্গল ভাঙ্গিয়া যাইতে হয়। তেমন বিশ্বাসী এবং শক্তিশালী না হইলে সে স্থানে সকলের যাওয়া সম্ভব নয়।

(ক্রমশঃ)

ডাঃ শ্রীঅমলেন্দু কুমার সেন।

এম, ডি (হোমিও) এফ্, আর্, এইচ্, এস্।

তোমার প্রকৃত স্বরূপ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

হে বেদ্যবিদ্বর! পরমার্থ বুদ্ধিতে তোমার প্রকৃত স্বরূপে অবস্থিত হইয়া লৌকিব সর্ব্ববিধ ব্যাপারে নিযুক্ত হও। জানিও জন্মমরণাদিরহিত ষড়্বিকার মুক্ত সর্ব্বভূতাত্মা তোমার স্বরূপ ও তুমিরূপ অভিমানী আত্মা উভয়েই এক। অতএ

তুমি ক্ষুদ্র অহংতা, মমতা প্রভৃতি ভাব একেবারে ত্যাগ কর। সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি হইয়া সুখে দুঃখে নির্ব্বিকারচিত্তে যথাপ্রাপ্ত কর্ম্ম সমুদয় সম্পাদন কর। বায়ুমণ্ডল যেমন আকাশকে ধূলিধূসরিত করিতে পারে না, তদ্রূপ সাক্ষিস্বরূপ আত্মাকে সুখদুঃখ, ভাল মন্দ কোন ব্যাপারই লিপ্ত করিতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্পর্ক হইতে সুখ দুঃখের উৎপত্তি ; জ্ঞানী বলেন, "দেহ জানে দুঃখ জানে, মন তুমি এদের নহেক কেহ।" শরীর ও মন স্ব স্ব ধর্ম্মপালন করিতে থাকিলে স্বাধীন স্বতন্ত্র আত্মা তাহাদিগের কর্ম্মপাশে জড়িত হন না। চক্ষুই দর্শন করে, কর্ণই শ্রবণ করে, মনই মনন করে, এ বিষয়ে আত্মার কর্তৃত্বাভিমান নাই। জ্ঞানিগণ ইহা জানিয়া সর্ব্ববিষয়ে অভিমান ত্যাগ করেন। তাহারা চিত্তশুদ্ধির জন্য, লোকশিক্ষা ও শাস্ত্রের সম্মানরক্ষার জন্য, নিষ্কামভাবে কায়মনোবাক্যে ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি নিরভিমান, ক্ষমাবান্, সুখে দুঃখে সমচিত্ত, সে ব্যক্তি কোন কর্ম্ম করুক বা না করুক, কোন কারণে তাহাকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয় না। হে মানব! তুমি আত্মদেহকে ব্রহ্মময় ভাবিয়া আত্মকর্ম্মকে ব্রহ্মকর্ম্মে পরিণত কর ও ঐ কর্ম্মকে ব্রহ্মে সমর্পণকরতঃ ব্রহ্মস্বারূপ্য লাভ কর। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে বিরাজমান আছেন জানিয়া তুমি সকলের সঙ্গত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে আত্মসমর্পণ কর ; ব্রহ্মে আত্মসমর্পণ করাই সন্ন্যাস। উহা দ্বারা সঙ্কল্পের ক্ষয়, বাসনার বিলয় সাধিত হয় ও নির্ব্বিকল্প সমাধি আয়ত্ত হয়। ব্রহ্মময় চিত্তের একাগ্রতাই জ্ঞান ; চিত্তের ব্রহ্মমুখী অনুকূলধারা দ্বারা ব্রহ্মোপলব্ধিযোগ অভ্যস্থ হয়। "সকলই ব্রহ্মময়" এইরূপ ধারণাই ব্রহ্মার্পণ। নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব ধারণায় অক্ষম ব্যক্তি সগুণ ঈশ্বরের পূজা ও আরাধনা দ্বারা অবশ্য আত্মকর্ম্ম নিয়মিত করিবেন। প্রকৃষ্টরূপে চিত্তশুদ্ধ হইলে পর, কালে এরূপ মানব নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব ধারণা করিতে কৃতকার্য্য হইয়া থাকে। হে মানব! যাহা অখিল শরীরীর অন্তরে সামান্য সত্তারূপে বিরাজমান, যাহা দুগ্ধ, জল ও লবণের মধ্যে রসরূপে বিরাজিত, যাহা মণিগণে সূত্রের ন্যায় সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠানকারী যাহা ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত নিখিল পদার্থের প্রকাশকারী, তাহাই সুখদুঃখ বিনির্মুক্ত অব্যয়পদ বা তোমার প্রকৃত স্বরূপ।

(ক্রমশঃ)

অক্রুর সংবাদ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রজকের বাক্য শুনি মনে ভাবে চিন্তামণি
কংস দাস তমোর আধার।
তমো গুণ করি নাশ, কংসের বাড়াব ত্রাস,
বুঝিবে সে প্রভাব আমার ॥
এই বলি অবহেলে ধরিয়া তাহার চুলে,
বিনা অস্ত্রে করিল সংহার।
দেখিয়া কৃষ্ণের শক্তি বাড়িল সবার ভক্তি
সবে স্তব করিল তাহার ॥
বিনা অস্ত্রে কাটে মাথা বায়ুবেগে এইকথা
মথুরায় হইল প্রচার।
রামকৃষ্ণে দেখিবারে আসে লোক সারে সারে
শুনি কংস কাঁপে অনিবার ॥
হাতেতে কাটিল মাথা বলিতে আশ্চর্য্য কথা
বলিতে না সকলে পারিল।
হা-মা-কা বলি তবে গণ্ডগোল করে সবে
জনরব ভীষণ হইল ॥

(বর্ণনা)

রজকেরে মুক্তিদান করিয়া আপনি।
কংসালয় অভিমুখে যান যদুমণি ॥
কংসালয়ে রামকৃষ্ণ করিছে গমন।
এই কথা পুরবাসী শুনিল যখন ॥
নরনারী মথুরায় যে যেখানে ছিল।
রাম কৃষ্ণে দেখিবারে ছুটিয়া আসিল ॥

গৃহকর্ম্ম পরিহরি আপনা ভুলিয়া।
মথুরাবাসিনী সবে আসিল ছুটিয়া॥
রামকৃষ্ণে দেখি সবে বলিতে লাগিল।
কেমনে এ দুটী চাঁদ ভূতলে আসিল॥
অনুপম কৃষ্ণরূপ দেখিয়া নয়নে।
বলে সবে হেন রূপ আছে কি ভুবনে॥
এই বলি মথুরায় যত নারী ছিল।
রামকৃষ্ণ গুণগান করিতে লাগিল॥

মথুরাবাসিনীর উক্তি :—

এমন রূপের ছটা।
ভুবন মোহন　　বেশ করেছে
যেমন মেঘের ঘটা॥
বন ফুলে　　চূড়া বাঁধে
কিবা ছলে নাট।
সোণার থোপে　　কসে বাঁধে
যেন মুকুতার হাট॥
মণি মাণিকে　　গাঁথা মালা
তায় দিয়াছে বেড়া।
ময়ুর পাখা　　উড়ে বায়ে
কিরণ মাখা চূড়া॥
কোন যুবতী　　বাঁধে চূড়া
সেই সে আপন মনে।
হাঁসির ঠাটে　　পরাণ টুটে
মধু ঝরে খনে॥

গলায় মালা ভুবন আলা
হাতে মোহন বাঁশী।
দেখি মদন হয় অচেতন
দেখি রূপ রাশি
প্রেম নাগরীর কথা শুনে
কহে চণ্ডীদাস।
ও রূপ দেখি কোন্ যুবতী
ঘরে করে বাস॥

(বর্ণনা)

এই কথা বলি সবে ভাবে মনে মনে।
জানিনা গোপীরা কৃষ্ণ পাইল কেমনে॥
কেহ বলে মরি মরি কিরূপ মাধুরী।
জন্মে জন্মে হই যেন কৃষ্ণের কিঙ্করী॥
কেহ বা দেখিয়া কৃষ্ণে আপনা হারায়।
প্রেমানন্দে মগ্ন হয়ে কৃষ্ণনাম গায়॥
যাইতে যাইতে কৃষ্ণ দেখিল চাহিয়া।
তন্তুবায় যায় এক রাজপথ দিয়া॥
করেতে রয়েছে তার সুন্দর বসন।
দেখিয়া তাহারে কৃষ্ণ বলিল তখন॥
বড়ই সুন্দর হেরি তোমার বসন।
নব বস্ত্র লয়ে কোথা করিছ গমন॥
তন্তুবায় বলে আমি যাই কংসালয়ে।
এই বস্ত্র দিব আমি রাজারে পড়ায়ে॥
কৃষ্ণ বলে যদি তুমি প্রফুল্ল অন্তরে।
এই বস্ত্র পড়াইয়া দাও আজি মোরে॥
তা' হলে তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া।
বৈকুণ্ঠ ধামেতে মোর দিব পাঠাইয়া॥

তাঁতী বলে সেথা গিয়ে মোর কিবা হবে ।
সেখানে আমার বস্ত্র কে বল কিনিবে ॥
আছে কি সুতার হাট তোমার দেশেতে ।
সস্তায় পাইব আমি সে সুতা কিনিতে ॥
তা হলে না হয় ভাই তোমার কথায় ।
বৈকুণ্ঠে যাইতে পারি ছাড়ি মথুরায় ॥
এ হাটে সুতার দর চড়ে গেছে ভারী ।
সেই হেতু সুখে কার্য্য করিতে না পারি ॥
যদি তুমি সস্তা দরে সুতা দাও মোরে ।
তা' হলে এখনি বস্ত্র পড়াই তোমারে ॥
শ্রীকৃষ্ণ তখন বলে গেলে সে হাটেতে ।
সুতার ভাবনা আর হবেনা ভাবিতে ॥

(গীত)

এ হাটে বিকায় না অন্য সুত,
(কেবল) বিকায় নন্দরাণীর সুত ।
দর না জেনে নামটী শুনে,
ভয়ে পালায় রবিসুত ।
হাটের প্রধান তাঁতী,
পশুপতি আর প্রজাপতি ;
আছে শত শত আর আর তাঁতী
তাদের কেবল গতায়তি,
যে না চেনে নন্দসুত,
এ জগতের পশু সে তো,
যে চিনেছে এই খাঁটী সুত,
চায়না সে আর দারা সুত ॥

(ক্রমশঃ)

—:•(*):•—

স্বগত।

মন! তুমি কি চাও? আমি যে তোমায় কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না, কোনরূপে তোমার অন্ত পাইলাম না; তোমার তৃপ্তি কিসে হবে, তোমার তৃষ্ণা কিসে দূর হইবে—আমি যে কিছুতেই তাহার ঠিক ঠিকানা পাইলাম না। যখন আমি শিশু ছিলাম, অপরের উপর নির্ভর করিতাম, তখন ত জনক জননী, ভাই বোন, আত্মীয় স্বজন, দাসদাসীর সকলের নিকট যথেষ্ট আদর লাভ করিয়াছি, বাল্যে বিবেকবিহীন অকারণ কত হাঁসিকান্না, হর্ষবিষাদ সকলই লাভ করিয়াছি; আপন ইচ্ছায়, আপন খেয়ালের বশে আমার শারীরিক ও মানসিক সুখ দুঃখের অধিকারী করিয়াছ। যৌবনে বিদ্যাশিক্ষা, দেশভ্রমণ, জ্ঞানার্জ্জন মিত্রসঙ্গ, আমোদ প্রমোদ কতরকম চর্চ্চায় না নিয়োজিত করিয়াছ! আমি এক্ষণে বার্দ্ধক্যে, মৃত্যুর দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেও এখনও আমাকে তুমি মুক্তি দাও নাই! তোমার অধীনতায়, ক্রীতদাসের মত আমি আজীবন কাটাইয়াছি; হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া, বিবেকের অনুমতি না লইয়া আমি চিরকাল অতিবাহিত করিয়াছি। কত শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের উপাসনা করিয়াছি, তবুও তুমি সন্তুষ্ট হও নাই। শুধু আমি নহি, আমার মত প্রায় সকল বালক, সকল যুবক ও সকল বৃদ্ধ তোমার সেবায় নিমগ্ন হইয়াছে ও হইতেছে। কেহ ত তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারিল না। তুমি বাসনা বিষে আপনি জর্জ্জরিত হইতেছে এবং আমাকেও জর্জ্জরিত করিতেছ। মন! তুমি কি চাও? দেখি আমার রোগ যেখানে, সাধারণের রোগও সেখানে। সকলের মত সমানভাবে অমূলক আনন্দ করিয়া আনন্দের সকল প্রকার উপকরণ উপভোগ করিয়াও নিরানন্দের ক্ষেত্র সৃষ্টি করিতেছি; আমি আরও কলুষ-কালিমাযুক্ত হইতেছি। কল্পিত সুখের সৃষ্টি করিয়া আলেয়ার পশ্চাদ্ধাবণ করিতেছি। আত্মতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষায় আত্মহারা হইয়া আগুণে দগ্ধ হইয়া ছটফট করিতেছি।

আনন্দলাভ করাই, শান্তিলাভ করাই, সকলের উদ্দেশ্য। এখন আনন্দলাভ কিসে? ভোগে কিছুতেই শান্তি মিলিবে না। আহুতি পাইলে অগ্নি যেমন

উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, ভোগে চিত্তের লালসা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে। কিছুতেই তাহার শান্তি মিলিবে না। এখন উপায় কি? মহাজনগণ যে পথে গমনকরতঃ পরাশান্তির অধিকারী হইয়াছেন, আমাদিগকেও সেই পথে চলিতে হইবে। মহাজনগণ ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া শান্তির অধিকারী হইয়াছেন। আমাদিগকেও ধর্ম্মপথ প্রশস্ত রাজপথের অনুসরণ করিতে হইবে। অহঙ্কারের বশে, স্বেচ্ছাচারিতার অধীনতায় মতিভ্রষ্ট হইয়া সুপ্রসিদ্ধ সুপ্রশস্ত রাজপথসদৃশ শান্তিপ্রদ ধর্ম্মপথ ত্যাগ করিয়া স্বকপোলকল্পিত পন্থায় বিচরণ করিলে কিছুতেই শান্তিলাভ হইবে না। সারা জীবনই দৌড়াইতে হইবে, কখনই লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারিব না। ধর্ম্মরূপ ধ্রুবতারা লক্ষ্য করিয়া না চলিলে পথহারা ব্যক্তিগণকে শান্তিহারা নাবিকের মত হইয়া সংসার সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে হইবে। আহারলুব্ধ বড়িশবিদ্ধ মৎস্যের ন্যায় চিরকাল দুঃখভাগী হইতে হইবে। কোনদিন শান্তি মিলিবে না। সংসারের অনিত্য সুখের লোভে পরমার্থ হারাইয়া দীন ভিখারীর অপেক্ষা হীন অবস্থায় পতিত হইতে হইবে। এক্ষণে আর উপায় নাই। শান্তির একমাত্র নিকেতন—প্রাণের আরামলাভের একমাত্র সম্বল ধর্ম্ম; তাহারই আশ্রয় লইতে হইবে। আর্ত্তত্রাণকর্ত্তা, কলুষহন্তা, শ্রীভগবানের শরণ লইতে হইবে। এস নাথ, দীন দয়াময়, রক্ষা কর, অকূলের তুমি কাণ্ডারী, অগতির তুমি গতি, অনাথের তুমি নাথ, অসহায় দীনের তুমি একমাত্র সহায় সম্বল ও বন্ধু, প্রভু কৃপা কর, প্রভু! আর্ত্তে ত্রাণ কর; তোমার আর্ত্তত্রাণকর্ত্তা নাম আরও মহিমাময় হউক!

"কাঙ্গাল"

জ্ঞান ও ভক্তি।

ঠাকুর শ্রীমুখে বলিয়াছেন, "শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধাভক্তি উভয়েই সমান। ঠিক ঠিক অদ্বৈতজ্ঞান ও একনিষ্ঠ ভক্তিতে কোন প্রভেদ নাই"। ভক্তের অনুভূতি ও জ্ঞানীর অনুভূতির মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। ভক্ত ভক্তি দ্বারা যাহাকে লাভ করেন, জ্ঞানী জ্ঞানচর্চ্চার সাহায্যে তাহাকেই উপলব্ধি করেন। ভক্ত বলেন, "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে"; জ্ঞানী বলেন, সমস্ত বস্তুর মধ্যে এক ব্রহ্মই বিরাজ করিতেছেন। ভক্ত দেখেন তাঁর ঈশ্বর—ইষ্টদেবতা জগতের সর্ব্বত্র বিরাজমান

আর জ্ঞানী অনুভব করেন, ব্রহ্মই সব হইয়াছেন। তদতিরিক্ত কোন অস্তিত্ব নাই। তাই কোন মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন, "নিগুর্ণ হ্যায় সো পিতা হামারা, সগুণ হ্যায় মাহতরী। কাকো নিন্দো, কাকো বন্দো, দোনো পাল্লা ভারী।" অর্থাৎ যিনি সগুণ তিনি আমার পিতৃস্থানীয়, যিনি নিগুর্ণ, তিনি আমার মাতৃস্থানীয়; সুতরাং কাহারই বা নিন্দা করিব আর কাহারই বা প্রশংসা করিব। উভয়েই আমার সমান শ্রদ্ধার বিষয়।

ঈশ্বর এক জানিয়া, আপনার রুচি বা গুরুর নির্দ্দেশ মত, এক ঈশ্বরে নিষ্ঠা স্থাপন করিয়া ধর্ম্মবিষয়ে উন্নতিলাভ করিতে হয়। নিষ্ঠা ব্যতীত উন্নতি হয় না। অবিশ্বাস বা অশ্রদ্ধা মহানিষ্ঠ বা চিত্তবিক্ষেপের হেতু। নিষ্ঠাই মহাপুরুষগণের জীবনের ধ্রুবতারা; উহাই তাহাদের জীবনগতিনিয়ামক। প্রহ্লাদ সর্ব্বময় হরিকে দেখিতেছেন; তিনি অনলে, অনিলে, গিরি শিখরে, হস্তি পদতলে এমন কি স্তম্ভে পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছেন কিন্তু দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু অদূরদর্শী তিনি কালী ও কৃষ্ণে ভেদ দেখেন। তাহার ঠিক ঠিক অদ্বৈতজ্ঞান হয় নাই সুতরাং নরসিংহ মূর্ত্তিতে ভগবান্ তাঁহার প্রাণ সংহার করিলেন। ভক্তরাজ হনূমান জানিতেন, রাম ও কৃষ্ণ অভেদ, তাঁহার ঠিক ঠিক অদ্বৈতজ্ঞান হইয়াছিল। তথাপি তিনি রামরূপধারী নারায়ণ ভিন্ন কাহাকেও দেখিতে চাহিতেন না। পুরাণে এরূপ গল্পের অভাব নাই।

অদ্বৈতজ্ঞানী দেখেন একব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডের অণুপরমাণু সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। তিনি বলেন,—

ওঁ পূর্ণমদ, পূর্ণমিদং পূর্ণাৎপূর্ণ মুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

নৈষ্ঠিক ভক্তও প্রাণেশ্বরকে জগন্ময় পূর্ণ দেখেন। তাঁহার মোহনমূর্ত্তি সর্ব্বত্র প্রতিভাত দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হন। এমন কি আপনার মধ্যেও ভগবানকে দর্শন করিয়া থাকেন। কখন ভাবেন, তুমি প্রভু, আমি দাস আবার কখন বা ভাবেন, আমি প্রভু, তুমি দাস। প্রাণারামের সহিত তাহার অনন্ত লীলা। তিনি একই মৎস্য—ঝালে, ঝোলে, অম্বলে, কালিয়ায়, কোপ্তায় কতরকমে আস্বাদন করেন। তাই ঠাকুর বলিতেন, মা আমায় শুকনো সাধু করিসনে "মা—আমায় রসে-বশে রাখিস্"। জ্ঞানিগণ যাঁহাকে জানিতে চান, ভক্তবৃন্দ তাঁহাকেই ভজনা করেন। একই ঈশ্বরকে লোকে নানাভাবে নানা নামে উপাসনা করিতেছেন।

বিভিন্ন পথাবলম্বনে যেমন লোকে একই লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারে, তদ্রূপ বিভিন্ন প্রণালীতে লোকে তাহারই উপাসনা করিতেছে। ভেদ মাত্র পথের—লক্ষ্যে নয়। ভেদ মাত্র নামে—বস্তুতে নয়।

আপনার প্রকৃতি অনুযায়ী সদ্‌গুরুর শিক্ষানুযায়ী নিয়মিতভাবে সাধনভজনে রত থাকিলে ক্রমশঃ মানব জীবনের চরম আদর্শ উপলব্ধি করা যায়। চিত্ত নির্ম্মল না হইলে মনে সন্দেহ ও ধর্ম্মে অবিশ্বাস আসিয়া উপস্থিত হয়; চিত্ত নির্ম্মল ও একাগ্র হইলে মানবগণ পরমার্থ বস্তু অবধারণ করিতে পারেন। তখন আর মত বা পথ লইয়া বিবাদের আবশ্যক হয় না। ঠাকুর বলিতেন,—

নানান রকম ধরম আছে কাজ কি তোমার নিয়ে।
গুরু যেটী দেবেন বেছে পালন কর গিয়ে॥

সুতরাং বৃথা তর্ক বা বাক্‌বিতণ্ডার অবতারণা না করিয়া অভিরুচি অনুযায়ী যে কোন একটী মত অবলম্বন করিয়া কর্ম্মে রত হওয়াই পরমার্থ লাভের উপায়।

শ্রীবলাইচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঈশ্বর লাভ।

শ্রুতি বলেন,

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুধা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্‌॥

আত্মাকে বলহীন ব্যক্তি লাভ করিতে পারে না। অথবা মেধা বা শাস্ত্র পাঠ দ্বারা জানা যায় না; যাঁহাকে আত্মা কৃপা করেন, তিনি আত্মার দর্শন লাভ করেন। আত্মার প্রিয় কে? যিনি আত্মার প্রিয়, আত্মাও তাহার প্রিয়। যিনি আত্মাতে অনুরক্ত, আত্মার প্রতি প্রেমযুক্ত, তিনি আত্মার প্রসাদ লাভ করেন। বিনা অনুরাগে কেহ আত্মার দর্শন লাভ করিতে পারেন না। কথায় বলে "ভক্তিপ্রিয় মাধব" এ কথা ধ্রুব সত্য। ধ্রুবের বয়স কি ছিল, কুব্জার রূপ কি ছিল, ব্যাধের শাস্ত্রজ্ঞান কি ছিল, বিদুরের ঐশ্বর্য্য কি ছিল, তবুও ভগবান্‌ তাহাদিগের প্রেমে আবদ্ধ ছিলেন। একান্ত অনুরাগ চাই, তবেই ঈশ্বরের দর্শন লাভ হয়; নতুবা নয়। যাহার অনুরাগ আছে, তাহার পক্ষে ভগবান্‌ দুর্লভ নয়।

স্থুলভশ্চায়মত্যন্তং সুজ্ঞেয়শ্চাপ্তবন্ধুবৎ।
শরীরপদ্মকুহরে সর্ব্বেষামেব ষট্‌পদঃ॥

সকলের শরীররূপ পদ্মে ভ্রমরস্বরূপ আত্মা বিরাজমান এবং পিতা, মাতা ও বন্ধু প্রভৃতির ন্যায় তিনি সুজ্ঞেয়।

তচ্চিন্তনং তৎ কথনমন্যোন্যং তৎ প্রবোধনম্।
এতদেকপরত্বঞ্চ ব্রহ্মাভ্যাসং বিদুর্বুধাঃ॥

তাঁহার চিন্তা, তাঁহার বিষয়ালাপ, তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার উপাসনা এই কয়েকটী বিষয়ের অনুষ্ঠানকে পণ্ডিতগণ ব্রহ্মাভ্যাস বলিয়া থাকেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥

হে পার্থ! যে ব্যক্তি একাগ্র মনে নিত্য আমায় স্মরণ করে, আমি সেই নিত্যযুক্ত যোগীর নিকট সর্ব্বদা সুলভ।

ভক্ত শিরোমণি মীরাবাই বলিয়াছেন, "বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা" প্রেম বিনা নন্দলালার দর্শন লাভ হয় না। প্রেমের কথা মুখের কথা নয়; প্রেমের দুইটী লক্ষণ। প্রথমতঃ আপনার শরীরজ্ঞান রহিত হয়—দ্বিতীয়তঃ জগদ্‌জ্ঞান রহিত হয়। শ্রীরাধা প্রমুখ গোপীগণ, শ্রীগৌরাঙ্গদেব, শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রভৃতি মহাসাধক ও সাধিকাগণ এইরূপ প্রেমের অধিকারী হইয়াছিলেন। ঈশ্বর অন্তর্য্যামী; তিনি বাহ্য আচরণ দেখেন না, তিনি মনে বসিয়া মন দেখেন। তাই তাঁর নাম, "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন"। সাধক চূড়ামণি রামপ্রসাদ সেন ঈশ্বরারাধনা সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

ঝাড় লণ্ঠন বাতির আলো কাজ কিরে তোর আয়োজনে।
(মন) তুই মনোময় প্রতিমা গড়ে, ডাক মায়ে নিশি দিনে॥

ভালবাসা লোক দেখান নয়, উহা অন্তরের জিনিষ। স্বার্থ, সাধ, লাভ যশ প্রভৃতির আশা ইহার মধ্যে স্থান পায় না।

কবীর বলিতেন, "মালা জপে শালা, কর জপে ভাই, মন্ মন্ জপে যেই, [illegible] বলিহারী যাই" অর্থাৎ যাহারা মালা জপেন, তাহারা নিকৃষ্ট অধিকারী,

যাহারা কর জপেন, তাহারা মধ্যম অধিকারী আর যাহারা মনে মনে অন্তরে শ্রীভগবানের পূজা করেন, তাহারা উত্তম অধিকারী।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "নাম কর্‌বি কোণে বনে আর মনে"। সংসারের মধ্যেও অনেক গুপ্ত যোগিপুরুষ আছেন, যাহারা রাত্রিতে মশারির মধ্যে থাকিয়া সাধন-ভজন করেন, তাহাদের কেহ চিনিতে পারেন না—যেমন বর্ণচোরা আম; ভিতরে পাকা কিন্তু বাহিরের রং দেখিয়া অন্তরস্থ পরিপক্ক অবস্থা বুঝিতে পারা যায় না। শ্রীরামপ্রসাদের কথায় নিরভিমান সাধকের অবস্থা নিম্নলিখিত গীতটী উল্লেখপূর্ব্বক দেখান যাইতে পারে :—

আপনাতে আপনি থেকো মন যেয়ো নাকো কারু ঘরে।
যা চাবি তাই বসে পাবি খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥
পরম ধন সেই পরশমণি আছে তব অন্তঃপুরে।
কত মণি পড়ে আছে তোর চিন্তামণির নাচ দুয়ারে॥

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু।

একনিষ্ঠা।

কথায় বলে, যে এক সাধে, সে সব সাধে, যে সব সাধে, তার সব যায়। কথাটার মধ্যে যথেষ্ট সত্য নিহিত আছে। ঘূর্ণায়মান চক্রে কোন দিন শৈবাল জমিতে পারে না, শৈবাল জমিতে হইলে চক্রটী স্থিরভাবে একস্থানে বহুদিন থাকা চাই। সংসারেও দেখা যায়, কোন বিষয়ে পারদর্শিতা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হইলে বহুদিন যাবৎ ঐ বিষয়ের চর্চ্চা করা চাই। দীর্ঘকালব্যাপী চর্চ্চা বিনা কোন বিষয়ে বহুদর্শিতা লাভ হয় না। মনের চাঞ্চল্যই উন্নতির প্রধান বিঘ্ন। সাংসারিক ব্যাপারে যখন চিত্ত স্থির না হইলে কোন কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারা যায় না, তখন আধ্যাত্মিক বিষয়ে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের সংবাদ লাভকল্পে চিত্তচাঞ্চল্য যে সর্ব্বনাশের মূলীভূত কারণ তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? বৈষ্ণবগণ বলিয়া থাকেন, "গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব

তিনের দয়া হ'ল একের বিহনে জীব ছারেখারে গেল"। এই একমাত্র মনের দৌরাত্ম্যে জীবের পরমার্থ লাভ সুদূরপরাহত হইয়া পড়িতেছে। সংসারে শব্দ স্পর্শ রূপ-রস-গন্ধ সকল প্রকার ভোগসুখ উপভোগ করিয়াও কিছুতেই মন পরিতৃপ্ত ও শান্ত হইতেছে না। কি ভীষণা প্রাণনাশিনী মোহিনী মায়া চিত্তবৃত্তিকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে। ভোগ যেন মরীচিকার ন্যায় চিত্তকে প্রলোভিত করিতেছে। বুঝিয়াও সে স্বর্ণমৃগের পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে। চিত্তবিক্ষেপই যে তাহার সর্ব্বনাশের কারণ, এ কথা কেন সে বুঝিয়াও বুঝিতেছে না। উন্নতি করিতে হইলে মনোবৃত্তিগুলিকে একাভিমুখে চালাইতে হইবে। মূল নদী হইতে যদি কয়েকটী শাখানদী বাহির হয়, তাহা হইলে তাহার স্রোতবেগ ক্ষীণ হইয়া যায়। সূর্য্যরশ্মি জগৎময় পরিব্যাপ্ত, তাই উহা আমাদের নিকট সেরূপ উত্তাপজনক নয়, অথচ সামান্য মাত্র অগ্নির উত্তাপ আমাদের নিকট অসহনীয়। সূর্য্য যে কত বড় অগ্নিপিণ্ড তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি না। পৃথিবী উহার কয়েক ক্রোশ নিকটবর্ত্তী হইলে গলিয়া বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া যাইবে। সূর্য্যরশ্মিগুলি বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে বলিয়া আমরা উহার প্রখর উত্তাপ সহ্য করিতে পারি। মনুষ্যের মনও সূর্য্যরশ্মির মত তেজঃসম্পন্ন। বিক্ষিপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া আছে বলিয়া উহার প্রতাপ কিছুই বুঝা যাইতেছে না। যদি মনের বৃত্তিগুলি একাভিমুখে চালিত করা যায়, তাহা হইলে এমন কোন কার্য্য নাই, যাহা মনের দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে পারে না। যোগিগণের অলৌকিক দৈবশক্তি মনের উপর আধিপত্য হইতে উৎপন্ন হয়। মনোজয় করিয়া যোগীরা প্রকৃতিকে জয় করিতে পারিয়াছেন। তাহারই প্রভাবে তাহারা অসাধ্য সাধন করিতে পারিয়াছেন। কবীর বলিতেন, রাজা রাজ্য জয় করিয়া থাকেন, তিনি শক্তিমান্ বটে; কিন্তু যোগী আপনার মনকে জয় করিতে শিখিয়াছেন সুতরাং তিনি নৃপ অপেক্ষা অধিকতর বলশালী। এ দৃষ্টান্ত প্রায়ই দেখা যায়, লব্ধকীর্ত্তি সুপণ্ডিত সুধীগণ ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব স্বীকার করিতেছেন, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, অহিতাচরণ, এ সকল তাহাদের নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিছুতেই তাহাদের চিত্তপ্রশান্তি লাভ হইতেছে না অথচ দিগম্বর বা কৌপীনমাত্র পরিধারী সংসারবিরাগী করপুটকে পানপাত্ররূপে ব্যবহার করিয়াও পরম শান্তিলাভ করিতেছে। এরূপ পরস্পরের সুখভোগের পার্থক্য কোথায়? একজন ইন্দ্রিয়ের দাস এবং অপর ব্যক্তি ইন্দ্রিয়জিৎ। একজনের মন চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত অপর জনের মন

একাগ্র। সরিষার পুঁটুলির মত মন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে, উহাকে একটী সুস্থাবরূপ পুঁটুলির মধ্যে আবদ্ধ করিতে হইবে। তাহা হইলে উহা আমাদের প্রতি মিত্রতাচরণ করিবে। মনই মানুষের মিত্র, মনই মানুষের পরম শত্রু। যিনি মনকে বশীভূত করিয়াছেন, মন তাহার বন্ধু; যিনি মনের দাস, মন তাহার শত্রু। অগ্নি কাহারও বন্ধু বা শত্রু নয়। যিনি অগ্নিকে আত্মহিতার্থে নিয়োজিত করিতে পারেন, অগ্নি তাহার সহায় কিন্তু যিনি উহার অসদ্ব্যবহার করেন, অগ্নি তাহার পক্ষে ক্ষতিকর। সুপথের যাত্রীরা মনের সদ্‌গুণগুলিকে আশ্রয় করেন ও তাহাদিগকে সংপথে পরিচালিত করেন সুতরাং তাহারা উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন; কুপথের যাত্রীরা মনের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণে জীবন যাপন করেন, ক্ষণিক সুখের আশায় আত্মাকে পাপাগ্নিকুণ্ডে আহুতি প্রদান করেন। ফলতঃ তাহারা অবনতির অধস্তন তলদেশে পতিত হইয়া মহাকষ্ট স্বীকার করেন। পদার্থবিদ্‌গণ বিষেরও সদ্‌ব্যবহার জানিয়া তাহা হইতে উপকার লাভ করিতেছেন আবার মূর্খ ব্যক্তি অতিরিক্ত অমৃতপানকরতঃ উদরস্ফীতি হেতু কষ্ট পাইতেছে। মনের একাগ্রভাব ও একাগ্রতার শক্তি অবগত হইলে উহার দ্বারা সকল কর্ম্মই সাধন করা যায় আবার মন বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইলে উহা আত্মাকে পাতিত করে। দেবাদিদেব মহাদেব গঙ্গাকে জটাজালে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, জহ্নুমনি গঙ্গাকে গণ্ডূষে মাত্র পান করিয়াছিলেন, রামগতপ্রাণ হনুমান্ গন্ধমাদন পর্ব্বত উত্তোলন করিয়াছিলেন। এই সকল আশ্চর্য্য ব্যাপারের কারণ, পূর্ব্বোক্ত দেব ও মহাজনগণ সকলে মনোজয়ী ছিলেন। এখনও যাহারা মনের উপর যতদূর প্রভুত্ব বা শক্তিলাভ করিয়াছেন, তাহারা সেই পরিমাণে সংসারে উন্নতিলাভ ও অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করিতেছেন।

সমুদ্রে নিয়তই তরঙ্গ উঠিতেছে ও পড়িতেছে; একটী পর আর একটী দেখা দিতেছে। সমুদ্রের উপরিভাগে তরঙ্গ কিন্তু অন্তরে মহাশান্তি। উপরিস্থ তরঙ্গরাজি সমুদ্রগর্ভস্থ মহাশান্তিকে উপভোগ করিতে দিতেছে না। সমুদ্র নিস্তরঙ্গ হইলে সে শান্তিকে উপভোগ করা যায়। মনের অন্তরে বা পরপারে শান্তশুদ্ধ আত্মা বিরাজমান, চঞ্চল মন উহাকে উপলব্ধি করিতে দিতেছে না। সুতরাং মনের চঞ্চলতা পরিহার পূর্ব্বক আত্মার প্রশান্তি উপভোগ করিতে হইবে। মনের শান্ত অবস্থা একনিষ্ঠা হইতে উৎপন্ন হয়। একনিষ্ঠা লাভ করা এক মহা সমস্যার বিষয়। উহা অশেষ অধ্যবসায় ও উদ্যমসাপেক্ষ। বহু কষ্টে, বহু যত্নে বহুকালের পর হয়ত কিঞ্চিৎ

পরিমাণে মনকে আয়ত্ত করা হইল, ধর্ম্মজীবনে কিছু উন্নতিলাভ সম্ভবপর হইল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য; একদিনের অনবধানতায়, সামান্য কারণে সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া গেল। সামান্যমাত্র ছিদ্র যেমন বৃহৎ তরণীকে জলমগ্ন করিতে পারে, তদ্রূপ নিমেষের অযত্নে বহু দীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রমলব্ধ ফলও বৃথাই নষ্ট হইয়া যায়। প্রাণ হতাশে আকুল হইয়া পড়ে। তখন আত্মহত্যা করিতেও দ্বিধা বোধ হয় না। কিন্তু উন্নতির নিয়মই এইরূপ। উত্থান-পতন, ভাঙ্গা-গড়া, হার-জিতের মধ্যে দিয়া মানুষকে আদর্শের অভিমুখে চলিতে হয়। যে কাজ যতই উন্নত, উহা সেই পরিমাণে সূক্ষ্ম ও আয়াস-সাধ্য। মনুষ্যের পক্ষে তাহার মনুষ্যত্বের বিকাশ বিশেষ কষ্টকর ও আয়াসসাধ্য কিন্তু মনুষ্যত্ব চিরস্থায়ী। উহা তাহাকেও তাহার পারিপার্শ্বিক প্রকৃতিকে স্বীয় মহিমায় মহিমান্বিত করিয়া তুলে। শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি। কণ্টকের ভয়ে কমল তুলিতে কাতর হওয়া মনুষ্যত্বের লক্ষণ নয়। যাহারা বীরহৃদয়, তাহারা কখনই কাপুরুষের মত উন্নতির পথে বিপদ্ বর্ত্তমান দেখিয়া ভয়ে ভীত হন না। তাহারা জানেন, উন্নতির চেষ্টাই জীবন, বিপদে ভীত বা হতোদ্যম না হইয়া পুরস্কারের প্রয়োগ করাই প্রাণের স্পন্দন। সুতরাং তাহারা মনকে বশীভূত করিবার জন্য সততই আত্মানুশীলন, আত্মসংস্কার ও আত্মোপলব্ধির জন্য চেষ্টা করেন। এ বিষয়ে পুরস্কারের সহায়তা যেমন আবশ্যক, তদ্রূপ শ্রীভগবানের শরণাগতি, তাঁর নাম গুণগান, তাঁর পূজারাধনা, তাঁহাতে বকলমা অর্পণ করাই সমভাবে আবশ্যক। নামের অমিত প্রভাবে, প্রভুর অনন্ত কৃপামাহাত্ম্যে, দুর্ব্বল ব্যক্তিও কালে পুণ্যাত্মায় পরিণত হয়। হৃদয়ের কলুষ কালিমা বিধৌত হয় ও উহা নিত্যানন্দে ও দিব্যজ্যোতিতে পরিপূর্ণ হইয়া পড়ে। হাজার বৎসরের অন্ধকার ঘর এক মুহূর্ত্তে দীপশিখার সাহায্যে আলোকিত হইতে পারে অথচ অন্ধকারের উপর মুষ্টির আঘাত করিলে উহা হাজার বৎসরেও আলোকিত হইবে না। যেমন রোগ, তেমন ঔষধ আবশ্যক। ঈশ্বরের ভজন-সাধন, নামগুণগান অভ্যাস করিলে, অভ্যাসের গুণে ও নামের প্রভাবে একবার ভজনানন্দের আস্বাদন পাইলে আর বিষয়ভোগ ও কুমতির প্ররোচনা মনোরম বলিয়া প্রতীত হয় না। যিনি একবার শর্করা সেবন করিয়াছেন, তিনি কি কখনও নিম্বফল সেবন করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিয়া থাকেন? বলা বাহুল্য, বাতুলও বোধ হয় ঐরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করে না। মনের চঞ্চলতা নিবারণের জন্য প্রত্যহ নিয়মমত শ্রীভগবানের চিন্তা ও নাম করা আবশ্যক। প্রতিদিন কতকটা সময় শরীর রক্ষা,

পরিবার পালন, অর্থোপার্জ্জন ইত্যাদি ব্যাপারে নিয়োগপূর্ব্বক নির্দ্ধারিত কতকটা সময় ধর্ম্মচিন্তায় 'অতিবাহিত করিলে, দুষ্ট মনও ক্রমশঃ শিষ্টতালাভ করে। এইরূপে মন ক্রমশঃ মলশূন্য হইয়া পবিত্র হইয়া যায় এবং ঐ পবিত্র মনে শ্রীভগবান্ বিরাজ করেন।

শ্রীরামশরণ নিয়োগী।

সে কি শুধু ভুল ?

সে কি শুধু ভুল ওগো আর কিছু নয় ?
হৃদয়ে হৃদয় দিয়ে হৃদি বিনিময়।
নিবিড় নৈকট্যে ঘেরা যে স্নেহ বন্ধন,
নিয়ত জাগায় বুকে পুলক স্পন্দন।
একটী অন্তর লাগি অপর যে প্রাণ,
আশা আকুলিত চিতে নিশি দিনমান
খুলে রাখে আপনার অমৃত আলয় ;
সে কি শুধু ভুল ওগো আর কিছু নয় ?

আপনাতে পূর্ণ হতে পারে না মানব,
অপরের কাছে কেন মানে পরাভব ?
কেন তবে ভিক্ষুকের দৈন্য পরকাশি
ফুটাইতে প্রিয় মুখে এত টুকু হাঁসি ?
নিভৃত স্মরণে যার দিন কেটে যায়
সে কি শুধু ভুল ওগো আর কিছু নয় ?

মলয় পরশে কেন সোহাগে শিহরি
কুসুম বিকাশে সুখে সুবাস বিতরি ?
রবি অস্ত গেলে হয় মুদিত নলিনী
চন্দ্রোদয়ে কেন ফুল্ল হয় কুমুদিনী ?
শ্যামল স্নেহেতে এই ধরা মধুময়
সে কি শুধু ভুল ওগো আর কিছু নয় ?
এত টুকু প্রেম প্রীতি ভালবাসা তরে
মানব হৃদয় কেন হাহাকার করে ?
বিলাস বিভবে তুষ্ট নহে প্রাণ মন
বিনা স্নিগ্ধ সুশীতল স্নেহ পরশন
সবি তিক্ত, সবি রিক্ত, ব্যর্থ মনে হয়
সে কি শুধু ভুল ওগো আর কিছু নয় ?

শ্রীমতী বন দেবী

———

চিন্তাপ্রসূন।

পর্ব্বতের সুচ্চ শিখরদেশে ভগবান্ যেমনভাবে আছেন, তার পাদদেশে তিনি তার চেয়ে কম প্রাণবন্ত নন। সাধককে তেমনি বুঝতে হবে ভগবান্ কম মহিমান্বিত হয়ে বিরাজ কচ্ছেন না আমাদের এই রক্তমাংসের দেহের মধ্যে। এই দেহই যে তাঁর মন্দির। এই মহান্ সত্য অনুভব কর্ব্বেন সাধক যখন তার মর্ম্মে মর্ম্মে, প্রকৃত মুক্তির দ্বার তখনই খুলে যাবে তার কাছে ধীরে ধীরে; ভগবৎসেবাও সার্থক হবে তার তখনই। "* * * জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

আমরা যতই আধ্যাত্মিক আধ্যাত্মিক করি না কেন, অধিভূত নামক জিনিষটা আমাদের মজ্জায় মজ্জায়। তাই অক্ষর অব্যক্ত চিৎস্বরূপ পরব্রহ্মকে পেতে চাই আমরা আমাদের মাঝে আমাদেরই মতন করে। "প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর"। তাই ধরতে চাই আমরা তাঁকে দেহ মন প্রাণ হৃদয় সব দিয়ে, পেতে চাই তাঁকে আমাদের সকল ইন্দ্রিয় দিয়ে।

পুস্তক পরিচয়।

ইঙ্গিত ঃ—মাসিক পত্রিকা; সম্প্রতি আমরা ইহার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা পাইয়াছি। ইহার সম্পাদক সুসাহিত্যিক শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ এম, এ। কাগজখানি কলিকাতায় ছাপা হয় কিন্তু ইহার প্রাপ্তিস্থান :—মেহেরপুর, গোপসেনা, পোঃ, জেলা যশোহর। সডাক বার্ষিক মূল্য—২৸৵০; প্রতিসংখ্যা।০ আনা।

স্বনামধন্য শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষাদর্শে ভারতের সাধনা ও সভ্যতার সত্য পরিচয় প্রদান করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। যাহাতে দেশবাসীর প্রাণে স্বদেশপ্রীতি ও বঙ্গভাষার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হয়, তৎসম্বন্ধীয় ইহার প্রয়াসও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ব্যতীত আধুনিক মাসিক পত্রিকা-সমূহের ন্যায় ইহা কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধে সমৃদ্ধ। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার অবিদ্যার ধারা, আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরস, কবিত্ব কোথায় প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি বেশ সুন্দর ও গবেষণাপূর্ণ হইয়াছে। আমরা ইহার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

যুদ্ধক্ষেত্র :—ঐতিহাসিক নাটক। প্রণেতা—শ্রীউপেন্দ্রকুমার রায়। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীজানকীনাথ ঘোষ ১নং সিমলা রোড। মূল্য—১৷৷০ টাকা।

নাটকটী বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। লেখকের ভাব, ভাষা, কল্পনাশক্তি বিশেষ প্রশংসনীয়। পাঠে আদৌ ক্লান্তি বোধ হয় না। হিন্দু মুসলমানের মিলন ছবি, স্বদেশপ্রেমের চিত্র, নারীর প্রেম ও বীর হৃদয়ের মহানুভবতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সংঘ ও বার্ত্তা।

১। তত্ত্বমসি মিশনের অবৈতনিক বিদ্যালয়ে সকল শ্রেণীর বালকগণকে শিক্ষা দেওয়া হয়। যাঁহারা উক্ত বিদ্যালয় সম্বন্ধে কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মিশন সম্পাদকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সবিশেষ অবগত হউন।

২। তত্ত্বমসি মিশন পরিচালিত অবৈতনিক "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চতুষ্পাঠীর" তত্ত্বাবধানে যাঁহারা ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি, সাংখ্য, বেদান্ত, বেদ প্রভৃতি বিষয় সকল শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সত্বর আসিয়া উক্ত মঠের সম্পাদক বা উক্ত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন। এতদুদ্দেশ্যে আমরা সকল শ্রেণীর বিদ্যার্থিগণকে সাদরে আহ্বান করিতেছি। বিদ্যার্থিগণ ইচ্ছা করিলে কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েশন বা অন্যত্র উপাধি পর্যন্ত পরীক্ষা দিতে পারিবেন।

৩। তত্ত্বমসি মিশনের পরিচালনাধীনে সুযোগ্য শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে টেলারিং (শিল্প বিভাগ) এবং ছাপাখানার সকল প্রকার কাজ শিক্ষার্থিগণকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রবেশ প্রার্থিগণ আবেদন করুন।

৪। তত্ত্বমসি মিশনে সুযোগ্য চিকিৎসকগণের দ্বারা বিনামূল্যে চিকিৎসা করা ও ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

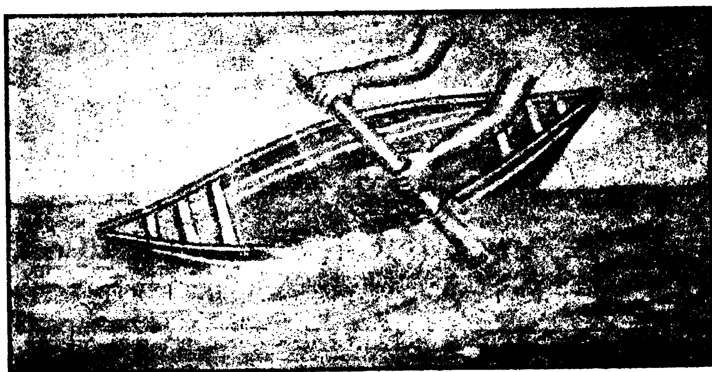
৫। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত, শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত লেখক ঋষিকল্প মহাত্মা শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় (স্বনামধন্য মাষ্টার মহাশয় বা শ্রীম) বিগত সপ্তাহে নিত্যধাম শ্রীরামকৃষ্ণ লোকে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। আমরা ঠাকুরের শ্রীচরণে প্রার্থনা করি যেন মহাপুরুষের অমিয়মাখা উপদেশাবলী ও পূত জীবনী ভক্তহৃদয়ে চির জাগরুক থাকিয়া প্রভুর স্মরণ, মনন, বন্দন ও ধ্যানে নিত্য প্রোৎসাহিত করে।

দ্রষ্টব্য :—যাঁহারা বিশেষ কোন কার্য্যবশতঃ ১৩৩৮ সালের "বিশ্বজনীন"এর কোন এক বা ততোধিক সংখ্যা পান নাই, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে সে বিষয় জানাইলে পর আমরা তাহাদিগকে উক্ত সংখ্যা যথাসত্বর পাঠাইয়া দিতে চেষ্টা করিব।

বিশ্বজনীন

ধর্ম্ম-নীতি-শিক্ষাসংস্কারাদি সম্বন্ধীয় বর্ত্তমান যুগোপযোগী

তত্ত্বমসি মঠের মুখপত্র



" সত্যমেব জয়তে নানৃতম্ "



৩য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা।

আষাঢ়, ১৩৩৯ সাল।

Viswajanin

The Organ of Tattwamasi Math.

সম্পাদক—স্বামী নির্ব্বাণানন্দ

বিশ্বজনীন কার্য্যালয়।

৩২।১ রাজা দিনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য ২৲ প্রতি সংখ্যা .৴

সূচীপত্র

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-
শ্রীচরণ ভরসা।

বিশ্বজনীন।

৩য় বর্ষ } আষাঢ় ১৩৩৯ { ৩য় সংখ্যা

সামবেদ-সংহিতা।

ছন্দ আর্চ্চিকঃ। কৌথুমী শাখা। আগ্নেয়ং পর্ব্ব। ১প, ১অ, ১খ, ১প্র, ১২দ।

প্র মং্‌হিষ্ঠায় গায়ত ঋতাৱে বৃহতে শুক্রশোচিষে।
উপ স্তুতাসো অগ্নয়ে॥ ১।

পূজারত বৃত্তিগণ পূজ সেই মঙ্গল আধার।
ষড়ৈশ্বর্য্যশালী যিনি হৃদিমাঝে করেন বিহার॥
অনন্ত আকার তাঁর, নাহি তাঁর গুণের বিকার।
গুণাতীত গুণময় আমাদের সত্তা সবাকার॥

প্র সো অগ্নে তবোতিভিঃ সুবীরাভি স্তরতি বাজকর্ম্মভিঃ
যস্য ত্বং্‌ সখ্যমাবিথ॥ ২।

জ্ঞানদাতা প্রভু তুমি, তব পুণ্য কৃপার প্রভাব।
সর্ব্ববিঘ্ন নাশ করে, উপজয় শিবময় ভাব॥
তোমার কৃপায় লোকে সর্ব্ববিধ পায় ধন মান।
জনেশ্বর বীর্য্যবান, সর্ব্বজনে কর কৃপা দান॥

ত্বং গূর্দ্ধয়া স্বর্ণরং দেবাসো দেবমরতিং দৃধন্বিরে।
দেবত্রা হব্যমূহিষে । ৩।

প্রসীদ প্রসীদ দেব কর্ম্মপাশ করে দাও নাশ।
মোহপঙ্কে মগ্ন মোরা, কর নাথ আলোক বিকাশ॥
ভুলায়ো না সুখলোভে, মায়াধীশ হর মায়াজাল।
দিব্যজ্ঞান দাও দেব, কর দূর কুহকজঞ্জাল॥

মা নো হৃণীযা অতিথিং বস্নুরগ্নিঃ পুরু প্রশস্ত এষঃ।
যঃ সুহোতো স্বধ্বাবঃ ॥ ৪।

সর্ব্বদেবময় প্রভু, সর্ব্বরূপ হৃদয়াধিপতি॥
কেমনে পূজিব তোমা, শক্তিহীন না জানি ভকতি॥
সৎকর্ম্ম সাধন দ্বারা কর মোর হৃদি উদ্বোধন।
কৃপা কণা দানে কর ভবভয় ভাবনা হরণ॥

ভদ্রো নো অগ্নিরাহুতো ভদ্রা রাতিঃ সুভগো ভদ্রো অধ্বরঃ।
ভদ্রা উত প্রশস্তয়ঃ ॥ ৫।

ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ দাতা নারায়ণ।
পূরাও কামনা নাথ, বহুবিধ কল্যাণ সাধন॥
কপটতা ত্যাগ করি' মোরা যেন ভজি তোমা নাথ।
হৃদি অন্ধকারে দেব, করে দাও অশনি সম্পাত॥

যজিষ্ঠং ত্বা ববৃমহে দেবং দেবত্রা হোতার মমর্ত্যং ।
অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুং ॥ ৬ ।

দিব্যভাব জনয়িতা শ্রীচরণে করি নিবেদন ।
অমৃতপ্রদাতা নাথ জন্ম-মৃত্যু কর নিবারণ ॥
তোমা বিনে কোন কার্য্য কভু নাহি হয় সম্পদান ।
দয়াময় ! অধিকার কর মোর হৃদি সিংহাসন ॥

তদগ্নে দ্যুম্নমা ভর যৎসাসাহা সদনে কং চিদত্রি ণং ।
মন্যুং জনস্য দূঢ্যং ॥ ৭ ।

পাপবুদ্ধি রিপুচয় সহচরী কুবৃত্তি সকল ।
মোহাবেশে মোর মন অবিরত করিছে পাগল ॥
জ্ঞানদাতা পরিত্রাতা দাও বুদ্ধি মোহনিবারণ ।
দুষ্টবুদ্ধি রিপুচয় ক্ষয় যাহে পায় অনুক্ষণ ॥

যদ্বা উ বিশ্পতিঃ শিতঃ সুপ্রীতো মনুষো বিশে
বিশ্বেদগ্নিঃ প্রতি রক্ষাংসি সেধতি ॥ ৮ ।

বিশ্বপতি জ্ঞানদেব চরাচর প্রভু নারায়ণ ।
সত্ত্বগুণ বিবর্দ্ধক প্রাণিগণ হৃদয়রমণ ॥
তুমি যার হৃদিমাঝে নিরবধি কর অবস্থান ।
দুঃখভয় দূরে যায় সুখধর্ম্ম করে প্রতিষ্ঠান ॥



পশুপতিনাথ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শিবরাত্রিতে সেখানে Military Parade হয়। আমরা দুপুরে Parade দেখিতে সেখানকার রমণার মাঠে গেলাম। চারিদিকে ভয়ানক ভিড়, কোথায় দাঁড়াইব ভাবিতেছি, এমন সময় সরকারী হাসপাতালের বাঙ্গালী ডাক্তার বাবুর লোক আমাদের ভিতরে ডাকিয়া লইয়া গেল। ডাক্তার বাবুর দয়ায় আমরা হাসপাতালের দ্বিতল বারান্দায় বসিয়া সব জিনিষই ভালরূপ দেখিতে পাইলাম। সেখানে একজন বাঙ্গালী স্কুল মাষ্টারের সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় নেপালের অনেক খবরই পাইলাম। নেপালে ৪০।৫০ জন বাঙ্গালী চাকুরীজীবী আছেন। কেহ মাষ্টার. কেহ প্রফেসার, কেহ ডাক্তার, কেহ বা ইঞ্জিনিয়র। এ সব চাকুরীই বাঙ্গালীরা পায়। অন্য চাকুরী, বিশেষ রাজ্যপরিচালন সম্বন্ধীয় বা সৈন্যবিভাগে কোন কাজ, তারা বিদেশীয়কে দেয় না। রাজা "ত্রিভুবন বীর বিক্রম"। তাঁকে বলে "রাজাধিরাজ বা পাঁচ সরকার। সে তাঁর পাঁচলক্ষ মুদ্রা আয় বলিয়াই হউক বা নামের পূর্ব্বে ৫টী শ্রী লিখিতে হয় বলিয়াই হউক। রাজ্য পরিচালনের সম্পূর্ণ ভার মন্ত্রীর উপর। "ভীম সমসের জং রাণা" তাঁকে বলে ওরা মহারাজ বা তিন সরকার। সে বোধ হয় তার ৩ লক্ষ আয় বা নামের পূর্ব্বে তিনটী শ্রী লিখিতে হয় বলিয়া বংশপরম্পরায় রাজবংশে জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজা হয়। মহারাজ বা মন্ত্রিবংশে বংশপরম্পরায় বংশের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যিনি, তিনিই বয়সের জোরে মন্ত্রী হন। এই সেখানকার রীতি। সেখানে Military Government অর্থাৎ সকলকেই যুদ্ধবিদ্যা শিখিতে হয় এবং সেই সৈন্যবিভাগে তার যে সম্মান এবং বেতন অন্য যে বিভাগে তিনি কাজ করুন, সেই সম্মান অনুযায়ীই তিনি সম্মানিত হন। রাজসভায় সেই সৈন্যবিভাগে তাঁর যে স্থান সেরূপ আসনই তিনি পান, কার্য্যতঃ কোষাধ্যক্ষই হউন বা প্রধান বিচারকই হউন সেই কর্ণেলের সম্মানই পাবেন। প্রধান বিচারকের আপিলও মহারাজকেই শুনিতে হয়। তাঁর নিম্নে কমেণ্ডার ইন চিফ, তাঁর নীচে জঙ্গীলাট। উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী সকলেই রাজবংশীয় অর্থাৎ রাজপুত। নেপালস্বামী অর্থাৎ রাজপুতেরা তার মালিক। বস্তুতঃ যাহারা নেপালের আদিম অধিবাসী তাদের নেপালে

কোন স্থান নাই। তারা বাস্তবিক পরাধীন। রাজ্যে এমন নিয়ম যে রাজবংশীয়ের নেপালী কোন রমণীকে বিবাহ করিলে তাহাকে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। রাজপুতেরা সব হিন্দু, প্রাচীন নেপালীরা অধিকাংশ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী; তবে ধীরে ধীরে অনেক নেপালী ক্রমশঃ রাজার ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে।

নেপাল স্বাধীন কিন্তু তার রাজার বন্দর ভর্ত্তি বিলাতি আর জাপানী মালে। আমরা প্রায় দুইঘণ্টা ঘুরিয়া ও সঙ্গে থাকিয়া উপযুক্ত নেপালের নিজস্ব কোন বস্তু বাজারে খুঁজিয়া পাইলাম না। বুঝিলাম এ বিষয়ে নেপাল সাধ করিয়া পরাধীন হইয়াছে এবং আলস্য ও বিলাসিতা তাদের মধ্যে ঢুকিয়াছে নতুবা প্রাচীন মন্দিরের গাত্রে যে কাঠের কাজ দেখিয়াছি নূতনের মধ্যেও তার একটুকু নিদর্শন থাকিত।

যে কথা বলিতে যাইতেছিলাম—আমরা হাসপাতালের দ্বিতল বারান্দায় বসিয়া পেরেড্ দেখিলাম। প্রথমে সৈন্যেরা চতুর্দ্দিকে সারি সারি দাঁড়াইল; তার পর জঙ্গিলাট ও কমেণ্ডার ইন্ চিফ আসিয়া সৈন্যদের পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। তার পর মহারাজ (মন্ত্রী) আসিলেন, কামানের আওয়াজ হইল। বৃটীশ কনসাল আসিলেন। সর্ব্বশেষে রাজাধিরাজ (রাজা) আসিলেন। তার পরে চারিদিকে কামান আর বন্দুকের আওয়াজ আরম্ভ হইল। প্রায় দশ মিনিটকাল কেবল বন্দুকের শব্দ চলিতে লাগিল। তার পরে সব কর্ম্মচারী সহ রাজা পশুপতিনাথ মন্দিরের দিকে চলিয়া গেলেন।

মহারাজ বৃদ্ধ কিন্তু রাজাধিরাজের যুবাবয়স, চেহারাও সুশ্রী। সন্ধ্যার পর মন্দিরে বড় ভিড়। রাজবাড়ীর সব স্ত্রী পুরুষ শতশত বাহী সিপাহী প্রভৃতি লইয়া মন্দির জুড়িয়া বসিল। অন্য লোকের জন্য তখন মন্দির বন্ধ। আমরা কোন প্রকারে মন্দির প্রাঙ্গণে পৌছাইলাম কিন্তু সে এক বিপদ। ভয়ানক ধাক্কা, ঠেলা-ঠেলি; অসভ্য পরিবারমণ্ডলী অনেককে বেদম প্রহার আরম্ভ করিল। যাহা হউক এত কষ্টেও ভারতের একমাত্র স্বাধীন রাজপরিবারের সকলের দর্শন ঘটিয়া গেল। রাণীর সংখ্যা অগণিত। ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্যের ন্যায় এখানেও রাজার শতাধিক স্ত্রী। ভিড় কমিল প্রায় রাত্রি ৯টায়। অতঃপর অন্যান্য দর্শনাকাঙ্ক্ষী গৃহী সাধু একসঙ্গে এত ভিড় করিল যে মন্দিরে প্রবেশ করিয়াও অতিকষ্টে দর্শন করিয়া আমরা গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। পরে গভীর রাত্রিতে গিয়া বাবা পশুপতিনাথকে প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলাম। ঠাকুর যেন প্রমাণ করিলেন,

"অত সাধ যার সে নীরবে খুঁজে, নীরবে আসে ঘোর নিশীথে যখন সবাই ঘুমায় অঘোরে।"

হে অন্তর্য্যামী হৃদয়ের গোপনপুরের দেবতা! এই প্রার্থনা প্রাণের গোপনপুরে তুমি জাগিয়া থাকিও চিরদিন। বিষয়ের অসংখ্য কোলাহলের অন্তরালে তোমার সে নীরব বাঁশী যেন বাজে ধীরে, জাগায় ধীরে, অমনি নিস্তব্ধতার মাঝে। ঘোর অন্ধকার জীবন পথে তোমায় যেন পাই অমনি আপন করে, আর প্রাণের অনন্ত পিপাসা যেন মিটে যায় এই শুধু প্রার্থনা দেবাদিদেব আশুতোষ তোমার ঐ শ্রীচরণে।

পরদিন ভোরে দত্তাত্রেয় দর্শন করে আমরা বাসায় এসে স্নান সন্ধ্যা ও বাবার দর্শনান্তে আহারাদির পর আবার চললাম ফিরতি পথে। ধর্ম্মশালার সেই বাঙ্গালী বন্ধুটী; আজ বন্ধুই বলতে হয় এমন অজানা দেশে তার কাছেই বন্ধুর ভালবাসা ও স্নেহ পেয়েছিলাম, কত যত্নে যে আমাদের রেখেছিলেন, ভাবলে অবাক হ'তে হয়। এমন স্থানে তাঁরই কাছে কি ক'রে লুকান ছিল আমাদের জন্য এতটুকু আদর স্নেহ। মটরের জন্য অনেক দেরী হ'ল। ৫টায় আনকোট পৌছে কুলী জোগার করলাম। তারপর চলতে সুরু করলাম চিতলাংএর দিকে; উদ্দেশ্য সন্ধ্যায় সেখানে পৌছাতে পারলে পরদিন সারাদিনে আমলকগঞ্জ যাওয়া যাবে।

ধীরে মন্দিরচূড়া অন্ধকারে মিশে গেল। নেপালের স্বপ্নপুরী দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেল। ঠিক সন্ধ্যায় চন্দ্রগীর পাহাড়ে উঠে সেই শেষ সূর্য্যের রশ্মির গায়ে হিমাদ্রির দৃশ্য আর নেপালের দৃশ্য দেখে বাবা পশুপতিনাথের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে নামতে সুরু করলাম। চিতলাং পৌছিতে রাত্রি ৭টা হ'ল। বহুযাত্রী তখন ফিরছে। অনেকেই আমাদের মত চিতলাংএ রাত্রিতে বিশ্রাম করেছিল। পরদিন ভোরে সেখান থেকে চলে মার্ক পৌছিলাম ৮টায় সেখানে জলযোগ করে আমরা শীশাগরীতে উঠলাম ১২টায়। এই দুপুরে শীশাগরী উঠতে কষ্ট হয়েছিল খুব। এই পথটায় নামতে যেমন ভয়, উঠতেও তেমনি। ফিরবার পর এ রাস্তাটায়ই কষ্ট বেশী। ঘণ্টা খানেক শীশাগরীতে বিশ্রাম করলাম। স্নানাদি সেরে সেখান থেকে ভিমফেটা পৌছিতে প্রায় চারটা হ'ল। এখানে ভয়ানক ভীড় মটরও পাওয়া যায় না; অবশেষে অনেক কষ্টে একটাতে চাপা গেল।

মটর বোঝাই হ'য়ে নেপালে সব খাদ্যসামগ্রী যায়। ধান চাউল নেপালে খা

হয় তা বোধ হয় অপর্য্যাপ্ত নয়। নেপাল সরকার তারের সাহায্যে ইলেট্রিক শক্তিতে ট্রলিতে ঝুলিয়ে মালমত্র ভীমকেটী থেকে নেপাল নিয়ে যায়। সাধারণ মাল মটরে ভিমকেটী পর্য্যন্ত যায়। সেখান থেকে ঐভাবে অথবা কুলীর সাহায্যে নেপাল পর্য্যন্ত নিতে হয়। রাস্তায় দেখলাম একটা মটর গাড়ী বড় বড় গাছ বেঁধে ফেলে রেখেছে। ২০।২৫ জন কুলী বোধ হয় সেটাকে টেনে নিয়ে পৌঁছাবে। এ ছাড়া অনেক বড় বড় কাঠের বাক্সও ৮।১০ জন কুলি বাঁশে বা কাঠে ঝুলিয়ে নিয়ে যেতে রাস্তায় দেখেছি। পাহাড়ীরা সভ্যতার আড়ম্বর রক্ষা করতে কি কষ্টই যে করে। এ সব জিনিষ টেনে নিয়ে যেতে দেখলে মনে হয়, এর চেয়ে ঐ প্রকৃতির বুকে যা সম্ভব তেমন ভাবেই এদের থাকা ভাল। তবুও এখন রাস্তাঘাট কত ভাল হয়েছে, কত সব বন্দোবস্ত হয়েছে। আগে হয়ত আরও কষ্ট ছিল; তবে তখন এত সব জিনিষের প্রয়োজনও বোধ হয় ছিল না।

আমলকগঞ্জ পৌছে আহারাদি সেরে আমরা রাত্রির একটা স্পেশাল ট্রেণে রকসোল পৌছিলাম রাত্রি ৩টায়। ষ্টেশনেই একটু বিশ্রাম করে ভোর ৮টায় গাড়ীতে উঠে আমরা সন্ধ্যায় পাটনায় ফিরে এলাম। সে যেন এক স্বপ্নের দেশ আর এখানে এই কোলাহল; তাতে সেখানকার তুলনায় এখানে ভয়ানক গরম কয়েকদিন বিশ্রী লাগছিল।

এমনি করে এবার বাবা পশুপতিনাথের দর্শন হ'ল। জানিনা আর কবে এমনি আবার বেরোবার সুযোগ হ'বে। আবার বিষয়, অর্থ সংসার। এর মধ্যে সে অমৃতের স্বপ্নই যেন বাঁচিয়ে রাখে এ পিপাসিত প্রাণটীকে। জীবনের যা কিছু সঞ্চিত ভাল; তার মাঝে এমনি সব ছবি আঁকা, যাতে প্রাণ আছে আড়ম্বর নাই, ব্যথা আছে জঞ্জাল নাই, শান্তি আছে ভ্রান্তি নাই, দুঃখ আছে কিন্তু অবসাদ নাই। জয় হউক তোমার হে জীবনের অনন্ত পথের অমৃতময় পাথেয়। জেগে থেক তুমি আমার মধ্যে চিরদিন হারাণ গানের সুরের মত মহিমাময় হ'য়ে।

"জয় বাবা পশুপতিনাথ"

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

(সমাপ্ত)

ডাঃ শ্রীঅমলেন্দু কুমার সেন।

এম, ডি (হোমিও) এফ্, আর, এইচ, এস্।

বাঁশী কোথায় বাজে ?

*

বাঁশী

বাজিছে কোথা,
বঁধু নাহি ত হেথা
বুঝি এসেছেন ফিরে,
তেমন অদৃষ্ট কি রে !
দেখা পাব যে সেথা
শুধুই দুঃখ,
ব্যথা ।

*

*

বাজে

ওই যে পুনঃ !
সখি শুন গো শুন ;
কাঁদি গুমরি গুমরি
সদা মোর নাম ধরি
গাহে আমারি গুণ,
সখি ওই যে
শুন ।

*

*

মাঝে

যমুনা জলে,
কাল বিষেতে জ্বলে
গিয়ে প্রাণ ত্যজিবারে
শুনি বাঁশী ডাকে মোরে
প্রেম ভিখারী বলে
ফিরি সকলি
ভুলে ।

*

*

হৃদি

কাঁপিছে ডরে,
সে ত মথুরা পুরে ;
তবে তাপিত এ বুকে
বাড়া'ল জ্বালা বা কে ?
ভ্রম গেল না দূরে
মরি আগুনে
পুড়ে ।

*

*

ভব

চরণে ধরি
বল হে বংশীধারী
কোথায় লুকায়ে বাঁশী
আমার পরাণ নাশি'
ডাকে রাই কিশোরী
বল দয়াল
হরি ?

*

—ব্রহ্মচারী নির্ম্মল চৈতন্য—

শ্রীশ্রীতুকারাম।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বিঠোবাগতপ্রাণ পরম সহিষ্ণু তুকারাম সাংসারিক দুঃখকষ্টে লক্ষ্যহারা না হইয় শ্রীভগবানের পাদপদ্মে চিত্ত স্থির রাখিয়া আর একবার আত্মেচ্ছায় ও বন্ধুবর্গের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে ব্যবসায় রত হইলেন। বণিক্ পুত্র কৌলিক প্রথানুযায়ী অন্যবৃত্তি অবলম্বন করিলে মানহানি উপস্থিত হইবে সুতরাং গত্যন্তর না দেখিয়া পুনরায় ব্যবসায় মনোনিবেশ করিলেন। কঙ্কণ সমুদ্রের তীরবর্ত্তী এক দেবমন্দিরের সম্মুখে অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে এক লঙ্কার ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় তাহার দোকানে বহু ক্রেতার ভিড় হইতে লাগিল অল্পদিনের মধ্যে তাহার সমস্ত দ্রব্য নিঃশেষ হইয়া গেল। কিন্তু তাহার ব্যবসায়পদ্ধতি পূর্ব্ববৎ অপরিবর্ত্তনশীল রহিল। কেহ অর্দ্ধমূল্যে কেহ বা বিনামূল্যে কেহ বা গৃহের দুঃখকাহিনী বর্ণনা করিয়া অল্পকাল মধ্যে তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া দিল। তিনিও অতিমাত্রায় পরদুঃখকাতর ছিলেন। কাহারও প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করা তাহার স্বভাববিরুদ্ধ। কেহ মিথ্যা কথা বলিতে পারে, এ ধারণা তাহার ছিল না। আপনার ও আপনার পরিবারবর্গের কি হইবে, এ চিন্তা তাহার প্রকৃতিসুলভ ছিল না। "অভাবে, অভিযোগে, অসময়ে লোকের সেবা করাই ধর্ম্ম। বহু ভাগ্যবলে, বহু পুণ্যবলে লোকে পরোপকার করিবার সৌভাগ্য লাভ করে। কল্যাণকামী ব্যক্তি কখনই দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না; ধর্ম্ম স্বল্পমাত্র অনুষ্ঠান করিলেও অন্তিমে শ্রেয়োলাভ অবশ্যম্ভাবী।" ইহাই তাহার ধারণা ছিল। দুষ্টবুদ্ধি স্বার্থসর্ব্বস্ব ক্রেতাগণ তাহার মহানুভবতার পরিচয় পাইয়া অসঙ্গত প্রকারে তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিল। তাহারা বুঝিল না; তাহারা সামান্য ঐহিক ধনের লোভে পরমার্থ বিক্রয় করিতেছে। তাহার ক্রেতাগণ এতদূর হীনচেতা ছিল। তাহারা যে কেবল ঋণপূর্ব্বক তাহার পণ্যদ্রব্য লইয়া যাইত তাহা নয়, তাহারা "রাখিবার স্থান নাই" বলিয়া তাহার দ্রব্যাধারগুলি চাহিয়া লইত। এইরূপ ব্যবসায়ীর ক্রেতার অভাব হয় না বটে, কিন্তু তাহার ব্যবসায় চলিতে পারে না। তুকারাম এ ব্যবসায়েও অকৃতকার্য্য হইয়া বিষণ্ণচিত্তে স্বগৃহে পুনরাবর্ত্তন করিলেন। গৃহে পূর্ব্ববৎ স্ত্রী ও আত্মীয়গণ তাহাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিতে লাগিল। অনন্যোপায়

হইয়া তাহার স্ত্রী জনৈক পরিচিত ভদ্রমহোদয়ের নিকট হইতে দুইশত মুদ্রা কর্জ্জ করিয়া তাহাকে প্রদান করিলেন। তুকারাম ঐ মুদ্রায় পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া কয়েকজন বণিকের সহিত ব্যবসায়ার্থে বালেঘাটে গমন করিলেন। এবার ব্যবসায়ে মূলধনের এক চতুর্থাংশ লাভ হইল। দুর্ভাগ্যবশতঃ যখন তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেছেন, তখন পথে এক মলিনবদন দুর্ব্বল ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়া তাহার চিত্ত বিগলিত হইল। তিনি অনুসন্ধানে জানিলেন, ব্রাহ্মণ উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন নাই বলিয়া তাহাকে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতেছে। দ্বাদশবর্ষ অতীত হইল, তাহার গলদেশে একখণ্ড কাষ্ঠ ঝুলিতেছিল এবং কেশ ও শ্মশ্রু ক্ষৌরকার্য্যের অভাবে দীর্ঘ হইয়া গিয়াছিল। তিনি ব্রাহ্মণকে ঋণমুক্ত করিয়া দিলেন। তাহাতে তাহার সর্ব্বস্বান্ত হইল। তিনি তাহার মূলধন ও লাভের অংশ মোট দুইশত পঞ্চাশ টাকা প্রদান করিলেন। তুকারাম শূন্যহস্তে গৃহে ফিরিলেন। তাহার স্ত্রী সকল ব্যবহার অবগত হইয়া ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া যারপরনাই অপমান করিলেন। প্রতিবেশিগণও তাহাকে যথেষ্ট বিদ্রূপ করিতে লাগিল। এ বৎসর দেশে শস্যাভাব হইয়াছিল। সুতরাং দেশময় দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব। তাহার পত্নীর রোগটী এ সময় সমধিক বৃদ্ধি পাইল। যত্নাভাবে তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শন্তোজীও প্রাণত্যাগ করিল। তুকারাম তাহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। পুত্রের বিরহে তিনি বিশেষ বেদনা পাইয়াছিলেন। সকলেই তাহার ইষ্টপূজার নিন্দা করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই তাহার চিত্তবিকার সমুপস্থিত হইল না। তিনি ত লাভালাভের প্রত্যাশা করিয়া ভগবানের শরণ লয়েন নাই। ঈশ্বর তাহার ইহকালের ও পরকালের সুহৃদ্। তাহাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া তিনি জীবন-ধারণ করিবেন। যাহার ক্ষণিক সাহায্য ব্যতীত দেবগণেরও দিনাতিপাত হয় না, সেই হরিকে বিস্মৃত হইয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিবেন? অপরের কথা স্বতন্ত্র; তিনি যে ভগবৎ প্রেম সুধা পান করিয়াছেন। কিরূপে তাঁহাকে বিস্মৃত হইবেন? দুঃখে কষ্টে প্রতিনিয়তই সংসারের অনিত্যতা, মায়ামোহের মিথ্যাত্ব তাহার চক্ষে প্রতিভাত হইতেছে; সুতরাং তাহার পক্ষে বিঠোবার শরণ ব্যতীত আর উপায়ান্তর কি আছে? উপর্য্যুপরি দুঃখের কশাঘাতে তিনি স্থির নিশ্চয় করিলেন—সংসার ভীতিপ্রদ দুঃখে পরিপূর্ণ, এখানে সৎলোকের স্থান নাই; উন্নতিলাভের জন্য কতই উদ্যম স্বীকার করিলাম কিন্তু কৈ, কিছুতেই যে শান্তিলাভ হইল না; সাংসারিক উন্নতি চিরদিন

সুদূরপরাহত রহিল। দুঃখে কষ্টে অধীর হইয়া সংসারে প্রবাসীর মত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তিনি সংসারিক সুখে জলাঞ্জলি দিয়া ভগবৎ পাদপদ্মে শরীর, মন ও প্রাণ সকলই অর্পণ করিলেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি ভাম্বনাথ নামক একটী পর্ব্বতে কঠোর সাধনার জন্য যাত্রা করিলেন।

(ক্রমশঃ)

আমাদের প্রকৃত অভাব।

সাধন-ভজন, কি সাংসারিক উন্নতি—সকল কর্ম্মেই উন্নতির এক সাধারণ নিয়ম আছে। সেটী হইতেছে আত্মকৃপা বা পুরুষকার। বিনা চেষ্টায় দৃঢ়সঙ্কল্প ও উদ্যম অভাবে কোন কার্য্যই সফল হয় না। উন্নতির মূলাধার চেষ্টা—একথা সর্ব্বজনবিদিত হইলেও প্রায়ই সকলেই ইহা ভুলিয়া যান। কার্য্যকালে আমরা হাত-পা গুটাইয়া অলসভাবে বৃথা কল্পনা জল্পনা করিতে বড় ভালবাসি। ফলে আমরা সর্ব্ববিধ সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইতেছি। পূর্ব্বপুরুষগণের গৌরবময় অতীত কাহিনী বা ভবিষ্যতের আশাপ্রদ উন্নতির বা দৈবের দানের বিষয় আলোচনা করিয়া আমরা দিনাতিপাত করিতে আরম্ভ করিয়াছি। বর্ত্তমানের কোন ধারই আমরা ধারি না; অথচ আমাদের জীবন বর্ত্তমান কালকে লইয়া। বর্ত্তমানকে ছাড়িয়া কখনই আমরা থাকিতে বা বাঁচিতে পারি না। আমরা বর্ত্তমান কালের লোক। বর্ত্তমানকে মানিয়া চলাই আমাদের কর্ত্তব্য।

অতীতের সহিত আমাদের সম্বন্ধ কতটা? অতীতের শুভাশুভ ফল আলোচনা করিয়া আমরা বর্ত্তমানকে নিয়মিত করিব। অতীতকে দেখিয়া আমরা বর্ত্তমানে সাবধান হইব। অতীতের অভিজ্ঞতা, অতীতের ইতিহাস আমাদিগকে বর্ত্তমান কার্য্যক্ষেত্রে অধিকতর পটু ও কার্য্যদক্ষ করিয়া তুলিবে। যদি আমাদের দেশের অতীত ইতিহাস গৌরবময় হয়, তাহা হইলে আমরা আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থা তদপেক্ষা অধিকতর গৌরবময় করিতে চেষ্টা করিব। যদি আমাদিগের অতীত অবস্থা গৌরবকর না হয়, তাহা হইলে আমরা আমাদের অযশস্কর অতীত কথাকে

গৌরবময় করিতে বদ্ধপরিকর হইবে। আর ভবিষ্যতের সহিত আমাদের সম্বন্ধ কতটা? আমরা বর্ত্তমানে যে শুভাশুভ ফলভোগ করি, তাহা অতীত কৃতকর্ম্মের ফল। সুতরাং আমাদের উচিত বর্ত্তমানকে এমনভাবে পরিচালিত করা যাহাতে আমাদিগকে ভবিষ্যতে অসুবিধা সকল আর আক্রমণ করিতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদিগের অধিকাংশ লোকের পক্ষে অতীতের গৌরবকীর্ত্তি ও ভবিষ্যতের উন্নতির আশা বর্ত্তমান কার্য্যে উৎসাহ দান না করিয়া আমাদিগকে ভাবুক ও কল্পনাপরায়ণ করিয়া তুলিতেছে। আমরা উন্নতিশীল জাতি না হইয়া বিপরীতাভিমুখে ধাবিত হইতেছি। শিক্ষা, দীক্ষা, পরিবারপালন, গৃহকর্ম্মসম্পাদন, সমাজ সংরক্ষণ, দেশসেবা সকল বিষয়ে আমরা পরমুখাপেক্ষী ও শ্রমবিমুখ হইয়া পড়িতেছি। আমাদের সম্বল ও গৌরবের বিষয় পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপ স্মরণ; আমাদিগকে যে বড় হইতে হইবে, পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় উন্নত ও জ্ঞানসম্পন্ন না হইলে আমরা যে তাহাদিগের নামে কলঙ্কলেপন করিব—এ কথা আমরা ভুলিয়াও ভাবি না। আমরা কি সেই আর্য্যজাতির বংশধর নয়? তাদের ধমণীতে যে রক্ত প্রবাহিত হইয়াছিল, আমাদের শিরায় শিরায় কি সেই রক্ত প্রবাহিত হইতেছে না? আমরা কি আর্য্যগণের মাতৃভূমির জলবায়ু দ্বারা পরিবর্দ্ধিত ও পরিপালিত হইতেছি না? এ কি আশ্চর্য্যের বিষয়! সৎবৃক্ষে কুফল কেন? আত্মকর্ম্ম দোষই আমাদিগের দরিদ্রতার কারণ। আমরা আমাদিগকে হীন করিয়া ফেলিয়াছি। যে ত্যাগ, বিবেক, বৈরাগ্য, পরিশ্রম, স্বদেশহিতৈষিতা, ঈশ্বরভক্তি প্রভৃতির বলে মানবের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ সাধিত হয়, আমাদের অন্তর হইতে সেই সকল সদ্‌গুণ অন্তর্হিত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা স্বার্থান্ধ, অবিবেকী অলস, পরশ্রী-কাতর বিশ্বাসবিহীন ও কুসংস্কারাপন্ন জাতিতে পরিণত হইয়াছি। মুখে আর্য্যগণের গৌরব কীর্ত্তন করিলেও কার্য্যতঃ আমরা তাহাদিগের আদর্শ অনুসরণ না করিয়া পরানুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ফলতঃ আমাদের একুল ওকুল---দুকুল নষ্ট হইতে বসিয়াছে। দুই নৌকায় পা রাখিলে যেমন জীবননাশের শঙ্কা, বর্ত্তমানে আমাদিগের অবস্থাও তদ্রূপ অসহায় হইয়া পড়িয়াছে। পরানুকরণ বর্জ্জন করিতে হইবে, জাতীয় গৌরবকে আদর্শ করিয়া তুলিতে হইবে, পরানুকরণে নিবৃত্ত হইয়া আত্মানুশীলনে রত হইতে হইবে। তাহা হইলে ভারতের পূর্ব্বকার লুপ্তপ্রায় গৌরবময় অবস্থা পুনর্জীবিত হইতে পারে। কেবল ইচ্ছায় কোন কার্য্য সম্পন্ন হয় না, উদ্যম

সিংহের মুখে কখনও মৃগ প্রবেশ করে না; সিংহকেও আহার অন্বেষণার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে হয়। উন্নতি করিতে হইলে মানবের পক্ষে শ্রমস্বীকার আবশ্যক। ঈশ্বর সকলকে সমান শক্তি প্রদান করিয়াছেন। কেহ বা তাহার সদ্ব্যবহার দ্বারা উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতেছে, আবার কেহ বা তাহার অপব্যবহার দ্বারা অধোগামী হইতেছে। আপনাপন কর্ম্মানুযায়ী সকলে সুখদুঃখ ভোগ করিতেছে। উপনিষদের ভাষায় বলিতে হইলে অবশ্য বলিতে হইবে, "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" অর্থাৎ বলহীন কখনও আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারে না। ভারতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, ভূমির উর্ব্বরতা, ঋষির জ্ঞানগরিমা সত্ত্বেও পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির অভাবে ও শ্রম বিমুখতার নিমিত্ত আমাদের দিন দিন অবনতি হইতেছে। আমাদের অবনতির কারণ মুখ্যতঃ আত্মবিশ্বাস ও আত্মকৃপার অভাব।

শ্রীমাখনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

"মৈত্রী"।

দূত কহিল "উদ্যান দলিত, বিপর্য্যস্ত, রক্ষিদল বিধ্বস্ত ও বিতাড়িত। গন্ধর্ব্বের জীবনে ধিক্।"

গন্ধর্ব্বরাজ মদমত্ত করীর ন্যায় লতা, গুল্ম, বৃক্ষ, নদনদী, পর্ব্বত, উপত্যকা দলিত করিয়া ছুটিয়াছেন। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিতেছে, প্রবল নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে বিশাল বক্ষ প্রলয়কালীন কম্পিত ধরিত্রীর ন্যায় উঠিতেছে, পড়িতেছে। তাঁর দৃঢ়মুষ্টিতে অরিত্রাসী কার্ম্মুক, পৃষ্ঠে দৃঢ়বদ্ধ তূণীর। তাতে লক্ষ লক্ষ মন্ত্রপূত শর ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিতেছে; রথের ঘন ঘোর ঘর্ঘরে বনভূমি প্রকম্পিত; শ্বাপদসঙ্কুল ত্রাসে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে; অসংখ্য গন্ধর্ব্ব সৈন্যের কোলাহলে, যুদ্ধার্থী মাতঙ্গগণের বৃংহতি নাদে রণতুরঙ্গের ঘন ঘন হ্রেষারবে প্রভাসের তটভূমি শব্দায়মান। বীরগণের অস্ত্র ঝনৎকারে ও বাহ্বাস্ফোটনে শত্রুদল ব্যূহরক্ষায় সচেষ্ট হইতেছে।

এদিকে শত শত উদ্ভিন্নযৌবনা পুরনারী আনন্দে বিহার করিতেছেন। কেহ বা পুষ্পকোরক দিয়া, কেহ বা প্রস্ফুটিত ফুল দিয়া দিব্য মনোহর মালা গাঁথিতেছেন, কেহ বা বনভূমি মুখরিত করিয়া উদাত্তস্বরে গাহিতেছেন, কেহ বা নব মধুলোভী মধুকরের ন্যায় গুঞ্জন করিতেছেন, কেহ বা আবক্ষ নিমজ্জিত করিয়া জলকেলি করিতেছেন, আবার কেহ বা বালসূর্য্যদীপ্ত নিমজ্জিতাবশিষ্ট শরীরের উপর জল নিক্ষেপ করিয়া প্রাণ-খোলা হাসিতে আত্মহারা হইতেছেন ? কোন যুবতী প্রভাসের জলে অঙ্গরাগ মিশাইয়া দিয়া সন্তরণ করিতেছে ডুবিতেছে উঠিতেছে পড়িতেছে ও রুনু, ঝুনু, রুনু ঝুনু নূপুর ধ্বনিতে তালে তালে নাচিতেছে ; তাই প্রভাসের উচ্ছল জলরাশি ছলছল করিতেছে ও তীরে প্রতিহত হইয়া কত কি গাহিতেছে। স্নিগ্ধ চঞ্চল পবন যুবতীগণের বস্ত্র লইয়া লুকোচুরি খেলিতেছে। অসংখ্য পাখী কাকলী-মূর্চ্ছনায় বনভূমি প্রভাসতীর তন্দ্রাবেশে ঢলিয়া পড়িয়াছে।

এমন সময়ে দূরে তূর্য্যধ্বনি হইল। 'মার' 'মার' রবে গগন, পবন, উদ্যান, প্রভাসের জল স্থল কাঁপিয়া উঠিল। গিরিগুহায় সিংহ গর্জ্জিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে অসংখ্য শরজালে গগন আচ্ছন্ন হইল। কৃপ, শল্য, কর্ণ প্রভৃতি রথিগণ স্ব স্ব কার্ম্মুক হস্তে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করিয়া নারীকুল ও রাজা দুর্য্যোধনকে রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু গন্ধর্ব্বের অপূর্ব্ব মায়াজালে কেহ স্থির থাকিতে পারিলেন না। কে বা কাহারা কোথা হইতে অসংখ্য শরবৃষ্টি করিতেছে তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। শুধু মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ক্ষত্রিয়গণের শোণিতে প্রভাসের কালো জল 'খুনখারাবী রঙে' রঙিয়া উঠিল। বীর যাহারা, তাঁহারা হৃদয়ের শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্য্যন্ত যুঝিতে লাগিলেন, কিন্তু সকলেই ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলেন। এই সমস্ত অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে অতীব বিস্মিত হইয়া সহজাত কবচকুণ্ডলধারী বীর কর্ণ ধীরভাবে সৈন্য চালনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অব্যর্থ সন্ধানে ও শব্দভেদী বাণপ্রয়োগে শত শত গন্ধর্ব্ব শূন্য হইতে ছিন্নমুণ্ড হইয়া পড়িতে লাগিল। তাঁহার অদ্ভুত রণকৌশল দর্শন করিয়া অন্তরীক্ষ হইতে দেবতাগণ 'সাধু, সাধু' বলিতে লাগিলেন, কিন্তু অদৃশ্য গন্ধর্ব্বের সহিত মানুষ যুঝিবে কেমনে ? দুর্য্যোধন ও বীরগণ পরাজিত হইলেন। গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন অদ্ভুত মায়াজালে সকলকে মোহাবিষ্ট করিয়া বন্দী করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কৃপ, শল্য সকলেই শৃঙ্খলিত। তাহাদের বীর হৃদয় থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। কেননা

সঙ্গে সঙ্গে শত শত পুরনারী বন্দিনী। যাঁহারা পুষ্পের আঘাতেও মূর্চ্ছা যান, যাঁহারা কোমল চরণে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হইলে ক্লান্ত হন, তাঁহারা আজ গন্ধর্ব্ব হস্তে বন্দিনী। না জানি ভবিষ্যতে কত লাঞ্ছনা, অপমান তাহাদিগের অপেক্ষা করিতেছে। এই ভয়ে তাঁহারা বিলাপ করিতেছেন, সাহায্যের জন্য চীৎকার করিতেছেন, পার্শ্বে শৃঙ্খলিত কেশরিগণ নিষ্ফল গর্জ্জন করিতেছেন। ধনাভিমানী দুর্য্যোধন লজ্জায়, ক্ষোভে, দুঃখে নির্ব্বাক, নিস্পন্দ। যে বিষয়ের মাদকতায় মত্ত হইয়া তিনি প্রভাস তীরে আসিয়াছেন, যে বিশাল সৈন্যবল চালনা করিয়া তিনি নির্ব্বাসিত ভায়েদের প্রাণে ঈর্ষা ও আতঙ্কের সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহা আজ কোথায়! সকলই জলবুদ্বুদের ন্যায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে! তাঁহারই চোখের সামনে পুরনারীগণ লাঞ্ছিত হইতেছেন, তাঁহাদের করুণ আর্ত্তনাদে প্রভাসের তটভূমি ম্লান হইয়াছে—বনভূমি ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়াছে।

এদিকে সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়া ধর্ম্মপ্রাণ যুধিষ্ঠির অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন; কিন্তু পার্থ ও ভীমসেন অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন। শত্রুর নাশে, পরাজয়ে ভীমসেন অত্যন্ত সুখী। কিন্তু দুঃশাসনের বন্ধন সংবাদে ভীমসেন চঞ্চল হইয়াছেন বুঝি বা তাঁহার 'রক্ত পান প্রতিজ্ঞা' পূর্ণ হইল না; বুঝিবা দ্রৌপদী চিরদিন এলোকেশীই রহিয়া গেল। এমন সময় যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের তিরস্কার করিয়া কহিতে লাগিলেন "হে অমিততেজা ভীমসেন! হে ধনুর্দ্ধর পার্থ! তোমাদের মনোভাবে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। ওদিকে পুরনারীগণ গন্ধর্ব্ব আদেশে শৃঙ্খলিত আর এদিকে তোমরা আনন্দে আত্মহারা। দুর্য্যোধন আমাদের শত্রু হলেও আমাদের ভাই। ভায়ের অপমান ও কুলনারীদের অপমান সহ্য করা মৃতেরই সাজে। ইহা শুধু কাপুরুষোচিত প্রবৃত্তি। যখন দুর্য্যোধন আমাদের বিপক্ষে, তখন তাহারা শত ভাই এক পতাকাতলে আর আমরা পঞ্চ ভ্রাতা ভিন্ন শিবিরে। কিন্তু যখন কোন বহিঃশত্রু আসিয়া স্বজাতি, স্বদেশ, প্রজাকুল, নারীকুল, বিপর্য্যস্ত, লাঞ্ছিত, অপমানিত করিয়া যাইবে, তখন আমাদের আর ভেদাভেদ থাকিবে না। তখন দেশরক্ষায়, মায়ের সম্মান রক্ষায় আমরা একশত পাঁচ ভাই একই পতাকাতলে দাঁড়াইব। হে অর্জ্জুন, হে ভীমসেন, ক্রোধে ধর্ম্ম বিস্মৃত হইও না। দর্পী গন্ধর্ব্বের হস্ত হইতে শৃঙ্খলিত ভায়েদের ও বধূদের মুক্ত করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা কর, তোমাদের আনন্দ শুধু নীচতার পরিচায়ক।"

তখন দীপ্ত সিংহ গর্জ্জিয়া উঠিল। স্বজাতি সম্মান রক্ষায় বদ্ধপরিকর হইয়া ভীমার্জ্জুন অস্ত্রধারণ করিলেন; তাঁহাদের বীরনাদে যোগীর ধ্যানভঙ্গ হইল; স্রোতস্বতীর স্রোত বন্ধ হইল, বায়ু নিশ্চল হইল; সূর্য্যদেব ম্লান হইলেন।

এদিকে গন্ধর্ব্বরাজ বিজয়গর্ব্বে স্ফীত হইয়া আনন্দচিত্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। এমন সময় লক্ষ লক্ষ শর ঝলকে ঝলকে অগ্নিবৃষ্টি করিতে করিতে তাঁহার পথরোধ করিল। শত শত পর্ব্বত চাপে অসংখ্য গন্ধর্ব্বসেনা প্রাণ হারাইতে লাগিল। পার্থের মন্ত্রপূত অপূর্ব্ব শরজাল, পর্ব্বত, ভূজঙ্গ, বজ্র, বৃক্ষ, শিলা, ঝটিকারূপে ধ্বংস করিতে লাগিল। ভীমসেন শালতরুর ন্যায় বিশাল ভূজযুগ চালনা করিয়া হস্তী দ্বারা হস্তী, রথ দ্বারা রথী, অশ্ব দ্বারা সৈন্যকুল ধ্বংস করিতে লাগিলেন। তিনি কালান্তক যমের ন্যায় গন্ধর্ব্বসেনা নির্ম্মূল করিতে লাগিলেন। এই নূতন বিপদে গন্ধর্ব্বরাজ প্রমাদ গণিলেন। দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, শল্য প্রভৃতি শৃঙ্খলিত বীরগণ স্তম্ভিত হইলেন। কিন্তু নারীকুল ভীম ও অর্জ্জুনকে দেখিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। এইরূপে বহুক্ষণ যুদ্ধের পর চিত্রসেন গন্ধর্ব্ব সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। পরাজিতগণকে বন্দী করিয়া ও শৃঙ্খলিতগণকে মুক্ত করিয়া ভীমার্জ্জুন যুধিষ্ঠির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মপ্রাণ যুধিষ্ঠির পূর্ব্ব বৈরিভাব ভুলিয়া গিয়া সকলকে সাদরে সম্ভাষণ করিলেন। গন্ধর্ব্বরাজ মুক্ত হইয়া নিজ আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন। দুর্য্যোধন সন্তুষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে অভিপ্রেত বর দিতে চাহিলেন। অর্জ্জুন "সময় মত লইব" বলিয়া সকলকে বিদায় দিলেন।

শ্রীসত্যরঞ্জন সিংহ রায় বি-এ।



অক্রুর সংবাদ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(বর্ণনা)

নিজ কৃপা গুণে হরি করুণা নিদান।
তন্তুবায়ে জ্ঞানচক্ষু করিল প্রদান॥
মালাকার সুদমারে ধন্য করিবারে।
চলিলেন লীলাময় তাহার আগারে॥
কংসের কারণে তার যত মালা ছিল।
"রামকৃষ্ণ" গোপগণে সকলি পড়িল॥
কুসুমে ভূষিত হয়ে কৃষ্ণ বলরাম।
ধরিল অপূর্ব্ব শোভা নয়নাভিরাম॥
ফুলহারে বিভূষিত হইয়া তখন।
বাসনা হইল মনে পড়িতে চন্দন॥
হেন কালে এক নারী কুব্জ দেহ লয়ে।
চন্দন লইয়া যায় মুখ আবরিয়ে॥
কুঁজি, কুঁজি বলে সবে ব্যঙ্গ করে তারে।
লজ্জায় ঘৃণায় তার আঁখি ত্বটি ঝরে॥
কাতর হইয়া তবে অন্তরে অন্তরে।
বলে লজ্জানিবারণ! পদে রাখ মোরে॥
শুনি হরি তব পদে লইলে শরণ।
তখনি তাহার পাপ হয় বিমোচন॥
দয়াময় নিজ গুণে কর পরিত্রাণ।
অভয় চরণে তব দাও মোরে স্থান॥

অন্তর্য্যামী নারায়ণ সকলি শুনিল ।
সুন্দরী বলিয়া তবে কুব্জারে ডাকিল ॥
জীবনে কুবুজা যাহা করেনি শ্রবণ ।
সুন্দরী বলিয়া কেবা করে সম্বোধন ॥
এমন মধুর স্বরে কে ডাকে আমারে ।
দেখিব বারেক আমি নয়নে তাহারে ॥
এই বলি বদনের বস্ত্র সরাইয়া ।
রামকৃষ্ণ পানে কুব্জা দেখিল চাহিয়া ।
ভুবন মোহন রূপ দেখিয়া নয়নে ।
আনন্দ আবেশে কুব্জা ভাবে মনে মনে ॥
কোথা হতে পূর্ণচন্দ্র ভূতলে আসিয়া ।
হৃদয় আঁধার মোর দিল ঘুচাইয়া ॥
জনমে জনমে যদি হই আমি নারী ।
হই যেন ইহাদের পদের কিঙ্করী ॥
কুব্জার প্রাণের ভাব বুঝি নারায়ণ ।
বলে ধনী কোথা যাও লইয়া চন্দন ॥
কুব্জা বলে যাই আমি রাজার সদনে ।
কংস মোরে রাখিয়াছে চন্দন লেপনে ॥
কৃষ্ণ বলে মোর ইচ্ছা হইতেছে মনে ।
তোমার চন্দন আজি পড়িব দুজনে ॥
চন্দনে চর্চ্চিত দেহ করিলে আমার ।
ভুবনমোহিনী রূপ হইবে তোমার ॥
কুব্জা বলে হেন ভাগ্য কি আছে আমার ।
আমার চন্দন ভালে পড়াব তোমার ॥
অনুমতি দাও যদি নিজ কৃপাগুণে ।
তা হ'লে চন্দন আমি পড়াই যতনে ॥

এত মধুময় তুমি ! এমন সুন্দর !
জানিনা কেমনে হ'লে এত মনোহর ॥
এই বলি রাম কৃষ্ণে প্রাণের যতনে ।
নিজ করে বিভূষিত করিল চন্দনে ॥
কৃষ্ণ অঙ্গ পরশনে কুবুজা তখন ।
ভূবনমোহিনী রূপ করিল ধারণ ॥
লাবণ্য ফুটিল যেন প্রতি অঙ্গে তার ।
প্রেমানন্দে পূর্ণ হোল হৃদয় তাহার ॥

[কুব্জার অবস্থা বর্ণনা]

(পদাবলী)

কুবুজা সুন্দরী　　অতি মনোহারী
দেখিল আপন অঙ্গ ।
ত্রিভঙ্গ আছিল　　মোহিনী হইল
এ বড়ি রসের রঙ্গ ॥
মোহিত হইল　　নগর সকল
একি অদভুত শুনি ।
ত্রিভঙ্গ যে ছিল　　সুন্দরী হইল
এমন নাহিক জানি ॥
কুবুজা দেখিতে　　নগর হইতে
দেখিতে আইল তারা ।
নিশ্চয় শুনিল　　নয়নে দেখিল
এই সে কেমনে ধারা
কেহ বলে ভাই　　রথে দুই ভাই
মাখল চন্দন চান্দ ।
মালা বিলক্ষণ　　দেখিল সঘন
দু ভাই হাসল মন্দ ॥

হেনক সময় ইহার পরশে
কুঁজ গেল কতি দূরে।
অতি বিলক্ষণ দেখিল নয়ন
এ কথা কহিব কারে॥
এ নহে মানুষ জানিল স্বরূপ
কেবল জগতপতি।
ত্রিভঙ্গ শরীর হইল সুন্দর
বুঝিল কাজের গতি॥
চণ্ডীদাস বলে যাহার নামেতে
এ তিন ভুবন ঘোষে।
এই ভাগ্যবতী পেয়ে প্রাণপতি
পাইল যাহার স্পর্শে॥

(বর্ণনা)

আপনার রূপ হেরি আপন নয়নে।
লুটায়ে পড়িল কুব্জা কৃষ্ণের চরণে॥
কর যোড়ে বলে তবে সজল নয়নে।
এত রূপ দিলে যদি নিজ কৃপা গুণে॥
রাখ তবে দাসী করি ও রাঙ্গা চরণে।
নতুবা কি কাজ মোর এ ছার জীবনে॥
এ মাধুর্য্য লয়ে আমি কোথা বল যাব।
রূপময় তব রূপ তব পদে দিব॥
তোমার পরশে আমি হইনু সুন্দরী।
জীবনে মরণে হব তোমার কিঙ্করী॥

(ক্রমশঃ)

—০:(*):০—

ভগবৎ সেবা।

ভগবানের সেবাই শুদ্ধাভক্তি লাভের সহজ সরল উপায় ও চরম সোপান। ভগবানের পরম করুণায় জীব সেবার অধিকার পায়। সেবাধিকার ত্রিজগতে পরম দুর্লভ। বহু পুণ্যফলে, শ্রীভগবানের অশেষ করুণার প্রভাবে, মানব হৃদয়ে সেবার ভাব উদিত হয়, আর যিনি আত্মবৎ ভগবানের সেবা করিতে পারেন, তিনি সেবাধিকারীর মধ্যে পরম সৌভাগ্যবান্। নির্ব্বিকল্প সমাধিমগ্ন মহাপুরুষগণও সতত সেবাধিকার কামনা করেন। তাঁহার স্মরণ, মনন, বন্দন ও ধ্যানে কত রস, তাহা প্রেমিকই জানিতে পারেন। অন্য জন কি বুঝিবে? স্বচ্ছ অচঞ্চল সলিলে চন্দ্র সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, পাপমলিন বিষয়াসক্ত জীব ভগবৎপ্রেমের মহিমা কিরূপে বুঝিতে পারিবে? গোপীগণ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাব এই পঞ্চভাবে তাহাদিগের প্রাণনাথের সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে মহান্, প্রভু, সখা, স্নেহাস্পদ, পুত্র, কন্যা বা প্রেমাস্পদ প্রাণনাথ জ্ঞানে সেবা করা অপেক্ষা ভক্তের নিকট আর কি অতুল বিভব থাকিতে পারে? তাঁহার ধন, জন, মান, দেহ, মনপ্রাণ সকলই তাঁহার শ্রীচরণে অর্পণ করিয়া থাকেন। ইহা অপেক্ষা আর কি গৌরবকর ব্যাপার থাকিতে পারে? যিনি তাঁহার জিনিষ তাঁহাকে অর্পণ করিতে কুণ্ঠিত, তিনি ত চোর, বিশ্বাসঘাতক। ভক্ত প্রভুর সেবায় আত্মোৎসর্গ করেন; তাঁহাকে বৈ আর কিছুই জানেন না, আর কিছু চান না। ভক্ত তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত দাস বা তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীন। প্রভুর সেবা হয় নাই, তাঁহার পূজার, আহারের বা স্নানের বা শয়নের সময় অতিবাহিত হইতেছে, এইরূপ উদ্বেগ অপেক্ষা আর কি উচ্চভাব থাকিতে পারে? তাঁহাকে আপনার জীবনের সাথী, পথপ্রদর্শক বা প্রভু করিয়া তাহার নিয়ত সেবা করা অপেক্ষা আর কি বিশেষ পুরুষকার দেখান যাইতে পারে? আহা ভক্তজনের অন্তরে ভগবানের প্রতি কি ভালবাসা! অম্ল বা কটু ফলাস্বাদনে সখার অস্বস্তি উৎপন্ন হইবে, তাই গুহক চণ্ডাল প্রথমতঃ স্বয়ং ফলাস্বাদন পূর্ব্বক মিষ্ট ফলগুলি ভগবান্ রামচন্দ্রকে আহার করিতে দিলেন আর বিস্বাদ ফলগুলি আপনি পূর্ব্বে আস্বাদন করিয়া পরিত্যাগ করিলেন। সত্যই বিষ্ণু ভক্তিপরায়ণ গুহক সকলের আদর্শ। তাহার সেবার কি তুলনা মিলে? শরণাগত

সেবাপরায়ণ ভক্ত সেবার গুণে স্বশরীরে স্বর্গ লাভ করেন। সেবার প্রভাবে জন্ম মৃত্যু ভয় সকলই জয় করেন। তিনি এক অপূর্ব্ব প্রেমানন্দে নিমগ্ন থাকেন। মূকের আস্বাদন যেমন অনির্ব্বচনীয়, ভক্তের ভগবৎ সেবাসঞ্জাত আনন্দও তদ্রূপ অনির্ব্বচনীয়। রত্নাকর যাহার বাসস্থান, স্বয়ং পদ্মা যাহার গৃহিণী, তাহার আবার অভাব কিসের? বিশ্বনাথ যাহার ভাণ্ডারী, তাহার আবার অভাব কিসের? ভক্তকে ধন্য করিবার জন্য তাঁহার লীলাচাতুরী। ভক্ত পুলক ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পুত্তলিকার মত হইয়া তাঁহার সেবা করেন। অর্জ্জুন যেমন নিমিত্তমাত্র হইয়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ব্যাপার নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন, ভক্তও তদ্রূপ ভগবদ্ ভাবপ্রণোদিত হইয়া ভগবানের সেবায় রত হন। রাজা যেমন দীন প্রজার সেবাগ্রহণে অভিলাষী হইলে, অগ্রে তাহার ব্যবস্থা করিয়া তাহার কুটিরে পদার্পণ করেন, তদ্রূপ ভগবান্‌ও ভক্তের পূজা গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাহার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। শিশুর জন্মের পূর্ব্বে মাতৃস্তন্যে যেমন দুগ্ধ আসিয়া থাকে, তদ্রূপ ভগবান্‌ও তাঁহার কর্ম্ম তিনি করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং জীব তাঁহার কি করিবে? তিনি ত জীবের সকল অভাব পূর্ণ করিতেছেন। তবে জীব তাহার জিনিষ তাঁহাকে অর্পণ করিয়া আপনি মহৎ ও মায়ামুক্ত হইয়া থাকে। তাহার ক্ষুদ্রত্ব, আমিত্ব অহংত্ব, সংসার-বন্ধন সকল খসিয়া পড়ে। তিনি ঈশ্বরের আপনার জন হইয়া থাকেন। মায়া-মোহ ভ্রান্তি বিনষ্ট না হইলে মনুষ্য ভগবানকে আপনার জন বলিয়া চিনিতে পারেন না। সিদ্ধির পরাকাষ্ঠা লাভ হইলে পর সাধক ঈশ্বরে মদীয়তা ভক্তি আরোপ করেন। যখন সর্ব্বপ্রথম ঈশ্বরে প্রেম উৎপন্ন হয়, তখন সে প্রেম তদীয়তা ভাব ধারণ করে, অর্থাৎ ঈশ্বর আমার প্রভু, আমি তাঁর সেবক, দাস-ভক্তের প্রাণে এইরূপ ভাব জাগ্রত হয়; তখন তাহার সহিত সম্বন্ধ অনেকটা দূরবর্ত্তী। তারপর যখন প্রেম গাঢ়তর হয় তখন মনে হয়, আমি তোমার; এইরূপ প্রেমকে ত্বদীয়তা ভাব বলে। আর প্রেম যখন পরিপূর্ণতা লাভ করে, তখন মনে হয়, ঈশ্বর আমার; তখন আর দেবতার ঐশ্বর্য্যভাব বা ভয় মনে বিদ্যমান থাকে না। সে সময় মনে হয়, আমার যত্ন ও সেবার অভাবে প্রভুর কত কষ্ট হইতেছে; প্রভু আমার আশ্রিত বা প্রিয়তম:—যেমন যশোদার ভাব বা শ্রীরাধার ভাব। যদিও আত্মবৎ সেবা খুব কঠিন ব্যাপার, তথাপি সকলে ইহা অনুষ্ঠান করিতে পারেন। বিশ্বাসী ভক্ত প্রভু জ্ঞানে বা দেবতা জ্ঞানে প্রথমতঃ ভগবানের সেবায় রত হইতে পারেন। কালে

ভাবের পুষ্টি হইলে স্বতঃই আত্মবৎ সেবার ভাব মন হইতে উথলিয়া উঠিবে। কোন ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে না। ভক্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন; তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন আর শরণাগতে প্রভু দর্শন দেন ও ভক্তের সেবা গ্রহণ করেন, একথা তিনি স্বীকার করেন, সুতরাং তাহার মতে সেবা কখনই নিষ্ফল হয় না পরন্তু উহা বৈধ কর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয়। অপর পক্ষে মানব মন ধর্ম্মালোচনার প্রথমাবস্থায় ভোগরত সুতরাং আপনার অভাব সকল স্মরণকরতঃ এ সময়ে আপনার বাঞ্ছিত প্রিয় বস্তু সকল শ্রীভগবানের পাদপদ্মে নিবেদন করা স্বাভাবিক।

শ্রীমতী অনিলাবালা দাসী।

খোলা।

জীবনে একটা জিনিব বড় দুর্লভ। সেটার নাম Sincerity উহার মানে এই, ভেতরের সঙ্গে বাইরের মিল থাকা—তাহা সব কথায়, কাজে এবং চিন্তার মধ্যে ফুটিয়ে তুল্‌তে হবে। পৃথিবীতে যদি কিছু কঠিন কাজ থাকে. সেটা এই। জ্ঞানীই হউন, কর্ম্মীই হউন, ভক্তই হউন আর যোগীই হউন—সব রাস্তার গোড়াকার কথা এই এবং সব রাস্তার পরিণতি হ'চ্ছে—উহার চরম পুষ্টিতে। Sincerityটা বড় মূল্যবান্ কেন জানেন? ওটা না হ'লে অসত্যকে ত্যাগ করা যায় না। অসত্য ত্যাগ না কর্ত্তে পার্লে সত্যস্বরূপকে ধরা যায় না। ভগবানের যদি কোন রূপ থাকে, তাহা সত্যের উপাদানেই তৈরী। ভগবানের যদি কোন নাম থাকে—তাহা সত্য। নাম রূপ ছাড়িয়ে উঠ্‌তে গেলেও সত্য ছাড়া আর কোন কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। পরমহংসদেব ৺জগজ্জননীর চরণে সকল বস্তু সমর্পণ ক'রেছিলেন, পারেন নি কেবল সত্যকে হাত ছাড়া কর্ত্তে। যে সত্য এত বড়—তা পেতে গেলে চাই ঐ একটা জিনিষ—মনে মুখে খাঁটী থাকা।

এই ধরুণ, যাঁরা বক্তৃতা দেন এবং খুব বড় বড় সত্য নিয়ে আলোচনা করেন, অথবা যাঁরা কাগজে ও পুস্তকে বড় বড় বিষয়ের সিদ্ধান্ত কর্ব্বার চেষ্টা করেন—

তাঁদের মধ্যে অনেকেরই কথা মানুষের মস্তিষ্কে বা হৃদয়ে সাময়িক কিছু ঘা' দিলেও সে 'ঘা' দ্বারা বক্তার ও লেখকের বা শ্রোতা এবং পাঠকের জীবনে প্রকৃত ফল দর্শায় না।

জীবনই জীবন দিতে পারে। সত্যই সত্য দিতে পারে। সেইরূপ খাঁটি হ'লেই খাঁটিত্ব দেওয়া যেতে পারে। ইহাই জীবনের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। নচেৎ এই ঝুটা দুনীয়াতে ঝুটার কারবার ক'রেই যেতে হবে—সব চেয়ে বুদ্ধিমান্ সেই লোক যে এই কথাটা বুঝ্‌তে এবং তাড়াতাড়ি কাজে লেগে যেতে পারে। কাজটা হচ্ছে এই—প্রথমে নিজেকে সাম্‌লাতে হবে। নিজে সাম্‌লে চল্লেই, দুনীয়াটা দেখবেন ঠিক সাম্‌লেই চলেছে। যত গোলমাল নিজের ভেতরেই। নিজের গোল না মিটিয়ে যে দুনীয়ার গোল শান্ত কর্ত্তে যায় সে গোলকধাঁধাঁয় ঘুরপাক খাচ্ছে। কারণ, এ দুনীয়াটা প্রত্যেক মানুষ নিজের ভেতরের ভাব নিয়েই গড়্‌ছে এবং ভাঙ্গ্‌ছে। অতএব দুনীয়ার ভাঙ্গাগড়া যখন নিজের ভিতরের উপর নির্ভর কচ্ছে, তখন নিজেকে সাম্‌লানটাই শ্রেষ্ঠ সাধন। দুনীয়াটা আপনার কথামত চল্‌বে কখন জানেন? যখন আপনি নিজকে নিজের কথামত চালাতে পার্ব্বেন।

ব্রহ্মচারী জ্ঞান।

চণ্ডালের পূজা।

প্রথম পর্ব্ব।

তখন বৈশাখ মাস। ভরা দুপুরবেলা। দিনমণি মধ্যাহ্ন গগনে প্রাণপণে আপনার সকল শক্তি নিঃশেষ করে কিরণ ছড়াতে সুরু করেছেন। সে উত্তপ্ত সূর্য্যতেজ সহ্য করে কার সাধ্য। পশুপাখী সব গাছতলায় ও গাছের শাখায় আশ্রয় নিয়েছে। রাস্তায় জনমানব নাই। গাছপালা সব রাঙা হয়ে পড়েছে। এমন সময় একদিন কে যেন ক্ষীণস্বরে কাতরভাবে চীৎকার করে ডাক্‌লে "ঠাকুর মশাই! বাড়ী আছেন কি?"

ঠাকুর মশাই তখন সবে আহারাদি শেষ করে অন্দর দাওয়ায় তামাক খেতে-ছিলেন। স্বরটা তাঁর কাছে পরিচিত বলে বোধ হল কিন্তু অস্বাভাবিকভাবে ক্ষীণ

মনে হওয়ায় তিনি একটু ব্যস্ত হয়ে বলিলেন, কে ও গঙ্গাপ্রসাদ? ভিতরে আয় না? অমন করে বাহিরে দাঁড়িয়ে কেন?

গঙ্গাপ্রসাদ অতি ধীরভাবে ভিতরে প্রবেশ করে ঠাকুর মশাইকে দূর হতে একটা সভক্তি দণ্ডবৎ প্রণাম করে উঠানের একপাশে দীনভাবে দাঁড়ালেন। গঙ্গাপ্রসাদ জাতিতে চণ্ডাল। ঠাকুর মশাই গ্রামের স্বনামধন্য পণ্ডিত তর্কপঞ্চানন। দেশের জমিদার হতে আরম্ভ করে ইতরভদ্র সকলে তাঁকে মান্য করেন। এমন মানী উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণের বাড়ীতে দেশের চণ্ডাল যে অতি হীনভাবে দাঁড়াবে, এ আর বড় আশ্চর্য্য কথা কিসের?

ঠাকুর। তোর কি হ'ল রে? হঠাৎ এমন সময় পাগলের মত উপস্থিত; ঠাকুর মশাইকে কোন কথা বলতে গঙ্গার সাহসে কুলায় না; অথচ না বলিলেও নয় সুতরাং কি করে? এবার ঠাকুর মশায়ের প্রশ্নে বল পেয়ে অতিশয় কাকুতি মিনতি করে করযোড়ে গলবস্ত্র হয়ে গঙ্গা বলিল, "বলচি, ঠাকুর মশাই, আমার গাছে এই প্রথম আম। তা' মা গঙ্গাকে না দিয়ে খাই কি করে? আপনি যদি কাল স্নানে যাবার সময় কৃপা করে এইটা মাকে অর্পণ করেন, তবে আমি—।" এই কথাগুলি বল্‌তে বলতে তার স্বর জড়িয়ে এল, চোখে জল এল। সে আর কিছু বলতে পারলে না।

গঙ্গা জাতিতে চণ্ডাল। তার ধারণা দেবদেবীর পূজায় তার অধিকার নাই। সে স্বয়ং মাকে ফলটী নিবেদন করতে পারে না। তাই আজ সে ঠাকুর মশায়ের বাড়ীতে এসেছে। যদি ঠাকুর মশাই দয়া করে ফলটী মা গঙ্গাকে অর্পণ করেন, তবেই মা তার পূজা গ্রহণ করবেন, নতুবা নয়।

ঠাকুর। আচ্ছা; ওটী ওখানে রেখে যা। কাল স্নানে যাবার সময় দেখা যাবে।

এবার ঠাকুর মশায়ের কথায় গঙ্গা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলে। মাকে তার গাছের প্রথম ফলটী অর্পণ করা হবে এই চিন্তায় সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। সে সকল বিষয়ে ঐরূপ করে। তার গাই যখন প্রথম দুধ দেয়, তখন আগে সে মাকে গরুর দুধ দেয়, তবে সে খায়। যখনই কোন নূতন জিনিষ সে পায়, মাকে আগে না দিয়ে সে কখনই তা ভোগ করে না। এবার সে ভেবেছিল তার চিরন্তন সাধের রীতিটা বুঝি নষ্ট হয়ে যায়। যারা তার গরুর দুধ ও গাছের

ফলগুলি দয়া করে মাকে অর্পণ করে দিতেন, এবার সকলেই কি জানি কোন্ অজ্ঞাত কারণে তার কাজটী, এই সামান্য উপকারটী করে দিতে নারাজ হলেন। অনন্যোপায় হয়ে সে আজ তাই ছুটে এসেছে, গ্রামের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতের বাড়ীতে। যাক্ ভগবানের অশেষ করুণায় ঠাকুর মশাই এক কথায় রাজি হলেন, এতে গঙ্গার আনন্দের পরিসীমা নাই। গঙ্গা ঠাকুর মশাইকে একটী প্রণাম করে ভক্তি গদগদচিত্তে বলতে লাগলেন. আজ যে এই দাসকে কতখানি সুখ দিলেন, তা বলতে পারি না। আমি চিরদিন আপনার কেনা হয়ে রইলাম। তার পর সে আর একটী প্রণাম করে ঠাকুর মশায়ের অনুমতি নিয়ে বিদায় লইল। ঠাকুর মশাই তার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও দীনতার প্রশংসা না করে থাক্‌তে পারলেন না।

গঙ্গাপ্রসাদ জাতিতে চণ্ডাল হলেও বড় সৎ। দেব দ্বিজে তার অশেষ ভক্তি। সদুপায়ে যা দু-চার টাকা রোজগার হয়, তাতেই সে কোনরূপে আপনার দুটী ছেলে মেয়ে নিয়ে দিনাতিপাত করে।

দ্বিতীয় পর্ব্ব।

পরদিন প্রভাতে ঠাকুর মহাশয় গঙ্গার বেলটী লয়ে যথারীতি স্নানের জন্য গঙ্গাভিমুখে বেরিয়ে পড়লেন ও যথাসময়ে গঙ্গা তীরে উপস্থিত হলেন। প্রভাতের মৃদু মন্দ হাওয়া, প্রকৃতির উন্মুক্ত শোভা, বালসূর্য্যের মনোহর দৃশ্য, পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর কলকলনাদ একত্র এতগুলির সমাবেশ ব্রাহ্মণের প্রাণে যুগপৎ ভক্তি ও আনন্দ আনয়ন করিল। ব্রাহ্মণ নিয়মিতভাবে স্নান সমাপন করে গঙ্গাতীরে পূজা আহ্নিকে রত হলেন। বহুক্ষণ পরে কমণ্ডলুর উপরিস্থিত গঙ্গার আমটী তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তিনি অবজ্ঞাভরে বলতে লাগিলেন ও তুই এখানে আছিস। চণ্ডালের বেলও মাকে দিতে হবে আর মা কিনা তাই গ্রহণ করবেন। এই ভেবে তিনি বিনামন্ত্রে বিনা ভক্তিতে উপেক্ষাভরে বেলটী গঙ্গায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে চীৎকার করে বলে উঠলেন, এই নে মা! তোর প্রিয় চণ্ডাল ছেলের আম নে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য একি! ও কার দুটী রক্তপদ্ম হস্ত গঙ্গার জলের উপর শোভা পাইল? কার হাত দুখানি ফলটী গ্রহণ করিল?

প্রকৃত ব্যাপার বুঝতে তার দেরী হল না। তিনি মুহূর্ত্তের জন্য পাগলের মত হয়ে ভাবতে লাগলেন, আমার এত নিয়মনিষ্ঠা, বিধিনিষেধ এর কি কোন মূল্য নাই? মার এ সব ভাল লাগিল না। তিনি স্বহস্তে চণ্ডালের পূজা নিলেন।

এইরূপ ভাবতে ভাবতে অনেকক্ষণ কাঁদতে লাগলেন এবং মায়ের দর্শন ভিক্ষা করলেন। অবশেষে যখন মায়ের দেখা পেলেন না, তখন তিনি বলতে লাগলেন, "মা, দেখা যদি না দিলি, তবে এমন কিছু প্রমাণ দে, যাতে তোর চণ্ডাল ছেলে বিশ্বাস করে তুই স্বহস্তে তার পূজা গ্রহণ করেছিস।" তার কথা শেষ হতে না হতে গঙ্গার ক্ষুদ্র তরঙ্গমালা একটী সোণার বালা তার পায়ের কাছে এনে ফেল্লিল। ব্রাহ্মণ ব্যাপার দেখে অবাক্।

তৃতীয় পর্ব্ব।

সোণার বালা পেয়ে ব্রাহ্মণের বৈরাগ্য লোপ হল। ব্রাহ্মণ ভাবতে লাগলেন, এ বালা আমি পেয়েছি, এ আমার। আমি কেন ওটী চণ্ডালকে দিব? এর দ্বারা আমি ব্রাহ্মণীর গহনা ও পাকা বাড়ী তৈরী করব। এইরূপে পাঁচ সাত ভাবতে ভাবতে তিনি দ্রুতপদে বাড়ীতে ফিরিলেন ও দ্বারদেশ হতে অস্বাভাবিক ভাবে পত্নীকে ডাকিতে লাগিলেন। তার ব্যস্ততা লক্ষ্য করে হাতের কাজ ফেলে ব্রাহ্মণী তার কাছে এসে সমস্ত শুনলেন। এবার ব্রাহ্মণ আশা-উৎফুল্ল হৃদয়ে আপনার অঞ্চলের গাঁট খুলে ব্রাহ্মণীকে সুবর্ণ কঙ্কণ দেখাবেন। কিন্তু এ কি দৈবী মায়া! সুবর্ণ বালা লৌহ বালায় পরিণত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের কর্ম্মদোষে সুবর্ণ লৌহে পরিণত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের কথা ও কার্য্যে অমিলন দেখিয়া ব্রাহ্মণী তাহাকে উন্মাদ, বায়ুগ্রস্ত বলিয়া মিষ্টভাবে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। ব্যাপার দেখিয়া ব্রাহ্মণের চৈতন্য হইল। তিনি উক্ত বালাটী লইয়া চণ্ডালের কুটীরে উপস্থিত হইলেন ও গঙ্গাকে বলিতে লাগিলেন, দেখ গঙ্গা, মা স্বহস্তে তোমার ফলটী লইয়াছেন ও তোমাকে এই বালাটী প্রদান করিয়াছেন। চণ্ডালের অঙ্গ স্পর্শে লৌহ বালা সুবর্ণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। চণ্ডাল ব্রাহ্মণকে উহা প্রদান করিতে রাজী হইল। কিন্তু ব্রাহ্মণ তাহা লইল না। বলিল উহা আমার সহ্য হইবে না। চণ্ডালের নির্লোভ দেখিয়া ব্রাহ্মণের বৈরাগ্য উদিত হইল। তিনি গঙ্গাতীরের দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া যাইলেন ও ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। ব্যাপার কিছু বুঝিতে না পারিয়া চণ্ডালও তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। কিছুক্ষণ পরে চণ্ডাল ব্রাহ্মণ মুখে সকল কথা শুনিয়া বলিতে লাগিল, "এই নে তোর বালা, আমায় সোণার লোভে, মোহে আবদ্ধ করিস নে। আমায় দেখা দে ও তোর রাঙা চরণে স্থান দে।" চণ্ডালের অনাসক্তি দেখিয়া ব্রাহ্মণ তাহাকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিলেন।

অনন্তর ব্রাহ্মণ গৃহত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসগ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন ও গঙ্গাকে তাহার গৃহে সংবাদ প্রদানে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। গঙ্গা অতিশয় কাঁদিতে লাগিল এবং অনেক সান্ত্বনা দিয়া তাহাকে স্বধর্ম্মপালনপূর্ব্বক গৃহে অবস্থান করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল। গঙ্গার সৎপরামর্শে ব্রাহ্মণের চৈতন্য উদিত হইল। তিনি স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাস্থাপন করতঃ ধর্ম্মাচরণে রত হইলেন।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চৌধুরি।

কৃপার ভিখারী।

জগৎ মাঝারে কত ঘুরে ঘুরে
ভ্রমিনু তোমারি খোঁজে।
মানব সেবায় ক্ষীণ করি কায়
আর কত সৎ কাজে॥
তোমারে না পেনু ফলশূন্য হনু
বৃথাই কাটিল বেলা।
বুঝিতে না পারি স্বার্থ সেবা করি
করি শুধু অবহেলা॥
যেথায় গিয়েছি সেথায় হেরেছি
স্বার্থহীন কিছু নাই।
স্বার্থময় সব তুলে কলরব
"পাই নাই পাই নাই॥"
ভ্রম ভাঙ্গি আজ পড়ি' সত্য সাজ
তোমারে স্মরিছে দীন।
দাও গো ভকতি দাও গো মুকতি
তুমি যে গো স্বার্থহীন॥
আমি জানি বিভু তুমি যে গো কভু
নাহি চাহ প্রতিদান।
জ্ঞানী অজ্ঞানেরে চেতন হীনেরে
কর সদা কৃপা দান॥

ভেদাভেদ সুখে কেবা বল রাখে
তুমি বিনা গুণাকর।
নিঃস্বার্থ প্রেমেতে কে পারে ভিজাতে
সর্ব্বজন প্রেমাকর॥
জগাই মাধাই পেলে যদি ঠাঁই
পদধূলি তব নিয়ে।
রত্নাকর আদি তোমা পেলে যদি
'মরা মরা' শুধু কয়ে॥
তবে কেন আমি হৃদয়ের স্বামী
তোমায় পাই না বল।
হৃদয়েতে যদি তুমি গো অনাদি
দেখা নাহি কেন হ'ল॥
করুণা ভাণ্ডারী পারের কাণ্ডারী
পারে চল নিয়ে মোরে।
কৃপার ভিখারী কৃপা ভিক্ষা করি
কৃপা কর অধমেরে॥

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার ঘোষ।

তোমার প্রকৃত স্বরূপ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

হে মায়াধীশ মহামানব! তোমার প্রকৃত স্বরূপ, জন্মগত দিব্যস্বভাব কখনও ভুলিও না। সর্ব্বদা তাহার স্মরণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও উপলব্ধি কর। স্বরূপানুভূতি কিছু কঠিন ব্যাপার নহে। জীবন্মুক্তি লাভপক্ষে দেহধারণ, সাধন, অন্নপানাদি ভোগ ত্যাগ করিতে হইবে না কিন্তু ভোগের ত্যাগ চিন্তা বা সৌষ্ঠববিধানে আসক্তি রাখিবে না। যথাপ্রাপ্ত বিষয়ে সদানন্দে কালাতিপাত করিতে শিক্ষা কর। সুখদুঃখ, ভালমন্দ নিরপেক্ষ হইয়া সকল বিষয়ই উপভোগ কর। কিছুরই

কামনা করিও না, কিন্তু সকলই উপভোগ কর; তৃপ্তি আত্মাতে বিরাজমান; তৃপ্তি বহির্বিষয়ে বিরাজিত নহে। আত্মা আপনার অন্তরস্থ তৃপ্তি বহির্বিষয়ে আরোপিত করিয়া দীনের ন্যায় মনে করে, অমুক বস্তু আমাকে তৃপ্তিদান করিতেছে, প্রকৃত সত্য কিন্তু তাহার বিপরীত। ষড়্ বিকারস্বভাব অনাত্মদেহে আত্মভাব পরিত্যাগ কর। আত্মা অজর, অমর, অব্যয় জানিয়া শোকমোহের পরপারে চলিয়া যাও। আসক্তি ত্যাগ কর। আসক্তিহেতু অন্তরে কর্ত্তৃত্বাভিমান জন্মে। বাহ্য কর্ম্ম ত্যাগ করিলে কি হইবে? অন্তরে আসক্তি থাকিলে কর্ত্তৃত্বাভিমান আসিয়া স্বতঃই উপস্থিত হইবে। যাহার অন্তরে আসক্তি নাই, তিনি সর্ব্বকর্ম্ম করিয়াও কোন কর্ম্ম করেন না। মনের অজ্ঞানান্ধতাই এই বাসনার হেতু। ইহা সংসারভ্রম উৎপন্ন করিতেছে; ইহাই বন্ধ্যার স্বপ্নদৃষ্ট পুত্রবৎ অনাত্ম দেহাদিতে আত্মভ্রম জন্মাইতেছে। দৃঢ় সঙ্কল্প, কঠোর অধ্যবসায়, অবিরাম তত্ত্বচিন্তা দ্বারা এই সংসার বাসনার মূলোচ্ছেদ করা যাইতে পারে। হে মানব! শিষ্টজন পরম্পরাগত ধর্ম্মসঙ্গত কর্ম্মসমুদায় নিয়ত অনুষ্ঠান কর। এই কর্ম্ম ত্যাগ করি, এই কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য—এইরূপ বিচার মূঢ়গণের যুক্তি। জ্ঞানিগণ কিছুতেই চিত্ত প্রশান্তি নষ্ট করেন না। তাহারা সকল অবস্থায় সমচিত্ত। শান্তচিত্ত মহাত্মগণ শিষ্ট পরম্পরাগত কর্ম্ম সমুদায় যথারীতি সম্পন্ন করতঃ সর্ব্বসঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্ব্বক জীবন্মুক্ত সুষুপ্ত ব্যক্তির ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় আত্মা”রূপে বিরাজ করেন। কূর্ম্মের অঙ্গসমূহ যেমন বাহিরে প্রকাশ পাইয়া অল্প বিক্ষেপে সঙ্কুচিত হইয়া অন্তরে প্রবেশ করে, তদ্রূপ জ্ঞানপ্রভাবে যিনি বহির্বিষয়ে আসক্তি ত্যাগ করতঃ অন্তরাত্মায় নিমগ্ন হইয়াছেন, তিনিইত জীবন্মুক্ত, তিনি ত আদর্শ পুরুষ, তিনিই প্রকৃত স্বরূপে অবস্থিত। হে জীব! তুমি শিবস্বরূপ। বাসনায় আকৃষ্ট হইয়া তুমি তোমার প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃত হইয়াছ। সামান্য বাসনা বীজ হইতে এই সংসার কানন রচিত। অভ্যাস ও অজ্ঞানবশতঃ যদি এই বাসনা বীজ বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞানরূপ অগ্নি দ্বারা ইহাকে দগ্ধ করিয়া ফেল, যাহাতে ইহা আর অঙ্কুরিত না হয়। বাসনামুক্ত মন স্বচ্ছ সলিলে পদ্মপত্রের ন্যায়; সুখদুঃখ কোন বিষয়ে মগ্ন হয় না, উপরে ভাসিতে থাকে মাত্র। হে মানব! তুমি কৃত্রিম মোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্তচিত্ত এক শান্ত ব্রহ্মরূপ নির্ভয় নির্ব্বাণ, ও নির্বৃত্তি সম্পন্ন হও। (ক্রমশঃ)

কথা।

(দোঁহা)

কহতো তো বহুতো মিলা গহতা মিলান কোই।
সো কহতা বাজানে দে জো নাহি গহতা হোই ॥

বক্তা মিলে শত শত কার্য্যকর শ্রোতা মিলা ভার।
বিফল বচন তার কথা কাজে মিল নাহি যার ॥

এক এক নিরবারিয়া জো নিরগারি জায়।
দুই দুই মুখকো বোলনা ঘল তমাবা খায় ॥

চিন্তা করি কহ এক, বলিবার আছে যা' বিষয়।
বহু কষ্ট পায় সেই, দুই রূপ কথা যেই কয় ॥

মধুর বচম হৈঁ ঔষধী, কটুক বচন হৈঁ তীর।
শ্রবণ দ্বার হৈ সঞ্চরৈ শালৈ সকল শরীর ॥

মধুর বচন ওষধী সমান তীরসম কটু কথা।
শ্রবণ দ্বারেতে প্রবেশি শরীরে উপজয় ক্ষয়-ব্যথা ॥

জিহ্বা কো দৈ বন্ধনৈ বহু বোলনা নিবারি।
সো পরখ সোঁ সংগ করু গুরু মুখ শব্দ বিচারি ॥

বাচালতা পরিহরি করি সদা রসনা সংযম।
কর তত্ত্ব আলোচনা আর জ্ঞানী সাধুর সঙ্গম ॥

জাকী জিহ্বা বন্দ নহীঁ হৃদয়া নহীঁ সাঁচ।
তাকে সংগ না লাগিয়া ঘালৈ বটিয়া কাঁচ ॥

অসংযত জিহ্বা যার মন প্রাণ নহে সত্যময়।
করিও না সঙ্গ তার কুপথের সদা সেথা ভয় ॥

মুখকী মাঠী জে কহৈঁ হৃদয়া হৈঁ মতি আন।
কহ কবীর তেহি লেগে সোঁ রামো বড়ে সয়ান ॥

মন মুখ এক নয় চতুরতা হৃদে বর্ত্তমান।
কবীর কহেন রাম, তার চেয়ে আরো বুদ্ধিমান ॥

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

—(*)—

পুস্তক পরিচয়।

মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র—জিতেন্দ্রলাল বসু, এম, এ, বি, এল প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান, [illegible] পোঃ ও গ্রাম; [illegible] লাইব্রেরী ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ও [illegible] প্রধান পুস্তকালয়। মূল্য ১॥০ মাত্র।

পুস্তকটী প্রাচীন মহা কবিদ্বয়ের তুলনামূলক সমালোচনা। মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী অক্ষয় ভাবের প্রস্রবণ। যাহারা বিভিন্ন রসময় কবিতার মধ্য দিয়া তৎকালের সমাজতত্ত্ব, রাজনীতিতত্ত্ব, গার্হস্থ্য কথা প্রভৃতি যথাযথ বুঝিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা পুস্তকটী পাঠ করিলে বিশেষ সাহায্য লাভ করিবেন। উক্ত তত্ত্ব সকল আলোচ্য পুস্তকে সহজ সরল অথচ বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচিত ও বিশ্লিষ্ট হইয়াছে।

সংঘ ও বার্ত্তা।

১। তত্ত্বমসি মিশনের অবৈতনিক বিদ্যালয়ে সকল শ্রেণীর বালকগণকে শিক্ষা দেওয়া হয়। যাঁহারা উক্ত বিদ্যালয় সম্বন্ধে কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মিশন সম্পাদকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সবিশেষ অবগত হউন।

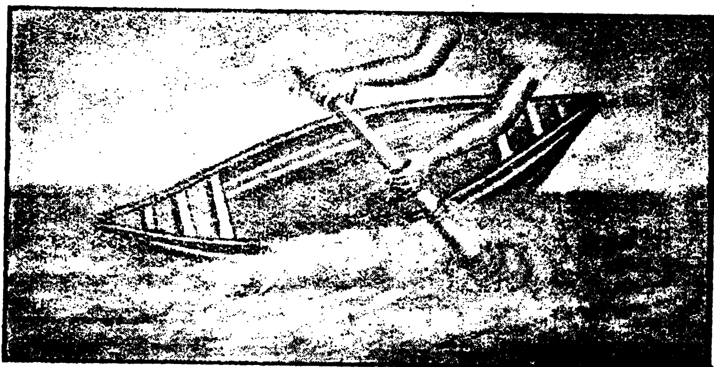
২। তত্ত্বমসি মিশনে সুযোগ্য চিকিৎসকগণের দ্বারা বিনামূল্যে চিকিৎসা করা ও ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

—০:*:০—

বিশ্বজনীন

ধর্ম্ম-নীতি-শিক্ষাসংস্কারাদি সম্বন্ধীয় বর্ত্তমান যুগোপযোগী

তত্ত্বমসি মঠের মুখপত্র



"সত্যমেব জয়তে নানৃতম্"



৩য় বর্ষ—৪র্থ সংখ্যা

শ্রাবণ, ১৩৩৯ সাল।

Viswajanin

The Organ of Tattwamasi Math.

সম্পাদক—স্বামী নির্ব্বাণানন্দ

বিশ্বজনীন কার্য্যালয়।

৩২।১ রাজা দিনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য ১৲ প্রতি সংখ্যা ./০

সূচীপত্র

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-
শ্রীচরণ ভরসা।

বিশ্বজনীন।

৩য় বর্ষ } ১৩৩৯ শ্রাবণ { ৪র্থ সংখ্যা

সামবেদ-সংহিতা।

ছন্দ আর্চ্চিকঃ। কৌথুমী শাখা। ঐন্দ্র পর্ব্ব। ২অ, ২প্র, ২প, ১খ, ১দ।

তদ্বো গায় সুতে সচা পুরুহূতায় সত্বনে।
শং যদ্গবে ন শাকিনে। ১ ॥

নমো নমো নারায়ণ! শুদ্ধসত্ত্ব শক্রভয়হারী।
কর কৃপা দীননাথ! লও পূজা যতিমনোহারী ॥
দুরন্ত প্রমত্ত মন! সত্যপথে কর আরোহণ।
সত্য ধর্ম্ম-মূলাধার, দেবতার হৃদয়রঞ্জন ॥

যস্তে নূনং শতক্রতবিন্দ্র দ্যুম্নিতমো মদঃ।
তেন নূনং মদে মদঃ ॥ ২।

জ্ঞানের নির্ঝর দেব! দীপ্ততম ঐশ্বর্য্যনিদান।
পরম আনন্দদাতা ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্বমান্ ॥
কৃপা কর কৃপানাথ! নাশি মোর মোহ অন্ধকার।
হৃদয় উদ্বুদ্ধ কর; দেবদেব! পূর্ণ সারাৎসার ॥

গাব উপ বদাবটে মহী যজ্ঞস্য রপ্সুদা।
উভা কর্ণা হিরণ্যয়া ॥ ৩।

শুভ কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি মুখ্যতম ঈশ্বরপ্রাপক।
জন্মজরা মৃত্যুধর্ম্মী পৃথিবীর আশ্রয় রক্ষক ॥
স্বর্ণ তুল্য লোভনীয় পরিত্রাতা ভবপারাবার।
প্রভুর মিলনপথে তোমাদের মহিমা অপার ॥

অরমশ্বায় গায়তি শ্রুতকক্ষারঙ্গবে।
অরমিন্দ্রস্য ধাম্নে ॥ ৪।

ত্রিমূর্ত্তি ঈশ্বর তুমি আমাদের ধ্যানের বিষয়।
ব্যক্ত রূপে রহিয়াছ চরাচর ওহে সর্ব্বময় ॥
অনাহত ধ্বনিরূপে আছ তুমি হৃদয়কন্দর।
জ্যোতিরূপে ধ্যান ধরে যতিগণ তোমা নিরন্তর ॥

ত্বমিন্দ্রং বাজয়ামসি মহে বৃত্রায় হন্তবে।
স বৃষা বৃষভো ভুবৎ ॥ ৫।

লও পূজা দীননাথ আমাদের ভক্তি উপহার।
করে দাও নাশ প্রভু হৃদয়ের অজ্ঞান আঁধার ॥
অভীষ্ট পুরাও নাথ ! নিত্যতৃপ্ত সদা কৃপাময়।
আশ্রিতে শরণ দাও ভয়হারী মঙ্গলনিলয় ॥

ত্বমিন্দ্র বলাদধি সহসো জাত ওজসঃ।
ত্বং সন্ বৃষন্ বৃষেদসি ॥ ৬।

রজস্তম পরপারে শুদ্ধ সত্ত্ব করিছে বিহার।
ব্রহ্মতেজ নির্ম্মলতা ঈশ্বরীয় গুণের আধার ॥
হে [illegible] অভীষ্টবর্ষী ! সত্ত্ব ভাব কর বরিষণ !
রজস্তমো হীন যারা ব্রহ্মতেজ করিছে শরণ ॥

যচ্চ ইন্দ্রমবর্দ্ধয়দ্ যদ্ভূমিং ব্যবর্ত্তয়ৎ।
চক্রাণ ওপশন্দিবি ॥ ৭ ।

অজ্ঞেয় অজ্ঞাত প্রভু আছ তুমি বিশ্ব চরাচর।
শুদ্ধসত্ত্ব ভাব যার, হও তুমি তাহার গোচর ॥
তোমার আনন্দহেতু সত্ত্বভাব শুভকর্মচয়।
নিয়ত সাধন করি, পাই যেন তোমা দয়াময় ॥

যদিন্দ্রাহং যথা ত্বমীশীয় বস্ব এক ইৎ।
স্তোতা মে গোসখা স্যাৎ ॥ ৮ ।

অজ্ঞান আঁধারে মগ্ন, যেই জন জানে না ভজন।
তোমা সম হয় সেও পায় যদি শ্রীগুরু শরণ ॥
ষড়ৈশ্বর্য্য শালী প্রভু! সীমাহীন ওহে নিষ্কারণ।
গুরু রূপে এস নাথ! ঘুচে যাক্ মোহের বন্ধন ॥

পণ্যং পণ্যমিৎ সোতার আ ধাবত মদ্যায়।
সোমং বীরায় শূরায় ॥ ৯ ।

স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের অধীশ্বর এক ভগবান্।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের অধিপতি সুর শৌর্য্যমান্ ॥
ইহকাল পরকাল ফলদাতা তুমি গো বিধাতা।
অন্তর্বাহ্য ধন দানে পূজি তোমা ওহে বিশ্বপিতা ॥

ইদং বসো সুতমন্ধঃ পিবা সু পূর্ণমুদরং।
অনাভয়িন ররিমা তে ॥ ১০ ।

অজর অমর তুমি নিখিলের আরামের স্থল।
ভক্তিরসামৃত দানে তোমা নাথ পূজিছে সকল ॥
অকিঞ্চন মোরা সবে, নাহি প্রভু অপর সম্বল।
ভক্তিসুধা পান কর, কর নাথ জীবন সফল ॥

বাণী

ওই যে ধূলিধূসরিতকায় কঙ্কালসার ক্ষুৎপিপাসাতুর শত শত প্রাণী হা অন্ন হা অন্ন রবে আর্ত্তনাদ করিতেছে, হে বন্ধু! তাহাদের রোদনধ্বনি কি তোমার ভোগবিলাস-জাত সুখনিদ্রার ব্যাঘাত উৎপাদন করে না? যাহারা সারাদিন প্রাণপাত পরিশ্রম স্বীকার করিয়াও গ্রাসাচ্ছাদনযোগ্য কদন্নও সংগ্রহ করিতে অক্ষম, তাহাদের দুরবস্থা, ম্লানবদন, কাতরোক্তি কি তোমার প্রাণে লেশমাত্র সহানুভূতির উদ্রেক করে না? বন্যা দুর্ভিক্ষ, মহামারী কুসংস্কার, অজ্ঞানতা, অসহযোগ, অবিদ্যাদির প্রকোপে মানবজাতি ধ্বংসের পিচ্ছিল পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে দেখিয়াও কি, তাহার প্রতিবিধানকল্পে তোমার সুপ্ত মানবত্ব কিছুতেই উদ্বুদ্ধ হয় না? হে মানব! তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ, তোমার উপাস্য উমানাথ, সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর, আদর্শ নারী জাতি, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী? তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ, তোমার জীবন ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে, ধীমান! তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ, ত্যাগই শান্তি, ত্যাগেই অমৃতত্ব লাভ, আমিত্বের প্রসারণে মুক্তি ও পরম পুরুষার্থ? তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ, তোমার ও তোমার পরিবার-বর্গের সুখ, শান্তি, শ্রীবৃদ্ধি প্রত্যেক জীবের অস্তিত্ব, সুখ, শান্তি ও শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত? তোমার চিন্তা ও কার্য্যাবলী কি তোমার উপর তাহাদিগের প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব বিস্তার করিবে না? তুমি কি আত্মকর্ম্মপাশে বদ্ধ হইবে না? হে বন্ধুবর! সম্মুখাগত বিপদকে সন্দর্শনপূর্ব্বক নয়ন মুদ্রিত করিলে, বিপদ্ কি তোমাকে দেখিতে পাইবে না? সাহস অবলম্বন কর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মলিন বাসনা বিসর্জ্জন করিয়া সদর্পে দণ্ডায়মান হও; আপনাকে বিশ্বের প্রতিনিধি জ্ঞান কর; বিশ্ববাসীকে আপনার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া জানিও। ধনী দরিদ্র, ইতর ভদ্র, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, সকলকে তোমার রক্ত, তোমার দেহ, তোমার আত্মা বলিয়া ভালবাস। দুর্ব্বলতা কাপুরুষতা, কলুষকামনা চিরতরে গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন কর। এখনও সময় আছে। কল্পনা ও বাক্‌চাতুরী পরিত্যাগ কর। কাজের সময় আসিয়াছে। কর্ত্তব্যে অবহেলা করিও না। রাজার মত স্বাধীনবুদ্ধি অবলম্বনে তোমার কার্য্য সকল অনাসক্তভাবে সম্পন্ন কর। বাহুর শক্তি ও হৃদয়ের ভক্তি সাহায্যে তোমার অভীষ্ট সাধন কর। প্রকৃতির মধ্যে তোমার বিশিষ্ট স্থান ও অধিকারের সার্থকতা সম্পাদন কর। শঙ্করের জ্ঞান ও বুদ্ধের হৃদয় তোমাকে সর্ব্বতোভাবে বিভূষিত করুক।

শ্রীবলাই চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীতুকারাম।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ভাম্বনাথ পর্ব্বত অতিশয় নিভৃত। এখানে লোকের কোন কোলাহল নাই; সংসারের আবিলতা এখানে প্রবেশ করে না। তুকারাম সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়া কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবানের আরাধনায় রত হইলেন। অবশ্য সংসারে তাহার সুখ ছিল না; তিনি সংসারে সুখের আশা ত্যাগ করিয়া সর্ব্বতোভাবে বৈষ্ণব-ফকিরের বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। সাতদিন সাতরাত্রি অনাহারে অবিশ্রামে তিনি ইষ্টদেবের আরাধনায় রত হইলেন। ফলে তাহার চিত্তে শান্তির উদয় হইল। যে হৃদয় সংসারানলে এতদিন দগ্ধ হইতেছিল, তাহা এক্ষণে শ্রীভগবানের করুণাস্পর্শে স্নিগ্ধ ও মধুর হইয়া পড়িল। তিনি প্রাণেশ্বরের দর্শনের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। এখন আর স্ত্রী পুত্রাদির চিন্তা তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে না। আত্মীয়-গণের লাঞ্ছনা, ব্যবসায়ের ক্ষতি—এ সকল কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইলেন। তাহার অন্তরে বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য, হরিনামকীর্ত্তনে আনন্দ, জীবে প্রেম প্রভৃতি দেবোচিত বৃত্তি সকল দেখা যাইতে লাগিল। এদিকে তাহার জন্য চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ চলিতে লাগিল। কেহ তাহাকে স্বগ্রামে বা তৎসন্নিহিত কোন প্রদেশে দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অন্বেষণক্রমে ভাম্বনাথ পর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও বহু চেষ্টার পর তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। তাহার কনিষ্ঠ ভাই কাহ্নাইয়া গৃহে ফিরিবার জন্য তাহাকে বারবার অনুরোধ করিলেন। কাহ্নাইয়া তাহাকে কয়েকটা কাগজ দেখাইয়া বলিলেন, "আমাদের পিতা লোককে যে সমস্ত ঋণ দিয়াছেন, তাহা লোকের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইলে, তোমার সমস্ত ঋণ শোধ হইয়া যাইবে অধিকন্তু কিছু উদ্বৃত্ত থাকিবে"। ভ্রাতার কথার উত্তরে তিনি বলিলেন, "ভাই, যখন এই সমস্ত ঋণ আদায় হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন এগুলি নদীগর্ভে নিক্ষেপ করাই শ্রেয়ঃ"। তাহার ভ্রাতা বলিলেন, "দাদা, তুমি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী; তোমার পক্ষে অর্থ বিনা দিন নির্ব্বাহ হইতে পারে কিন্তু আমার পক্ষে তাহা সম্ভবপর নয়"। তুকারাম কনিষ্ঠের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাহার ভ্রাতাকে তাহার প্রাপ্য অর্দ্ধাংশ প্রদান করিয়া আপনার হিসাবের কাগজগুলি ইন্দ্রায়ণীর জলে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন ও তাহার ভ্রাতাকে বলিলেন, "আজ

হইতে আমার ভাবনা ভাবিও না, এই পন্থা অবলম্বন করিয়া আমি শ্রীভগবানের নাম স্মরণকরতঃ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিব।” অগত্যা তাহার ভ্রাতা গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

কিছুকাল নির্জ্জনে ভাম্বনাথে বাসকরতঃ তুকারাম প্রকৃষ্ট চিত্তশুদ্ধি লাভ করিলেন। তিনি নিয়মমত ইন্দ্রিয়সংযম, ব্রত, উপবাস, ঈশ্বরারাধনায় দিনযাপন করিতে লাগিলেন। সারাদিন আত্মসংযম ও আত্মানুশীলনে অতিবাহিত করিয়া তিনি সন্ধ্যাকালে হরিগুণগান কীর্ত্তন করিতে করিতে বেঠোবার মন্দিরে দেবপ্রতিমা দর্শন করিতে আসিতেন। তাহাকে দেখিলে কেহ মহাভক্ত বলিয়া প্রশংসা করিতেন, কেহ বা ভণ্ড তপস্বী বলিয়া ঘৃণা করিতেন; লোকের ভালমন্দ উক্তিতে তাহার চিত্ত-প্রশান্তি কিছুতেই বিনষ্ট হইত না। তিনি আত্মভাবে বিভোর হইয়া হরি প্রেমসুধা পানে উন্মত্ত থাকিতেন। তিনি আপনার পথে যথেচ্ছা বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি তাহাদিগের প্রাচীন মন্দিরটী সংস্কার করিবার মনস্থ করিলেন। বহুকালব্যাপী সংস্কারাভাবে উহা বড়ই জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তিনি এখন ফকির; তিনি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, তাহা ব্যয়সাধ্য। তাহার একটী কপর্দ্দকও নাই তথাপি কিরূপে এই মহৎকার্য্য সাধন করিবেন? তিনি স্বয়ং শ্রমজীবীর ন্যায় মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিলেন। সৎকার্য্যে ও দেবসেবায় বিরত হওয়া ভক্তের স্বভাববিরুদ্ধ। সুতরাং তিনি আপনার শক্তি অনুসারে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন। তাহার সৎচেষ্টা ও শুভেচ্ছা দর্শন করিয়া কয়েকজন ভক্ত স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া তাহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। আত্মচেষ্টা ও বন্ধুবর্গের সহানুভূতিতে তাহার উদ্দেশ্য সফল হইল। দেবতার মন্দিরটী সংস্কৃত হইয়া গেল। এইবার তিনি নব অনুরাগে নিত্য নূতনভাবে দেবতার পূজা করিতে লাগিলেন। দেবমন্দির মার্জ্জন, পুষ্পচয়ন, বিঠ্ঠলের গুণকীর্ত্তন ও পদাবলী রচনা পূর্ব্বক তিনি দিনযাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রাচীন কবিগণের উপদেশ ও শাস্ত্রসমূহে অনভিজ্ঞতা হেতু তাহার প্রাণ পরিতৃপ্ত হইল না। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত, অধ্যাত্ম রামায়ণ, কবীরের পদাবলী প্রভৃতি বিশেষ যত্নের সহিত অনুশীলন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে শাস্ত্রে তাহার যথেষ্ট জ্ঞান জন্মিল। তিনি সর্ব্বত্র “ভক্ত” নামে পরিচিত হইলেন। (ক্রমশঃ)

"দেবতার পূজা"

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তরুণ শ্বশুরের অনুরোধে পুনরায় চাকুরীতে আসিয়া যোগদান করিল। কিন্তু সরকারের উপর তার যে ঘৃণা জন্মিয়াছিল তাহা আর দূরীভূত হইল না। সর্ব্বদাই তার একটা অস্বস্তি হইত, চাকুরী ভাল লাগিত না। মানুষের মনের এমনি একটা নিয়ম যতক্ষণ কোন ব্যক্তি কি বিষয়ে মানুষের অনুরাগ থাকে, ততক্ষণ শত অন্যায়ও যেন লঘু বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু যেই মুহূর্ত্তে মনে তদ্বিষয়ে একবার বিরক্তি জন্মে, তখন তার গুণও দোষ বলিয়া মনে হয়। এমন অনেক সময় দেখিয়াছি যতদিন সদ্ভাব ছিল একবন্ধু অন্যবন্ধুর নিন্দা শুনিলে চটিয়া উঠিতেন। কিছুদিন পর যখন বন্ধুত্ব ঘুচিয়া বৈরীতায় পরিণত হইল, তখন সেই বন্ধুই বন্ধুর নিন্দা করিতেছে; এমন কি, তার চরিত্রের গুণ শুনিলেও দোষযুক্ত মনে করিতেছে। অপরে প্রশংসা করিলেও প্রতিবাদ করিতেছে।

হায়রে মানুষের মন, এর কোথায় অনুরাগ কোথায় বিরাগ! কতটুকুতে যে এর অনুরাগ জন্মে আর কত সামান্য কারণেই যে বিরাগ উপস্থিত হয় ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। এত দুর্ব্বল মানুষ, আর ততোধিক দুর্ব্বল তার মন। তরুণ এমনই বিতৃষ্ণ হইয়া গেল যে পুলিশের নাম শুনিলেই তার ঘৃণা হইত। পুলিসের কর্ম্মচারীদের সঙ্গে সে কথাবার্ত্তা বন্ধ করিয়া দিল। সন্ধ্যার পর ক্লাবে যাওয়া, যা এতদিন তার নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য ছিল, তাও সে এখন ছাড়িয়া দিল। অবসর সময় বাসায় বসিয়া গ্রন্থাদি পাঠ করিত আর আপিসের সময় যেন মাহিনার দায়ে সে ছয়ঘণ্টা মজুরী করিয়া আসিত মাত্র। উপরওয়ালাদের সঙ্গে মেশাও সে ছাড়িয়া দিল। ফলে এই হইল সকলেই তরুণকে দাম্ভিক মনে করিয়া তার উপরে নারাজ রহিল, অন্যের চেয়ে তার খাটুনি বাড়িল, তার উপর অন্যের তত সহানুভূতি রহিল না, তার দোষই যেন অন্যের চক্ষে বেশী ধরা পড়িতে লাগিল। সেও ক্রমশঃ চাকুরী, ইংরাজ কর্ম্মচারী এমন কি ইংরাজ শাসনের উপর বিতৃষ্ণ হইয়া পড়িল।

অবসর বিনোদনের জন্য সে ধর্ম্মগ্রন্থ, ইতিহাস এবং কোন কোন চিন্তাশীল ভারত সেবকের লেখা পড়িতে আরম্ভ করিল। ৺রমেশ দত্তের Economic history of India পড়িয়া তাহার যেন নূতন চিন্তার ধারার সৃষ্টি হইল। মহাত্মা গান্ধী তিলক ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের লেখা পড়িয়া ক্রমে তার মনে স্বদেশপ্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ শাসন যন্ত্রের উপর তার মন আরও শ্রদ্ধাহীন হইল। যখন তাহার মনে হইত, সেও নিজে সেই শাসনেরই একটা যন্ত্রের কাজ করিতেছে, তখন সে নিজের উপরও বিরক্ত হইয়া উঠিত। সব সময়ই সে বলিত "ভাল লাগে না।" নীহার জিজ্ঞাসা করিত, "কেন ভাল লাগে না গো?" তরুণ বলিত, "কেন জানি না কিন্তু এটা বুঝি ভাল লাগে না; এর বেশী বুঝি না, তোমায় কি করে বুঝাব বল। তরুণের এ অস্বস্তিতে নীহারও দুঃখ অনুভব করিল। সে যে দিনরাত্রি স্বামীর একটুকু সুবিধা ও শান্তির জন্যই ব্যাকুল। সে কি করিবে যাতে তার স্বামীর প্রাণে একটু শান্তি আসে। প্রথমে সে ভাবিয়াছিল বিশ্রামে স্বামীর মনের পরিবর্ত্তন হইবে কিন্তু ছুটী নিয়াও তার কোন সুবিধা হইল না। এখন উপায় কি?

গেল আরো কিছুদিন। তখন মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলন সুরু হইয়াছে; গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা হইতেছে, সর্ব্বত্র স্বদেশীর প্রচার হইতেছে। দলে দলে উকিল ব্যবসা ত্যাগ করিতেছে, ছাত্র স্কুল ছাড়িতেছে, চাকুরীয়া চাকুরী ছাড়িতেছে। যেন নূতন এক ভাবের বন্যা! কেহ বুঝিয়া, কেহ দেখিয়া, কেহ শুনিয়া ঐ একভাবে বিভোর হইয়া আন্দোলনে যোগ দিতেছে। নিত্য সংবাদপত্র বোঝাই শুধু এই সব সংবাদে। তরুণের মনও ধীরে ধীরে ঐ দিকেই ঝুকিয়া পড়িল। তাহার মনে হইল এই যেন ঠিক, দেশের কাজ, স্বাধীনতার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ এই যেন বীরত্ব। ইতিমধ্যে একটা এমন ঘটনা ঘটিল যে তরুণ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। তাহারই কোর্টে একটি মামলা আসিল। রাস্তায় দাঁড়াইয়া স্বদেশী গান গাহিয়া লোককে উত্তেজিত করার অপরাধে পুলিস একটা ভদ্রযুবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। কোর্ট ইন্‌স্পেক্টার তরুণকে বুঝাইয়া দিলেন সে গানে এমন সব কথা আছে যে সাধারণ লোক তাহাতে উত্তেজিত হইয়া সরকারের শাসনকার্য্যে ব্যাঘাত উৎপাদন করিতে পারে; তাই এর জন্য শাস্তি হওয়া উচিত। সপক্ষের উকিল বলিলেন, এ তেমন কোন কথ নয় যাতে লোক উত্তেজিত হইতে পারে। তরুণ আসামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন

সে কি বলিতে চায়। অপরাধী বলিল, "আপনি কি বুঝিবেন আমি কি বলিতে চাই? ক্ষুৎপিপাসায় যে কাতর, তার আর্ত্তনাদ কি সুখীজন বুঝে? আপনি যে আসনে বসিয়া আছেন, তার সহায় সম্পদ সুবিধা অহঙ্কার এবং প্রতিবন্ধক এমন অদ্ভুত যে আমি আজ যে জায়গায় দাঁড়াইয়া আছি, তার এক কণাও বুঝিবার শক্তিও বুঝি আপনার নাই। আপনি মোটা মাহিনা পান, ইংরাজ কর্ম্মচারীর সঙ্গে চলেন, সর্ব্বত্র আপনার খাতির, আপনার স্ত্রী-পুত্রের সর্ব্ব বিষয়ে যথেষ্ট সুবিধা, আপনার জ্ঞান বুদ্ধি সব ঐ অবস্থার মতই কিন্তু আমার কথা স্বতন্ত্র। আমি দরিদ্র পিতার সন্তান। যা কিছু বিত্তসম্পত্তি ছিল সর্ব্বস্বান্ত হইয়া বি-এ পাশ করিয়াও চাকুরী পাই নাই, ব্যবসার অর্থ নাই, সুবিধাও নাই, চাষ বাস করিবার জমিও নাই। কাজেই পেটের চিন্তায় অস্থির। কাজেই ভাবিতেছি আমার এ অবস্থা কেন? অনেক ভাবিয়া বুঝিয়াছি, আমার জ্ঞান জাগতিক কোন কার্য্যেরই উপযুক্ত নয়, এক চাকুরী ছাড়া। তাতে ধারণা হইয়াছে সরকারের এরূপ জ্ঞান দেওয়া অনুচিত। অভাব এত বেশী, তার কারণ খুঁজিতে যাইয়া দেখি, বিদেশী বণিকের অত্যাচার। তার কারণ তার মূলেও সরকারের তৎপ্রতি সহানুভূতি। আমরা পরাধীন, আমাদের শিক্ষা জ্ঞান সব কিছুই এত হীন তার কারণ আমাদের পরাধীনতা। তাই মহাত্মাজীর শরণ লইয়াছি, আমাদের জীবন ত গিয়াছে, আর কেহ যেন এই ভুল পথে না চলে; অনেক অগ্রসর হওয়া গিয়াছে; এখন অন্ততঃ ফিরে চলা ভাল, তাই স্বাধীনতার জন্য সাধারণকে সে বিষয়ে বুঝাইবার জন্য রাস্তায় গাহিয়া বেড়াই। এতে আমার হয়ত লাভ নাই, তবে অন্ততঃ নিজের বিনিময়ে জাতির এতটুকু কল্যাণ হয়ত তাহাতে হইবে। আমরা এক মুঠা খাইতে পাইনা আর তারা আমাদেরই যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া সুখে বসিয়া আছে। এ যে অসহ্য—নিজেদের জীবনে নিত্য অভাব অশান্তি অক্ষমতা সহিয়া এ নিষ্ঠুর উপদেশই পাইয়াছি। আপনি ঐখানে বসিয়া এ হয়ত অন্যায়ই মনে করিবেন কিন্তু আমাদের অবস্থা অনুরূপ সে কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি।"

তরুণ বলিল, "কিন্তু আপনার একটা ভুল আছে। এ ভাবে বক্তৃতা দিয়া বা গান করিয়া না হয় লোককে উত্তেজিত করিলেন, তাহাতে একটা অশান্তির সৃষ্টি হইবে। ধরুন, একটা যুদ্ধ বিগ্রহই হইল, তাহাতে যদি ভারত স্বাধীনও হয়, তবে শান্তি সম্ভব কি? আমার ত মনে হয় এই উত্তেজনার ফলে সাধারণ লোক উন্মত্ত

হইয়া অশান্তিরই সৃষ্টি করিবে। আপনার প্রাণে যে ব্যথা তার কি শান্তি হইবে? এর চেয়ে সেবা, সৎশিক্ষার বন্দোবস্ত, বাণিজ্যে বিদেশীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা এ সব কাজ করুন না কেন, তাতে শান্তি এবং জীবন দুই রক্ষা হইবে।"

আসামী। "সে অর্থ কোথায় পাইব?"

তরুণ। "কেন আপনাদের যারা নেতা, যারা দেশের জন্য লক্ষ লোকের জেলের ব্যবস্থা করেছেন তারা ইচ্ছা করলে লক্ষ টাকা উঠিয়ে এসব ব্যবস্থা খুব করতে পারেন। আর এভাবে অগ্রসর হ'লে সরকারেরও সাধ্য নাই, আপনাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেন।"

আসামী। "আপনার কথা ভাববার মত বটে।"

তরুণ। "যার আছে সে ত্যাগ করুক, যার দশ ছেলে, সে এক ছেলে দিক, দেশের জন্যে জেল খাটতে। আপনি রাস্তায় চীৎকার করে জেলে যাবেন; আপনার স্ত্রী-পুত্রও না খেয়ে মরবে, তার কি প্রতিবিধান হ'বে এতে?

আসামী। "আচ্ছা আমি ভাববো।"

তরুণ। তবে বলুন আর এমনি জনসাধারণকে উত্তেজিত করবেন না, এবং যা করেছেন তার জন্যে মার্জ্জনা চান; আমি আপনাকে মুক্ত করে দিচ্ছি।

আসামী তরুণের কাছে একটা আশা করে নাই; কতকটা যেন তার প্রতি কৃতজ্ঞতায়ই সে ক্ষমা চাহিল। তরুণ তাহাকে খালাস করিয়া দিল।

আসামী খালাস হইল বটে কিন্তু তরুণের মন খালাস পাইল না। তার মনে যে আগুন জ্বলিতেছিল এতে আরো নূতন ইন্ধনের ব্যবস্থা করিল মাত্র। আসামীর এক একটা কথা মনে পড়িতেছিল আর সে ভাবিতেছিল এরা শাসনের নামে দুর্ব্বল জাতিটাকে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে। হয়ত এ এদের দুর্ব্বলতা। কিন্তু দুর্ব্বলের দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়া জগতে অন্যায় করা কি পাপ নয়? উভয়েই দোষী। না, বিচার আসনে বসিয়া এমন একটা অবিচারের প্রতি সম্মান করিতে পারে না সে। হয়ত এতে তার ক্ষতি হইবে, ভিক্ষাও ভবিষ্যতে তার অদৃষ্টে না জুটিতে পারে কিন্তু বিবেক আর এ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে দিতেছে না।

সহসা একদিন একখানা চাকুরী ত্যাগের আবেদনপত্র নিয়া সে ম্যাজিষ্ট্রেটের কুটিতে উপস্থিত। তিনি একজন বৃদ্ধ সিভিলিয়ন; তরুণের ইতিপূর্ব্বের সব ঘটনা তিনি জানিতেন না—মাত্র নূতন সেখানে আসিয়াছেন। তিনি তরুণের চিঠি

পড়িয়া অবাক্ হইলেন। তিনি বাঙ্গালী চরিত্র জানিতেন; নিত্য কত লোক এই চাকুরির উমেদারীর জন্য তার পায়ে পর্য্যন্ত পড়ে। এমনি চাকুরীপ্রিয় বাঙ্গালী শত অপমান সহিয়াও ঐ একমুঠো অন্নের দায় বড়সাহেবের দুয়ারে ধন্না দেয়; এদের তিনি জানিতেন। বড় বড় বিলাতী কোম্পানীতে কাজ শিখিবার, সুবিধা করিয়া দিবার বন্দোবস্ত করিবেন বলিয়া ত এ চাকুরীর মোহ হইতে অনেককে ফিরাইতে পারেন নাই। তিনি তাই তরুণের এ ব্যবহারে স্তম্ভিত হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছে তোমার" ?

তরুণ। "চাকুরী ভাল লাগে না।"

সাহেব। "শরীর ভাল না থাকে ছুটী লও, যত ছুটী চাও আমি দোব। কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে ঘুরে এস যাও।"

তরুণ। "শরীর ভালই আছে কিন্তু চাকুরীতে প্রবৃত্তি নাই।"

(ক্রমশঃ)

ডাঃ অমলেন্দু কুমার সেন।

এম, ডি (হোমিও) এ,ফ, আর, এইচ, এস্, ইউ, এন্, এ।

তোমার প্রকৃত স্বরূপ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

হে পূর্ণকাম নরদেবতা! তুমি নিঃসংশয় হইয়া স্ব স্বরূপে অবস্থিত হও। তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে রাগাদি চিত্তবৃত্তিসমূহ পরিহারপূর্ব্বক চিত্তপ্রশান্তি লাভ কর। তোমার চিত্ত সত্ত্বে পরিণত হউক। ঐ সত্ত্ব অবস্থাতে যাহা ব্যবহারদশায় সর্ব্বময় হইলেও তত্ত্ববিচারে সর্ব্বরহিত সেই প্রত্যক্ চৈতন্যপদই ব্রহ্ম। উহাই তোমার প্রকৃত স্বরূপ। ভূতল হইতে আকাশে পক্ষী উড্ডীন হইলে উহা যেমন আর দৃষ্টিগোচর হয় না, তদ্রূপ ভ্রান্তস্বরূপ মানব আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারে না। লোকে যেমন পরমাণুকে দেখিতে পায় না, তদ্রূপ শুদ্ধ সত্ত্ব ব্যতীত কেহ আত্মার দর্শনলাভ করিতে সক্ষম হয় না। যে ব্রহ্মপদ লাভ হইলে দৃশ্য জগজ্জাল অন্তর্হিত হয়, সেখানে তুচ্ছ

ভোগসুখ কামনা কিরূপে প্রকাশ পাইতে পারে? আগ্নেয় গিরিতে যেমন হিমের লেশ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে না, তদ্রূপ ব্রহ্মভাবে তন্ময় শুদ্ধসত্ত্বে অবিদ্যা মোহ বা জগজ্জালপ্রসূতি চিত্ততাই বা কোথায়? হে বোধাত্মন্! তুমি অন্তরে পূর্ণাত্মা সন্দর্শনকরতঃ নিবৃত্তিলক্ষণ মন্ত্রযুক্তি সহায়ে বিষয়বিষ-বিসূচিকাস্বরূপ প্রবৃত্তিহেতু অন্তঃকরণ হইতে বাসনারাজি পরিহারপূর্ব্বক সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হও, ভয়বিচ্যুত হও এবং সকল অনর্থের বহির্ভূত "ব্রহ্মাত্মা" হইয়া অকুতোভয়ে বিরাজ কর। যিনি সকল বস্তুর আধার, যাহা হইতে সর্ব্ববস্তু উৎপন্ন, সংহারকালে যাঁহাতে সর্ব্ববস্তু লীন হয়, তাহাই তোমার প্রকৃত স্বরূপ। সর্ব্ববস্তুর অন্তর্গত বলিয়া তিনি নিকটে এবং সর্ব্ববস্তুর বহির্ভাগে বলিয়া তিনি দূরেও বিরাজমান। তিনি নিকটে ও দূরে সমভাবে বিরাজমান। তিনি সর্ব্বব্যাপী হইয়াও সকল বস্তুতে জ্যাতিরূপে বর্ত্তমান। অতএব সকলই সেই আত্মা; অন্য কিছু নহে। তৎসত্তায় তোমার সত্তা; অতএব কি পরিচ্ছিন্ন কি অপরিচ্ছিন্নভাবে সর্ব্বথা তুমি সেই আত্মা ও তাঁহাতে বর্ত্তমান রহিয়াছ।

বিবেকিগণ জগতে দুইপ্রকার চিত্ত অনুভব করেন। একচিত্ত—চিত্তবৃত্তি প্রতিবিম্বিত চেত্য অর্থের প্রকাশ; উহা চিত্তনির্ম্মিত এবং অপর চিত্ত, চিত্তবৃত্তি ও তদ্বিষয়ক আবির্ভাব তিরোভাবাদি সর্ব্ববিষয়ের সাক্ষী, বা সংবিৎস্বরূপ। উহা নিত্যসিদ্ধ। এই নিত্যসিদ্ধ সম্বিৎ চেত্যমুক্ত। উহাই শান্ত, শিব, পরম পদ ও মানবের প্রকৃত স্বরূপ। যিনি সম্বিৎকে জানিয়াছেন, সেই মহাত্মাই ব্রহ্মময় হইতে পারিয়াছেন। তিনি সুষুপ্তবুদ্ধি সহায়ে ভাবনায় অদ্বৈতপদে আরোহণ করিয়াছেন। আদর্শে পতিত মানব যেমন রাগদ্বেষাদির পাত্র হয় না, ঐ আদর্শ পুরুষও তদ্রূপ মানাপমানাদি হেতু কখনই সুখদুঃখের ভাজন হন না। যেমন দর্পণে লোকের ক্রিয়া প্রতিবিম্বিত হইলেও তাহাতে দর্পণের পরিবর্ত্তন ঘটে না, সেইরূপ চিন্মণি দর্পণে জাগতিক ব্যাপার প্রতিবিম্বগত হইলেও মানবের প্রকৃত স্বরূপের কোন বিকার ঘটে না। রক্তজবার সন্নিধানবশতঃ স্বচ্ছ স্ফটিককেও যেমন লোহিত বর্ণ দেখায়, তদ্রূপ আত্মায় এই জগৎ প্রতিবিম্বিত হইতেছে। কিন্তু তাহাতে তাহার অণুমাত্র ভেদ বা বিপর্য্যয় ঘটে নাই। এ জগতে একত্ব নাই, দ্বিত্ব নাই। এই নিখিল বৈচিত্র্যময় চেষ্টা সমস্তই চিন্ময়। ঐ "চিৎ" স্বয়ং স্বীয় চিৎস্বরূপেই বিবর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ঐ "চিৎ"এর পরিস্পন্দন বা বিবর্ত্তই সংসার। চিত্তের স্পন্দন নিবৃত্ত হইলে সংসারের

নিবৃত্তি হয়। তখনই জীবের পরিচ্ছিন্ন অংশভাব বিলীন হইয়া ভূমানন্দময় তাহার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পায়। চিত্তের অবোধ অর্থাৎ অজ্ঞানই সংসার। চিত্তের বোধোদয়ে ভোগবাসনায় ক্ষয় হইলে শুদ্ধচিত্তে আত্মস্বরূপ উপলব্ধি হয়। হে মানব! এই দৃশ্য জগৎপরিদর্শনরূপ দীর্ঘস্বপ্নে আত্মচঞ্চলতাদি ভ্রমরূপ মোহে অভিভূত না হইয়া তোমার শুদ্ধ, বুদ্ধ অপাপবিদ্ধ প্রকৃত স্বরূপের নিয়ত অনুধ্যান কর।

(ক্রমশঃ)

দেব-মানব

সান্ধ্য গগনে তারকাপুঞ্জ উদিত হতেছে সবে এই,
মলয় পবন বীজন করিছে সুধাংশু আজি গগনে নেই।
অন্ধকারের অবগুণ্ঠন, বসুধা এখনো দেয়নি টেনে
নিশাচর যত আসে নাই, এখনো আহার অন্বেষণে।

পরিশ্রান্ত সাহসী নাবিক মধুরস্বরে গাহিয়ে গান,
স্বচ্ছ সলিলা গঙ্গা বক্ষে বেয়ে যায় তার তরণী খান।
অদূরে তার বাড়ী দেখা যায়, হৃদয়ে বহে হর্ষ বান
জ্বলছে ঐ পর্ণ কুটীরে আশার প্রদীপ হইয়া ম্লান।

ধূ ধূ রবে চিতার আগুন উঠে দেখায় ভীষণাকার,
বিধবা ঐ ডুবিয়া মরে শবদাহ বাছার হচ্ছে যার।
ঝম্প প্রদানে ভাঙ্গিয়া ফেলিল শান্ত গঙ্গার নিস্তব্ধতা
উচ্চ স্বরে নাবিক কয়, "করিলে কিগো করিলে কি মাতা।"

উদ্ধারার্থে তখনিই নাবিক ঝাঁপ দিল ঐ গঙ্গাজলে ।
শূন্য নৌকা দাঁড়াইয়া রয়, সন্ধান কই কারো না মিলে।
সজ্ঞাবিহীন বিধবা বালায় উঠাইয়া ক্ষণেক পরে
তুলিয়া একাকী তড়িতে ছুটালো, নৌকা আপন ঘরে ।

তীরে তরী লাগে উঠাইয়া তাঁরে লইল নাবিক কোলে
গৃহে লয়ে যায় কত শুশ্রূষায় ; পাগলিনীপ্রায় বলে—
"যম কি আমায় ভুলে গেলি হায়, পাঁচু কি এলিরে ফিরে
অন্ধের যষ্ঠি কোথা গেলে বাপ বজ্রাঘাত হলো না শিরে ।"

ফুকারিয়া কয় "পাঁচু বিনা হায় কেবা খেতে দেবে মোরে"
সদ্যপুত্রহারা তাই বুঝি হেন বুঝিল নাবিক পরে ।
কহিছে নাবিক " ভয় নাই গো মা আজ হতে আমি লব,
তব সেবা ভার যাহা কিছু আর ; আমিই সন্তান তব ।

দয়াল নাবিক ধন্য হে তুমি ! ধন্য তোমার প্রাণ ,
পরের মায়েরে আপন ভাবিয়ে করেছ আত্মদান ।
সন্তানের মত জননী কহিয়ে বিধবার নিলে ভার ,
মানব আকারে দেবতা তুমি যে নমি তোমা বারবার ।

শ্রীতারকনাথ দেব ।

—০ঃ(*)ঃ০—



সকলই সম্ভব।

"সকলই তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি"। তাঁর ইচ্ছায় সকলই সম্ভব। তাঁর ইচ্ছায় বিশ্ব চালিত হয়। আমাদের ক্ষুদ্র ইচ্ছা যখন তাঁর ইচ্ছার অধীন হয়, তখনই উহা শ্রেয়োলাভে কৃতকৃতার্থ হয়। আর যখন উহা পরমেশ্বরের ইতি খুজিতে ব্যস্ত হয়, তখন সে একুল ওকুল দুকুলহারা তরণীর মত উত্তাল তরঙ্গবিক্ষোভিত সমুদ্রের মধ্যে যেন পড়িয়া যায়। দুটী নৌকায় পা রাখিলে যেমন নৌকারোহীর বিপদের সম্ভাবনাই অধিক, তদ্রূপ এ ক্ষুদ্র বুদ্ধি যখন তাঁর ইচ্ছার কারণ খুঁজিতে ব্যস্ত হয়, তখন সে আপনাকে হারাইয়া ফেলে। লবণ পুত্তলিকা সমুদ্রের পরিমাণ করিতে যাইলে যেমন উহা সমুদ্রের জলে গলিয়া ও মিশিয়া যায়, এ ক্ষুদ্র বুদ্ধিও তাঁর বিষয় সামান্য পরিমাণে বুঝিতে গিয়াও স্তম্ভিত হইয়া যায়। আমাদের বুদ্ধি, স্মৃতি, শক্তি সকলই তাঁর দান। তাঁর দানে গর্ব্বিত হয়ে বড় হয়ে তাঁকে ভুলে যাওয়া নীচতার পরিচায়ক। আমাদের উচিত তাঁর জিনিষ দিয়ে তাঁকেই পূজা করা, তাঁর উপর নির্ভর করা, তাঁর আশ্রয় লওয়া। নিয়ম জীবের জন্য। তাঁর আবার নিয়ম কি? তাঁর আবার 'ইতি' কোথায়? তিনি কর্ম্মফল বিধাতা; জীবকে স্ব স্ব কর্ম্মানুযায়ী ফল দেন। আবার তিনিই কপালমোচন। জীবের কর্ম্মফল তিনি মুছিয়া দেন। সে তাঁর ইচ্ছা, তাঁর কৃপা, তাঁর মহিমা; সে কথা কে প্রশ্ন করিবে? তিনি নিয়মকর্ত্তা ও নিয়মের অতীত। তিনি প্রকৃতির অধীশ্বর। যাহা সম্ভব, তাহা তিনি করেন। যাহা অসম্ভব তাহাও তিনি করেন। তিনি অঘটনঘটনপটু। তাঁর ইচ্ছায় এক ডালে লাল সাদা দুই রকম ফুল ফোটে। তাঁর ইচ্ছায় নর বানরে রাক্ষস মারে, তাঁর ইচ্ছায় জলে শিলা ভাসে, সমুদ্রের উপর সেতু নির্ম্মিত হয়, সাগর পর্ব্বত হয়, পর্ব্বত সাগর হয়, মরুমাঝে মরূদ্যান রচিত হয়। তাঁহার ইচ্ছায় অন্ধ চক্ষু পায়, মূক বাচাল হয়, পঙ্গু গিরি উল্লঙ্ঘন করে, সূর্য্যচন্দ্র কিরণ দেয়, বায়ু প্রবাহিত হয়, যম স্বকার্য্যে ধাবিত হয়। তাঁরই ইচ্ছায় পাষাণী মানবী হইল, দ্রৌপদীর বস্ত্র অনন্ত হইল, যমালয় হইতে নচিকেতা ও সত্যবান প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তাঁহার ইচ্ছায় সকলই সম্ভব। জীবের মুক্তির কারণ তিনি। তিনি সর্ব্বময়। বেদ

বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র সকলই তিনি। তিনি এক হইয়াও বহু হইয়াছেন। সর্ব্বত্রই তাঁহার মহিমা কীর্ত্তিত হইতেছে। তিনি পতিতপাবন। তিনি সকলের ঈশ্বর; তাঁহার কোন ঈশ্বর নাই। তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহাকে মুক্তিদান করেন। তিনি কল্পতরু। আমরা তাঁর কৃপার ভিখারী। সতত তাঁর নাম গাহিব, সতত তাঁর রূপ ধ্যান করিব, সতত তাঁর শরণ লইব, সর্ব্ব কর্ম্মফল তাঁহাতে অর্পণ করিব। তিনি আমাদের সর্ব্বস্ব। তাই ভক্তগণ গাহিয়াছেন:—

তুমি হে সর্ব্বস্ব আমার; প্রাণারাম সারাৎসার।
নাহি তোমা বিনে কেহ ত্রিভুবনে বলিবার আপনার॥

ঈশ্বর নিয়মকর্ত্তা, তিনি জীবের কর্ম্মানুযায়ী তাহাকে ভাল মন্দ ফল প্রদান করেন সত্য কিন্তু তিনি ইচ্ছা করিলে আবার জীবের কর্ম্মফল বিনষ্ট করিয়া দিতে পারেন। সে তাঁহার ইচ্ছা। অনুমতিপত্র বিনা বা সুপারিশ বিনা কেহ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারে না কিন্তু রাজা ইচ্ছা করিলে তাহার যে কোন দীনহীন অবস্থাপন্ন প্রজার কুটীরে আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন। ইহা তাহার ব্যক্তিগত বিশেষ স্বতন্ত্রত্ব। ঈশ্বরের চৈতন্যশক্তির অন্ত পাওয়া যায় না। তাঁহার ষোল কলার একাংশে এই বিশ্ব অবস্থিত। তাঁহার সামান্য ইচ্ছার উপর এ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় নির্ভর করিতেছে। দেব-ঋষিগণ যাঁহার মহিমার সামান্য অংশ বুঝিতে পারেন না, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মানবমন তাঁহাকে কিরূপে বুঝিবে? তিনি যাহাকে যেমন বুঝাইয়া দেন, সে তদনুরূপ বুঝিয়া থাকে। স্থূল প্রকৃতির, জড়বস্তুর অনুশীলন করিলে কত আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার দৃষ্টিগোচর হয়। একই জল কখন বাষ্পীয়, কখন তরল, কখন কঠিন আকার ধারণ করিতেছে। যে জল অগ্নির অরিস্বরূপ, সেই জল হইতে আবার বাড়বাগ্নির উৎপত্তি। এই মনুষ্যদেহে ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চতত্ত্ব কিরূপে একত্র অধিষ্ঠান করিতেছে? এ সব তাঁরই ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা, সকল ইচ্ছার মূলে নিহিত আছে বলিয়া ব্যক্তি বা জন্তুবিশেষের ইচ্ছা। মোহান্ধ জীব তাহা বুঝিতে পারে না। যিনি জ্ঞানী, তিনি তাঁর ইচ্ছার অধীন হন ও বলেন তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক, আমার হৃদয় মাঝে।

স্বামী সদ্ভাবানন্দ।

অক্রূর সংবাদ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কুব্জার উক্তিঃ—

গীত

ওহে সুন্দর !
অনুপম কিবা রূপ মনোহর ॥
ছিল আঁধার হৃদয় অলসে,
তোমার পরশে হাসিল হরষে,
আমার হৃদয় কন্দর ॥
(তুমি) ধন্য করিলে আমারে,
(আমি) কি দিয়ে পূজিব তোমারে,
মম মনে হয়, তুমি বিশ্বময়
তব রূপে ভরা অম্বর ॥
তোমার মধুর মাধুরী ধারা
শীতল করিল জীবন আমার,
আমি হইনু আপনহারা ।
আমার সুপ্ত স্মৃতি উঠিল জাগিয়া
লুপ্ত জ্ঞান উঠিল ফুটিয়া,
তব রূপ কণা হৃদয়ে ধরিয়া
আমার পুলকে ভরিল অন্তর ॥
তোমার অপার মহিমা হেরিয়া
সতীশের প্রাণ গিয়াছে গলিয়া
নিজ গুণে নাথ করুণা করিয়া
আমায় রাখ পদে নিরন্তর ॥

(বর্ণনা)

কুব্জার কাতর বাণী করিয়া শ্রবণ।
মধুর বচনে হরি বলিল তখন॥
শুন ধনী সুবদনী সময় হইলে।
তোমার এরূপ আমি দেখাব সকলে॥
নিজ গৃহে যাও এবে আনন্দিত মনে।
নয়ন মুদিলে দেখা পাবে হৃদাসনে॥
কুব্জারে কৃতার্থ করি দয়াময় হরি।
চলিলেন এইবার হয়ে কংস অরি॥
প্রাসাদ সম্মুখে গিয়া দেখেন নয়নে।
মল্লগণ দাঁড়াইয়া আছে হস্তী সনে॥
হস্তী আর মল্লগণে দেখিয়া নয়নে।
রাম কৃষ্ণ দুই জনে হাসে মনে মনে॥
রাজহস্তী মাহুতের ইঙ্গিত পাইয়া।
কৃষ্ণকে ধরিল তার শুণ্ডে জড়াইয়া॥
হস্তীর শুণ্ডেতে কৃষ্ণ আবদ্ধ হইয়া।
হাসিতে লাগিল যেন কৌতুক ভাবিয়া॥
"কুবলয় পীড়" হস্তী পর্ব্বত আকার।
রাজার প্রধান হস্তী মহা বলাধার॥
শুণ্ডেতে ধরিয়া কৃষ্ণে উর্দ্ধে তুলে ধরে।
দেখি তাহা গোপগণ কাঁপিল অন্তরে॥
মথুরার নরনারী করে হাহাকার।
ভাবে মনে কৃষ্ণ বুঝি গেল এইবার॥
কিন্তু হায় লীলাময় দেখাইতে লীলা।
আপন ইচ্ছায় কত খেলিছেন খেলা॥

হস্তিশুণ্ড হতে নিজ দেহ মুক্ত করি।
বাহুবলে দুই হস্তে হস্তী শুণ্ড ধরি॥
তৃণ সম ঘুরাইতে লাগিল তাহারে।
দেখিয়া বিস্ময় সবে মানিল অন্তরে॥
ধন্য ধন্য করি সবে কৃষ্ণগুণ গায়।
পুষ্পবৃষ্টি করে সবে কৃষ্ণের মাথায়॥
কৃষ্ণের এ মহাশক্তি দেখিয়া নয়নে।
মল্লগণ ভাবে এরে বধিব কেমনে॥
অনায়াসে "কুবলয়ে" বধে যেই জন।
কেমনে করিব মোরা তার সনে রণ॥
এই চিন্তা মল্লগণ মনে মনে করে।
মুখে কিন্তু আস্ফালন করিতে না ছাড়ে॥
কুবলয়পীড় বধি হাসিতে হাসিতে।
কৃষ্ণ যবে যায় কংসপুরী প্রবেশিতে॥
'চানুর' 'মুষ্টিক' 'শেল' যত মল্লগণ।
রাম কৃষ্ণে আসি তবে করে আক্রমণ॥
তখন চাহিল কৃষ্ণ বলরাম পানে।
রাম বলে মুক্ত কর বদ্ধ জীবগণে॥
ভীষণ দুর্দ্দান্ত সেই কংসমল্লগণ।
ভাবিছে কেমনে কৃষ্ণে করিবে নিধন॥
কিন্তু হায় রাম কৃষ্ণ ধরি মল্লগণে।
পিপীলিকা সম বধ করিল জীবনে॥
কংস যজ্ঞাগারে পরে প্রবেশ করিয়া।
খণ্ড করি যজ্ঞধনু ফেলিল ভাঙ্গিয়া॥
কংসের সভায় কৃষ্ণ যবে প্রবেশিল।
যে যাহার নিজ ভাবে দেখিতে লাগিল॥

বৃদ্ধারা দেখিল চক্ষে ননীর গোপাল।
কেহ বা দেখিল চক্ষে নন্দের দুলাল॥
যুবতীরা দেখে কৃষ্ণ নবীন সাগর।
ভক্তগণ দেখে কৃষ্ণ দয়ার সাগর॥
বন্দিগণ হেরে কৃষ্ণ পতিত প্যাবন।
বীরগণ হেরে কৃষ্ণ দুর্দ্দমদ ভীষণ॥
কংস দেখে কালরূপ সাক্ষাৎ শমন।
ঋষিগণ দেখে কৃষ্ণ পূর্ণ সনাতন॥
যে ভাব লইয়া মনে, যে যেখানে ছিল।
ভাবময়ে সেই ভাবে দেখিতে লাগিল॥
তখন কংসের চর যে যেখানে ছিল।
কৃষ্ণের ভয়েতে সবে কাঁপিতে লাগিল॥
কেহ বা জীবন লয়ে ছুটিয়া পলায়।
কেহ বলে আর কোন না দেখি উপায়॥
এইবার মথুরার সব ফুরাইল।
কংস বুঝি এইবার প্রাণেতে মরিল॥
দেখিয়া কৃষ্ণের কার্য্য কংস ভাবে মনে।
এত শক্তি গোপশিশু পাইল কেমনে॥
কংসের ভীষণ ক্রোধ হইল তখন।
মার মার শব্দ করি কাঁপায় ভুবন॥
মুক্ত অসি লয়ে কৃষ্ণে বধিবারে যায়।
তখন ধরিল কৃষ্ণ তাহার গলায়॥
জ্ঞানহারা হয়ে কংস ভূতলে পড়িল।
ত্রিভুবন কৃষ্ণময় দেখিতে লাগিল॥
জীবনে মরণে কংস কৃষ্ণচিন্তা করি।
চলিল বৈকুণ্ঠধামে দেহ পরিহরি॥

কংসের সুকৃতি বল কে বুঝাতে পারে ।
আপনি আসিল হরি বধিতে যাহারে ॥
কংসবধ লীলা খেলা দেখাইয়া সবে ।
জনক জননী কাছে যায় কৃষ্ণ তবে ॥
কোথা মা বলিয়া কৃষ্ণ যায় কারাগারে ।
শুনিয়া কৃষ্ণের বাণী প্রফুল্ল অন্তরে ॥
দৈবকী কাঁদিয়া বলে আয় যাদুমণি ।
আয়রে হৃদয়ে আয় নয়নের মণি ॥
কেমনে ছিলিরে বাপ মোদের ভুলিয়া ।
তোমার আশায় মোরা রয়েছি বাঁচিয়া ॥
বসুদেব বলে আয় জীবনের ধন
আয়রে হৃদয়ে আয় অন্ধের নয়ন ॥
এই বলি বাম কৃষ্ণে দোঁহারে ডাকিয়া ।
আনন্দে করিল কোলে সকলি ভুলিয়া ॥

—০ঃ(*)ঃ০—　　　　(ক্রমশঃ)

সংস্কার

বিনা সংস্কারে কোন কার্য্য হয় না। পণ্ডিত বিদ্যা অর্জ্জন করেন তাহাও সংস্কারে, জ্ঞানী জ্ঞান অর্জ্জন করেন তাহাও সংস্কারে; মোট কথা, দেখা যায় যে বিনা সংস্কারে কোন কার্য্য হয় না। সংস্কার এক দিনের জিনিষ নয়; ইহা প্রত্যেক মানুষের জন্ম জন্মান্তরের। মানুষ যেরূপ কর্ম্ম করেন, সেই অনুযায়ী তাহার সংস্কার পরিণত হয়। এইজন্য যাঁহারা যেরূপ কর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য করেন, তাঁহারা সেই রূপ ভাবের হন।

ব্রহ্মচারী নির্ম্মল চৈতন্য।
শ্রীরামকৃষ্ণ-বেদান্ত সমিতি।

ভারতের জাতীয় জীবন।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তৎকালে সত্ত্বপ্রধান বীতরাগ ঋষিগণ সমাজের শ্রেষ্ঠপদ অধিকার করিতেন। তাহারা সংসারের কল্যাণের জন্য সৎ কামনা ও কার্য্যের দ্বারা সময়াতিবাহিত করিতেন। ত্যাগ, তপস্যা, তিতিক্ষা, ব্রত, সংযম, নিয়মপালন ইত্যাদি দেবোচিত গুণরাজি স্বীয় জীবনে প্রতিপালনপূর্ব্বক ও তাহাদিগের সমুজ্জ্বল আদর্শ স্থাপনপূর্ব্বক সর্ব্বসাধারণকে শিক্ষা দিতেন। হিংসা-দ্বেষ-লোভ-মোহাদি পাপ প্রবৃত্তিনিচয় হৃদয় হইতে সম্পূর্ণরূপে অপগত হওয়ায় তাহারা নিঃসঙ্কোচে, নিঃশঙ্কিতভাবে পর্ব্বত শিখরে, হিংস্র জন্তুপূর্ণ অরণ্যাদিতে কাহাকেও আঘাত না করিয়া এবং কাহারও কর্ত্তৃক আহত না হইয়া পুত্রকলত্রাদি সহ সুখে বসবাস করিতেন। আত্মার আবরণ মুক্ত হওয়ায়, অন্তর্নিহিত নিদ্রিত ব্রহ্মভাব জাগ্রত হওয়ায় তাহারা মহাশক্তি, মহানন্দ ও অমৃতের উৎস হইয়া উঠিতেন।

উক্ত মহাশক্তি ও সদ্গুণরাজির প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ প্রমাণ পাইয়া দেশের রাজন্যবর্গ অবধি তাহাদিগের নিকট মস্তক অবনত করিতেন এবং সময়ে ও অসময়ে তাহাদিগের নিকট সদুপদেশ, সৎশিক্ষা ও সু বিধান সকল গ্রহণ করিতে আশ্রমে উপনীত হইতেন। ঋষিগণের ত্যাগশীলতা কি অদ্ভুত! মহামহিম রাজচক্রবর্ত্তী যাহাদের পদারবিন্দ লাভে ধন্য হইতেন, যাহারা নিমেষমাত্রে রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইতে পারিতেন, তাহারা সর্ব্ব ত্যাগ করিয়া, বিজন অরণ্যমধ্যে ভগ্ন পর্ণকুটীরে উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা অথবা অনাহারে অর্দ্ধাহারে শারীর মানসিক বিবিধ কৃচ্ছ্র সাধনায় আত্মমোক্ষার্থে ও জগদ্ধিতায় নিযুক্ত থাকিতেন। সত্যই ভোগবিলাস, মদমদিরা, মদনের কটাক্ষবাণ এ সব তাহাদিগের নিকট লাঞ্ছিত, ঘৃণিত ও পরাভূত হইত। মনকে জয় করিলে ত মুনিত্ব লাভ হয়, মনোভূমি কর্ষণপূর্ব্বক জীবভাব নাশ করিয়া শিবত্ব প্রকাশ করিলেই ঋষিত্ব লাভ হয়। এ সকল কথার মর্য্যাদা রক্ষা ও প্রকৃত উপলব্ধি তখন তাহাদিগের দ্বারা সাধিত হইয়াছিল। একদিকে নিঃস্বার্থ ও নিষ্কামভাবে নারায়ণজ্ঞানে জগতের সেবা, অপর দিকে একটীর পর একটী করিয়া বিবিধ সংস্কার সমূলে উৎপাটিত

করিয়া আত্মভাব ব্যক্ত করা মাত্র তাহাদিগের দ্বারা বর্ণে বর্ণে প্রতিপালিত হইয়াছিল। তাহারা যে মাত্র ঐরূপ জীবন যাপন করিতেন, তাহা নহে, তাহাদিগের সংস্পর্শে যে কেহ আসিত, তাহারাও উক্ত মহদুদার জীবনীলাভে অনুপ্রাণিত, অভিলাষী, কৃতসকল্প ও কৃতকার্য্য হইত। রাজগণও এইভাবে ঋষিগণ কর্ত্তৃক উপকৃত হইয়া তাহাদিগের যজ্ঞসাধন, ছাত্র প্রতিপালন, গোদান, রাক্ষসবধ ইত্যাদি বিষয়ে সহায়তা করিতে কখনও কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। এইরূপে ঋষিকুল ও রাজন্যবর্গ (ক্ষাত্রশক্তি বা রাজশক্তির) মধ্যে সাহায্য ও ভাবের আদান প্রদান হইত। কালক্রমে তপোবলের ক্ষয় হইতে লাগিল। কঠোর সাধনা, প্রকৃতি বিজয়, সংস্কার দলন, অদ্ভুত অতীন্দ্রিয় জ্ঞানলাভের চেষ্টা ও সামর্থ্যসকল ঋষিগণের মধ্যে অভাব দেখা দিল। তাহারা এখন পূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিগণের ন্যায় আত্মজ্ঞানলাভে শিথিলপ্রযত্ন ও অসমর্থ হইয়া পড়িল; এইরূপ অসামর্থ্য সত্ত্বেও সত্যনিষ্ঠা, নিঃস্বার্থপরতা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজি কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে একেবারে লোপ পায় নাই। পরার্থে সর্ব্বস্ব দান, সত্যরক্ষার্থ রাজত্ব ত্যাগ, এমন কি, প্রাণ বিসর্জ্জন ইত্যাদি ভূরি ভূরি অপূর্ব্ব ত্যাগ ও ধর্ম্মপ্রাণতার নিদর্শন ইতিহাসের সর্ব্বত্র লক্ষিত হইয়া থাকে। আধুনিক বিলাসিতা, অভাব অভিযোগ, আলস্য, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি দোষনিচয় তখন মানব সমাজকে অভিভূত করে নাই। তখন রাজায় প্রজায় প্রীতি ও শ্রদ্ধা ছিল; পিতাপুত্রে ভালবাসা ও ভক্তি ছিল। ফলতঃ সর্ব্বত্র-শান্তিরাজ্য বিরাজমান ছিল।

সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। সংসার পরিবর্ত্তনশীল। নদীতে যেমন জুয়ার-ভাঁটা আছে, পর্ব্বত গাত্রে যেমন উত্থান পতন দেখা যায়, আলোকের পর যেমন ক্রমশঃ অন্ধকার আসে, ভারতের জাতীয় জীবনে তপশ্চর্য্যা ও আধ্যাত্মিকতার চরম উন্নতির পর জাতি যেন বহুশতবর্ষের কঠোর পরিশ্রমান্তে বার্দ্ধক্যে শক্তিহীনতা-প্রাপ্তির ন্যায় কথঞ্চিৎ অবসরপ্রিয় বিশ্রামার্থী ও ক্লান্ত হইয়া পড়িল। সদ্‌গুণরাজি একে একে অদৃশ্য হইতে লাগিল। কাজেই রাজশক্তি তখন স্বীয় মস্তক উত্তোলন করিল। প্রকৃতিতে উপযুক্ততা—গুণই সর্ব্বত্র সমাদর ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া থাকে। এবার ক্ষত্রিয়শক্তি প্রবল পরাক্রান্ত হইল। তপোবল এখন রাজশক্তির নিকট অধীনতা স্বীকার করিল। সুতরাং রজোগুণের ফলস্বরূপ ক্ষত্রিয়শক্তি হইতে সত্ত্ব ভাবোৎপন্ন শান্তি, মিলন ও একতার পরিবর্ত্তে তৎস্থানে অশান্তি, দ্বন্দ্ব কোলাহল, বিচ্ছেদ, দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার দেখা দিল। আনন্দ বাজার আজ নিরানন্দের

হাটে পরিণত হইল, বসুন্ধরা নর-শোণিত প্লাবিত হইল। লক্ষ লক্ষ প্রাণ সামান্য সূচ্যগ্র জমির জন্য উৎসর্গীকৃত হইল। এইরূপে ভারতে বসন্তাপগমে কালবৈশাখীর ন্যায় নীচতা, অসদ্‌বৃত্তি ইত্যাদি প্রায়ঃশই স্বগর্ব্বে দেখা দিল। অবশ্য ধর্ম্ম তখনও লোপ পায় নাই। মাঝে মাঝে অধর্ম্ম-নাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপন নিমিত্ত মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হইতে লাগিল। কিন্তু ঐরূপ অল্পসংখ্যক মহাপুরুষগণের পরিমিত শক্তির নিকট অপরিসীম সমষ্টির হীন ইচ্ছা বিশেষ কার্য্যকর হইল। মাত্র স্বমতাবলম্বী, ধর্ম্মভীরু কতিপয় জন বা প্রদেশের উপর তাহারা স্বশক্তির পরিচয় দিলেন ও এইরূপে ইতিহাসে তাহাদিগের জীবন এক নব যুগের সূত্রপাত করিল। তৎপরে তেজ আসিয়া দেখা দিল। ভারতের ধর্ম্ম, আচার নিষ্ঠা ইত্যাদি ক্রমশঃই হীনবল হইতে লাগিল। এখন মেধা বীর্য্য শৌর্য্য দৃঢ় শক্তি এ সকল অন্তর্হিত হইতে লাগিল ক্রমশঃ উত্তরোত্তর বলবীর্য্য সংগ্রহ পূর্ব্বক হীনতা নীচতা, হিংসা, পাপ, মলিনভাব অন্তর্বিচ্ছেদ, গৃহবিচ্ছেদ ইত্যাদি ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত অবধি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সিংহবিক্রম এক্ষণে মূষিকত্বে পরিণত হইল। ত্যাগ, দান, মহত্ত্ব ইত্যাদির ক্ষেত্রে স্বার্থপরতা, এমন কি, বিশ্বাসঘাতকতা অবধি দেখা দিল। ভারতের সর্ব্বশেষ মহাপ্রতাপ সম্রাট পৃথ্বিরাজের অধঃপতনের পর দেখা যায়—জাতীয় চরিত্র ক্রমশঃ কলুষিত হইয়া যাইতেছে। যদিও শত শত নির্ভীক বীরহৃদয় দেশভক্ত সুসন্তানগণ দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন তথাপি সাধারণভাবে দেখিতে গেলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, দেশময় মিথ্যা প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রবঞ্চনা, শঠতা ইত্যাদি কাপুরুষতা সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় একাধিপত্য বিস্তার করিতে সূত্রপাত করিয়াছিল। ভারতের গৌরবরবি চিরতরে অস্তমিত হইল এবং বিষাদময় অমানিশার ন্যায় পরাধীনতার শৃঙ্খল দৃঢ় হইতে দৃঢ়তররূপে তাহার গলদেশে অর্পিত হইল।

এবার আর এক অভিনব শক্তির আবির্ভাব হইল। ভারতের দুর্ভাগ্য ও অবনতির পূর্ণত্ব লাভে যতটুকু বাকি ছিল, তাহা আসিয়া এবার দেশকে আক্রমণ করিল। জাতীয় জীবন এবার মৃত্যুদশা প্রাপ্ত হইল। ইহার সংস্পর্শে শৌর্য্য, বীর্য্য উদারতা নিঃস্বার্থপরতা ইত্যাদি একবারে অন্তর্হিত হইল। পাঠক ও পাঠিকগণ! তোমরা বোধ হয় অনায়াসে অনুমান করিতে পারিয়াছ এই সর্ব্বনাশকর ভীষণ

মৃত্যুবাণ তুল্য মর্ম্মঘাতী নবশক্তি যমের অগ্রদূতী কে? ইহা অর্থের মোহিনী শক্তি। ভারতে অর্থ ই সর্ব্বেশ্বর হইয়া দাঁড়াইল। যাহা চিরদিন ভারতে হেয় তুচ্ছ নগন্ত, সর্ব্ববিধ দোষের আকর, সর্ব্ব অনর্থের মূল বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহা আজ ভারতের অন্তরে ও বাহিরে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইয়া পড়িল। কি আশ্চর্য্য মোহময় এই অর্থের উন্মাদকরী নেশা। বিলাসিতা, জড়বাদ পার্থিব ভোগ সুখের লালসা ভারতের আদর্শ হইল। অর্থলিপ্সা যেন মৃতেরও মধ্যে দেখা দিল! অর্থ বিনা আর কথা নাই। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সকল বিষয়ে অর্থের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইতে লাগিল। অপর বিষয়ের কথা আর অধিক কি বলিব। সর্ব্বত্র ভোগ সাধন কার্য্য নির্ব্বাহ, জীবন যাত্রা, ভদ্রতা বজায় আবার নিয়মপালন অর্থসাপেক্ষ হইয়া পড়িল। সুতরাং অর্থের কারণে বিবাদ বিসংবাদ অমিলন বিশ্বাসঘাতকতা আর্ত্তনাদ যন্ত্রণা দারিদ্র্য ইত্যাদি সকলই তাহার অনুগমন করিল। সোণার ভারত শ্মশান ও পিশাচের লীলাভূমিতে পরিণত হইল। দেশ দিন দিন দ্রুতপদে ধ্বংসের দিকে মৃত্যুর দিকে, অবনতির মোহানায় উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। খরস্রোতা পার্ব্বত্যনদীর ন্যায় ইহা সজোরে ছুটিতে লাগিল। কে ইহার গতিরোধ করিবে? কুল কিনারা ভাসাইয়া যেমন নদীর বন্যা চতুর্দ্দিক প্লাবিত করিয়া ফেলে, ভারতের অধর্ম্মস্রোত উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব্ব পশ্চিম সকল দিকে প্রবল বেগে বহিতে লাগিল। মাঝে মাঝে দেশের ইতস্ততঃ মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হইতে লাগিলেন; তাহারা যথোচিত শক্তিপ্রয়োগে মৃতকল্প জাতিকে আসন্ন মৃত্যুর মুখ হইতে উদ্ধার করিলেন বটে কিন্তু পথহারা ভারত আলোক পাইয়া চমকিয়া দাঁড়াইল মাত্র। শক্তিহীন আশা ও উদ্ধারের রস আস্বাদন করিল বটে, বন্যার বেগ দূর হইল বটে কিন্তু নদীর যে খরস্রোত সাগর সঙ্গমে ঝটিতি ছুটিয়াছে, উহা একেবারে নিরুদ্ধ হইল না বা উহার গতি পরিবর্ত্তিত হইল না। আচার্য্য শঙ্করের জ্ঞান গরিমা, বুদ্ধের ত্যাগ ও জীবসেবা, শ্রীচৈতন্যের প্রেমপ্রবাহ হইতে তৎকালিক অবস্থানিচয় বাধা পাইল ও কথঞ্চিৎ সংশোধিত হইল বটে কিন্তু উহাকে নষ্ট বা আমূল পরিবর্ত্তিত করিতে পারে নাই। তাহাদিগের কার্য্য অতীত স্মৃতির বিষয়মধ্যে পরিগণিত হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রভাত কিশোর কুণ্ডু।

মট

বাছাকে মোর সেদিন আমি
আন্‌তে দিলুম ঘট,
আন্‌লে কিনে বাছা আমার
একটা চিনির মট।
শুধাই তা'রে সোহাগ ভরে
"আন্‌লি কিরে বাছা ?"
বল্‌লে বাছা "জান নাকো—
এ যে চিনির খাঁচা।"
শুনেই আমি হেঁসেই সারা
(তারে) খেলুম কত চুমি।
একে যেরে মট বলে সব
জানও নাক তুমি ?
অমনি বাছা উঠ্‌লো ব'লে
"ভুল ব'লছো মা।
পিপ্‌ড়েরা গো হেথায় সবে
বন্দী দেখ্‌ছো না ?
থাকতে হেথায় ছিদ্র শত
বাহির কেবা হয়,
চিনির আশায় প্রাণে মরে
লোভ যে ছাড়া দায়।"
মানুষ তেমন বিশ্বমটে
চিনির খোঁজে হায়।
সত্যটুকুই হারিয়ে ফেলে
অসত্যটাই চায়।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার ঘোষ

—•:(*):•—

প্রাণের প্রাণ।

আশী লক্ষ যোনি ভ্রমিয়া জীব এই দুর্লভ মানব জন্ম পাইয়া থাকে। এ জীবন যদি পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদির জীবনের ন্যায় বৃথাই ভোগসুখে বিলাস ব্যসনে অতিবাহিত হয়, তবে মানবজীবন ও পশুজীবনে প্রভেদ কি? মনুষ্য জীবনের সার্থকতা কোথায়? এ মহান্ লোভনীয় মানবাধিকারের সদ্ব্যবহার হইবে কিরূপে? পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন—মানবজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। প্রত্যেক মানুষকে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইবে। যে আজ ভোগোন্মত্ত, পাপরত, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, সেও কালে পরমতত্ত্ব লাভ করিবে। জীবের পুনঃ পুনঃ দেহধারণ, তাহার ভোগাসক্তি, দুঃখকষ্ট স্বীকার, ভোগসুখলাভ—এ সকলের প্রয়োজনীয়তা আছে। বহুদর্শন লাভ করিবার পর জীব সেই বহুর মূলে এককে দর্শন করিতে পারে। প্রথমে লক্ষ, কোটী প্রভৃতির সংখ্যার মোহে জীব মুগ্ধ থাকে, পশ্চাৎ তাহার জ্ঞান হয়; তখন সে বুঝিতে পারে, লক্ষ কোটী প্রভৃতির অস্তিত্ব একের উপর নির্ভর করিতেছে। একের উপর শূন্য যোগ করিলে লক্ষ, কোটী ইত্যাদি সংখ্যা গঠিত হয়। যেখানে এক নাই, সেখানে শূন্যের মূল্য কোথায়? এককে অবলম্বন করিয়াই লক্ষ, কোটী ইত্যাদি সংখ্যার সৃষ্টি। আর দুই তিন ইত্যাদি যে সংখ্যা, উহারা একের যোগফল মাত্র। দুইয়ের মধ্যেই এক নিহিত আছে। দুই কখন এক ছাড়া নয়। উপমাচ্ছলে বলা যাইতে পারে, অজ্ঞ লোকের ঈশ্বরপ্রাপ্তি, সংসারের রহস্য সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা মনুষ্যের সংখ্যাজ্ঞানের ন্যায় হইয়া থাকে। এ জীব জগৎ, ভোগসুখ, যাহা কিছু দেখা যাইতেছে, যাহাকে লাভ করিলে মানুষ ঈশ্বরকে ভুলিয়া যায়, এ সকলের অস্তিত্ব ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতেছে। সূত্রে মণিগণের ন্যায় জগতের মধ্যে ওতঃ-প্রোতভাবে তিনি ব্যাপ্ত আছেন। জগতের সর্ব্ববস্তুতে, সর্ব্বজীবে, সর্ব্ববিষয়ে তাহার অস্তিত্ব বিরাজমান; যে কেহ প্রথমে তাঁহাকে জানিয়া পশ্চাৎ অন্য বিষয় আশ্রয় করে, তিনি শান্তিসুখের অধিকারী হন; অপর ব্যক্তি মাত্র দুঃখভোগ করিয়া থাকে। আপাতমধুর পরিণামভয়াবহ বিষয়সমূহ দুঃখাস্পদের নামমাত্র। জীব সংসারে বিবিধ বস্তু উপভোগ করিয়া, নানা প্রকারে সুখ দুঃখের ভাগী হইয়া,

সর্ব্ববিষয়ে পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া জানিতে পারে, এ সংসার ধোঁকার টাটী। এখানকার যাহা কিছু ভাল, সকলই আপাতমধুর; সকলই চিত্তবিভ্রমকারী। বস্তু, বিষয় ও প্রাণিগণকে বস্তু, বিষয় ও প্রাণীরূপে গ্রহণ করা মহাভ্রম। তাহাদিগকে স্ব স্ব স্বরূপে, ঐ ঈশ্বরীয়ভাবে গ্রহণ করিতে পারিলেই জীবের মহামুক্তি; সংসারের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইলে তাহার প্রতি অনাদর জন্মে; তখন চিত্তে বৈরাগ্যের উদয় হয়। চিত্ত ঈশ্বরের ধ্যান করে। ফলতঃ এইরূপে কালক্রমে জীবের আত্মোপলব্ধি বা ঈশ্বরদর্শন ঘটিয়া থাকে। মনুষ্যজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, পরমার্থলাভ। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত জীবগণ না বুঝিতে পারে, পরমার্থই প্রকৃত অর্থ আর সকলই অনর্থ, ততদিন তাহার সংসারাসক্তি ও চিত্তের ভ্রান্তি দূর হইবে না। ততদিন তাহার নিকট সংসার সুখের আলয় বলিয়া বিবেচিত হইবে। সাংসারিক ক্রিয়াকলাপ, গতিবিধি তাহার চিত্তাকর্ষণ করিবে। আগে ভোগ তারপর যোগ। যাহার ভোগ সাধনা হয় নাই, তাহার পক্ষে যোগসাধনা হয় না। যে মনের সাহায্যে মানব যোগসাধনায় রত হইবে, সে মন ত ভোগরত, নিয়তই চঞ্চল। চাঞ্চল্যের কারণ ভ্রান্তি; বাহ্যবস্তুকে রমণীয় বলিয়া গ্রহণ করিলেই চিত্ত শান্তির আশায় তাহার নিকট ধাবিত হয়, তাহাকে লাভ করে; যখন প্রথম প্রথম দুই চারিবার অথবা আরও অধিকবার তাহাকে আলিঙ্গন ও উপভোগ করতঃ বুঝিতে পারে, উক্ত বাঞ্ছিত বস্তুর মধ্যে সুখ নাই, উহাতে বিষম বিষজ্বালা বাড়িতেছে, তখন মানুষ উহাকে ত্যাগ করিতে চেষ্টা করে ও উহার আক্রমণ হইতে মুক্ত হয়। কিন্তু ত্যাগের বাসনা অন্তরে উদিত হইবার পর উহাকে কার্য্যে পরিণত করা যায়; বহুবার জয় পরাজয়ের মধ্যে ভ্রমণ করিয়া, বহু উত্থান পতনের মধ্যে দিয়া অগ্রসর হইয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মগত সংস্কাররাজির বেগকে হনন করিতে পারে। এ কার্য্য সফল করা বহু আয়াসসাপেক্ষ। কত জন্ম হইতে মানবকে এইরূপে কুপ্রবৃত্তির সহিত যুদ্ধ করিতে হইতেছে; তাহার জীবন লোকচক্ষে অতিশয় ঘৃণার্হ হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ কলঙ্কিত জীবন দয়ার পাত্র। তাহাদিগকে ঘৃণা করা কখনই বিজ্ঞের কর্ত্তব্য নহে। পাপীর পাপকে ঘৃণা কর। কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করিও না। কুকর্ম্মরত ব্যক্তি সুসংস্কৃত ও উন্নত হউক। এমন কে আছেন যিনি জীবনে কখনও ইন্দ্রিয়ের প্রলোভনে পতিত হন নাই, যিনি লোভের মত্ততায় আত্মহারা হন নাই। সুতরাং বিপথগামীর মৃত্যু কামনা করিও না। তাহার জীবন

হইতে আমরা এক মহা উপদেশ শিক্ষা করি। পাপীর কলুষিত শ্রীভ্রষ্ট জীবন দেখিয়া আমরা পাপানুষ্ঠানের বিষময় কুফল দেখিতে পাই। পাপীর জীবন দেখিয়া আমরা পাপ অপেক্ষা পুণ্যের, ধর্ম্মেরই আদর ও অনুসরণ করি। পাপীও কোন না কোনরূপে জগতের এক মহান্ উদ্দেশ্য সাধন করে। সুতরাং অনুন্নত অজ্ঞ তমোমলিন জীবনের প্রতি উপেক্ষা অনুপযুক্ত।

শাস্ত্র বলেন:— সাধারণ জীবের মনের গতি নিম্ন দিকে। ভোগ সুখে, ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ বিষয়ে, প্রেয়সালিঙ্গনে মানব মন সর্ব্বদাই ব্যস্ত। জীব পাপ পুণ্য, ধর্ম্মা-ধর্ম্ম, ভদ্রাভদ্র নীতি ও আচারের অপেক্ষা করে না। যে প্রকারেই হউক, ভোগলাভ হইলেই সে আনন্দ পায়। তাহাতেই তাহার জীবন ধন্য ও জন্ম সার্থক বোধ হয়। ভোগ, ইন্দ্রিয়গণের পরিতৃপ্তিই তাহার একান্ত বাঞ্ছনীয়; উহাই তাহার জীবনের মূলমন্ত্র। সাধারণতঃ জীব আর কিছুই চাহে না। সত্ত্বগুণাশ্রয়ে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ পূর্ব্বক, অবাঙ্ মানসোগোচর পদার্থের জন্য লালায়িত না হইয়া ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর অনায়াসলব্ধ বিষয়ে-প্রপঞ্চ উপভোগে তাহার অতৃপ্ত কামনা। ইহাতে যদি সত্ত্বগুণ বিনষ্ট হইয়া রজঃ বা তমো গুণের অধীন হইতে হয় সে তাহার জন্য বিশেষে দুঃখিত নহে। এইরূপ ভোগসাধন জীবনের আদর্শ হওয়ার পক্ষে নিন্দনীয় হইলেও ইহার উপকারিতা বিদ্যমান আছে। ভোগকে যোগলাভের, পরমার্থ অর্জ্জনের অধস্তন সোপানরূপে আশ্রয় করিতে দোষ নাই। যাহাদিগের অন্তরে ভোগসুখ কামনার নিবৃত্তি হয় নাই, যাহারা জগতের অসারতা বুঝিতে পারে নাই, তাহারা কিছুতেই সংসারকে অসার অপদার্থ জ্ঞান করিতে পারে না। ঈশ্বর তাহাদিগের নিকট স্বর্ণমৃগ বা আকাশ কুসুম। ধর্ম্ম, আত্মপ্রকাশ এ সকল তাহাদিগের নিকট কষ্ট কল্পনা মাত্র। ভোগে তাহা-দিগের জ্ঞান চক্ষুঃ উন্মিলিত হয়। ভোগই পরিশেষে ভোক্তাকে ভোগের অসারতা বুঝাইয়া দেয়। মোহমুগ্ধ জীবের ভ্রান্তিবিমোচনের জন্য প্রকৃতির এই জগৎ সৃষ্টি। ভোগের অসারতা, সংসারের ক্ষণভঙ্গুরত্ব জ্ঞান হইলে পর, জীবের মায়া মোহ, ভোগ বাসনা সকলই বিলীন হয়। জীব তখন ভোগ ত্যাগ করিয়া অনিত্য অসার সংসার-সুখ পদদলিত করিয়া নিত্য প্রাণপ্রদ ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলপ্রদ, সর্ব্বাভাব-পূর্ণকারী, কামদুহ জ্ঞান লাভের জন্য যোগাবলম্বনের উপায় অন্বেষণ করে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্গাদাস চক্রবর্ত্তী।

অনাসক্তি যোগ।

শ্রীভগবানে কর্ম্মফলার্পণই অনাসক্তি যোগ। সুখদুঃখ, লাভালাভ ইত্যাদি বিচার না করিয়া কর্ত্তব্যজ্ঞানে কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান করাই অনাসক্তি যোগ। ইহাকেই কর্ম্মফলার্পণ বলে। কর্ম্মে আসক্তি নাই, কর্ম্মে ঔদাস্যও নাই, যথাগত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মহাপুরুষগণের পন্থা অনুসরণ দ্বারা প্রচলিত নীতি, শিক্ষা ও ধর্ম্মমতের পুষ্টিবিধান করাই—এ যোগের মুখ্য সাধনা। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌ গীতায় ভগবদুক্তিতে কথিত আছে :—

যৎ করোসি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্॥

হে কৌন্তেয়! যাহা কিছু অনুষ্ঠান কর, যে কোন দ্রব্য ভোজন কর, যাহা হোম কর, সে সকল আমাতেই অর্পণ কর। এইরূপে কর্ম্মরত হইলে কর্ম্মত্যাগরূপ যোগযুক্ত হইয়া মায়ামুক্ত হইয়া ঈশ্বরলাভ করা যায়। শাস্ত্রেও কথিত আছে :—কর্ম্মেই মানবের অধিকার। ফলাকাঙ্ক্ষা করা তাহার কর্ত্তব্য নহে। কর্ম্ম বিনা কেহ মুহূর্ত্তকাল অবধি জীবন ধারণ করিতে পারে না। জনকাদি মহর্ষিগণও লোক-রক্ষা হেতু কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সুতরাং মানবমাত্রেরই অনাসক্তভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করা একান্ত কর্ত্তব্য।

ভগবানে আরোপিত কর্ম্মই ভক্তি। উহাকে আরোপাসিদ্ধা ভক্তি বলে। যিনি সৎস্বরূপ, মঙ্গলময়, শান্তির উৎস, তাঁহাতে কর্ম্মফল অর্পণ করিলে, কর্ম্ম হইতে সত্য, মঙ্গল ও শান্তি লাভ হইয়া থাকে। সূর্য্যকান্ত মণির স্বতন্ত্র দাহিকাশক্তি নাই সত্য কিন্তু সূর্য্যরশ্মির সংস্পর্শে আসিয়া দাহিকাশক্তিযুক্ত হইয়া পড়ে। মঙ্গলময়ের শরণ লইলে মানব মঙ্গলের অধিকারী হয়। প্রভুর গুণাবলী তাহার আদর্শ হয়। পিতার ধনে পুত্রের পূর্ণ অধিকার।

সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার করিলে দেখা যায় "তৎকর্ম্ম হরিতোষং যৎ।" ভগবানের প্রীতির জন্য যাহা করা যায় তাহাই কর্ম্ম। যাহা কিছু মানুষ ব্যক্তিগত সুখের জন্য বা ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান করে, তাহা কামজ বা স্বার্থসাধযুক্ত বলিয়া বন্ধনের কারণ হয়। মানুষের মন ক্ষুদ্র। যতক্ষণ সে আপনাকে দেহ, ইন্দ্রিয়

ইত্যাদি বলিয়া ধারণা করে, ততক্ষণ উহা পাপমলিন ; বিশ্বের চিন্তা, সর্ব্বভূতের মঙ্গল কামনা এ সকল তাহতে স্থান পায় না। ফলতঃ উহা সর্ব্ব দোষের আকর হইয়া পড়ে। কিন্তু যখন কর্ম্মফল শ্রীভগবানে অর্পিত হয়, তখন ব্যক্তিগত স্বার্থ তাহার মধ্যে না থাকায়, বিশ্বপিতার বিশ্বজনীন ভাবনিচয়, লোককল্যাণকর সদ্‌গুণাবলী ভগবদ্‌-বিশ্বাসীকে অনুপ্রাণিত করে। সকল সাধক, ভক্ত ও কর্ম্মী তাহার আদর্শ আরাধ্য দেবতাকে মঙ্গলময়, পুণ্যের আধার, শক্তির উৎস ইত্যাদি বলিয়া ধারণা করে। কেহ তাহার আরাধ্য দেবতাকে হীন, পাপলিপ্ত, অকর্ম্মণ্য মনে করে না। সুতরাং আদর্শকে সমুন্নত, শক্তি ও গুণবিশিষ্ট মনে করিয়া নির্ভরশীল মানব কর্ম্মফলার্পণ দ্বারা সবিশেষ লাভবান্‌ হইয়া থাকে। যাহার চিন্তা করা যাইবে, তাহারই ভাবনিচয় স্বতঃই চিন্তাকারীর অন্তঃকরণকে স্পর্শ করিবে। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। ইহা বুঝাইবার আবশ্যক করে না। অতএব ভগবানে ফলার্পণরূপ অনাসক্তি যোগ দ্বারা মানবকুল অনায়াসে মুক্তির অধিকারী হইতে পারে। ইহাতে সাধন, ভজন, তপস্যা, তীর্থদর্শন বা বিষয় ত্যাগের আবশ্যক করে না। ইহা অতি সহজ সাধনা। ইহার মূলমন্ত্র ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস। তাঁহার মঙ্গলময় বিধানে ও অনুষ্ঠানে অচলা শ্রদ্ধা। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় উক্ত আছে :—

মন্মনাঃ ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি কৌন্তেয় তস্মাদ্‌ যুক্তস্ব ভারত ॥

ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন "হে ভারত! অহোরাত্র আমার চিন্তা কর, আমার ভজনা কর, আমার যাজন কর, আমাকে নমস্কার কর ; তাহা হইলেই তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইবে। ঈশ্বরে কর্ম্মফল সমর্পণই অনাসক্তি যোগ নামে অভিহিত।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

——



পুস্তক পরিচয়।

শিশুসাথী—মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক শ্রীআশুতোষ ধর। প্রাপ্তিস্থানঃ—আশুতোষ লাইব্রেরী ৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ও ঢাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵১০; ষাণ্মাষিক মূল্য ১৲, বার্ষিক মূল্য ১৸০

আমরা উক্ত পত্রিকার বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যা পাইয়াছি। পত্রিকাটী একাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। উহা ডিরেক্টর বাহাদুর কর্ত্তৃক সমগ্র বঙ্গের বিদ্যালয়সমূহের লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত হইয়াছে। শিশুদিগের বুদ্ধিবৃত্তি বা কল্পনাশক্তি উন্মেষযোগ্য সরস ভাষায় ইতিহাস, ভ্রমণ, বিজ্ঞান প্রকৃতি, নীতি মহাপুরুষগণের জীবনী প্রভৃতি বিষয়ক বিবিধ সুন্দর রচনা, গল্প ও কবিতা ইহাতে প্রকাশিত হয়। শিশুরা ইহা বেশ যত্ন ও আদরের সহিত পাঠ করিবে। শিশুদিগের মধ্যে অল্প বয়সে বিদ্যানুরাগ জাগাইয়া দিতে হইলে এ জাতীয় পত্রিকার বিশেষ আবশ্যক আছে।

সংঘ ও বার্ত্তা।

১। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও ৮ই ভাদ্র, (২৪শে আগষ্ট) বুধবার ৯৩ নং গড়পার রোডস্থ তত্ত্বমসি মঠে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী দিবস উক্ত মঠের বার্ষিক মহোৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইবে। আমরা বিশেষ আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে ঐ দিবস পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় দিবসব্যাপী পূজা, পাঠ, কীর্ত্তন, প্রসাদ বিতরণাদি আনন্দোৎসব হইবে। উৎসবদিবসের বিস্তারিত কার্য্যপদ্ধতি সংবাদপত্রসমূহে যথাসময়ে প্রকাশিত হইবে। ভদ্র মহিলাগণের জন্য বিশেষ স্থানের ব্যবস্থা থাকিবে। সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

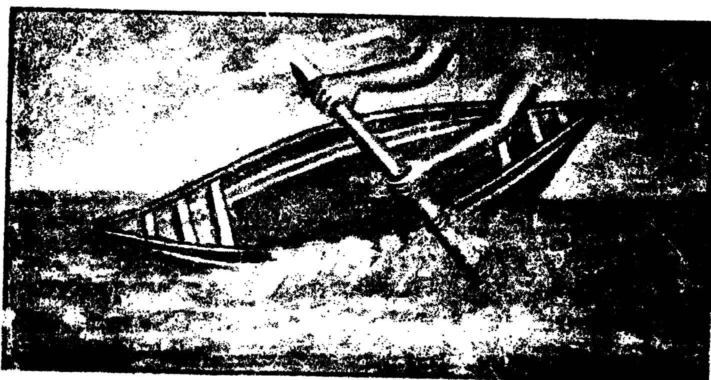
২। তত্ত্বমসি মিশনের অবৈতনিক বিদ্যালয়ে সকল শ্রেণীর বালকগণকে শিক্ষা দেওয়া হয়। যাঁহারা উক্ত বিদ্যালয় সম্বন্ধে কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মিশন সম্পাদকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সবিশেষ অবগত হউন।

৩। তত্ত্বমসি মিশনে সুযোগ্য চিকিৎসকগণের দ্বারা বিনামূল্যে চিকিৎসা করা ও ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

বিশ্বজনীন

ধর্ম্ম-নীতি-শিক্ষাসংস্কারাদি সম্বন্ধীয় বর্ত্তমান যুগোপযোগী

তত্ত্বমসি মঠের মুখপত্র



"সত্যমেব জয়তে নানৃতম্"



৩য় বর্ষ—৫ম সংখ্যা

ভাদ্র, ১৩৩৯ সাল।

Viswajanin

The Organ of Tattwamasi Math.

সম্পাদক—স্বামী নির্ব্বাণানন্দ

বিশ্বজনীন কার্য্যালয়।

৩২।১ রাজা দিনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য ২৲

সূচীপত্র

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-
শ্রীচরণ ভরসা।

বিশ্বজনীন।

৩য় বর্ষ } ভাদ্র ১৩৩৯ { ৫ম সংখ্যা।

সামবেদ-সংহিতা।

ছন্দ আর্চ্চিকঃ। কৌথুমী শাখা। ঐন্দ্রপর্ব্ব। ২অ, ২প্র, ২প, ২খ, ২দ।

উদ্‌ঘেদভি শ্রুতামঘং বৃষ ভন্নর্যাপসং।
অস্তারমেষি সূর্য্য ॥ ১।

শুনিয়াছি তুমি দেব জ্ঞানাধার ভকতসহায়।
বেদবৈরী কদাচারী আমাদের কি হবে উপায় ॥
অজ্ঞানতিমিরে অন্ধ হইয়াছে মোদের নয়ন।
জ্ঞানালোক কর দান তেজোময় শত্রু বিনাশন ॥

যদদ্য কচ্চ বৃত্রহন্নুদগা অভি সূর্য্য।
সর্ব্বন্তদিন্দ্র তে বশে ॥২।

এ ভব ভবন মাঝে যত কিছু জঙ্গম স্থাবর।
সে সব তোমার সৃষ্টি তুমি তার কেবল ঈশ্বর ॥
মোহাবেশে অভিমানে করি মোরা আমিত্ব প্রচার।
অভিমান নাশ কর, দেবদেব পূর্ণ সারাৎসার ॥

য আ নয়ৎ পরাবতঃ সুনীতী তুর্ব্বশং যদুং।
ইন্দ্রঃ স নো যুবা সখা ॥ ৩।

দয়িত বল্লভ সখা জগদীশ হর গো ভূভার।
কত রূপে কত ভাবে কত জনে করিছ উদ্ধার ॥
পরিত্রাতা ভয়ত্রাতা কর মোর বন্ধন মোচন।
বিপরীতপথগামী, কেমনে হে লইব শরণ ॥

মা ন ইন্দ্রাভ্যা দিশঃ সূরো অক্তুষ্বায়মৎ।
ত্বাযুজা বনেম তৎ ॥ ৪।

তুমি যারে কৃপা কর, সেই জন মৃত্যুঞ্জয়ী হয়।
বিষয় বাসনারাজি ক্ষণতরে তারে না দংশয় ॥
বহিঃশত্রু অন্তঃশত্রু সর্ব্বভয় দূর হয়ে যায়।
কে তার অহিতাচারী বিভু যার সম্বল সহায় ॥

এন্দ্র সানসিঁ রয়িঁ সজিত্বানঁ সদাসহং।
বর্ষিষ্ঠমূতয়ে ভরঃ ॥ ৫।

দেবতার কামনীয় জ্ঞানধন পরম রতন।
তুমি তার অধিপতি জ্ঞানাধার শত্রুবিনাশন ॥
তোমার প্রসাদে জীব পায় নিত্য এ হেন রতন।
তোমা সম দানবীর কেহ নাই এ তিন ভুবন ॥

ইন্দ্রং বয়ং মহাধন ইন্দ্রমর্ভে হবামহে।
যুজং বৃত্রেষু বজ্রিণং ॥ ৬।

ক্ষুদ্র কি মহৎ কার্য্য সর্ব্ব কর্ম্ম তুমি মূলাধার।
শত্রুনাশ রিপুজয় এ সকল মহিমা তোমার ॥
সুকর্ম্মে নিযুক্ত করি, কর নাথ অভীষ্ট পূরণ।
তোমার করুণা বিনা, কিবা আছে অনাথশরণ ॥

অপিবৎ কদ্রুবঃ সুতমিন্দ্রঃ সহস্রবাহ্বে।
তত্রাদদিষ্ট পৌংস্যং ॥ ৭।

অশেষ করুণাসিন্ধু দীনবন্ধু শুদ্ধসত্ত্বদাতা।
প্রতিদান নাহি চাও পরমেশ ভবভয়ত্রাতা ॥
অতি তুচ্ছ উপহার আনিয়াছি তোমার কারণ।
আশুতোষ তুষ্ট হও, দীননাথ অনাথপালন ॥

বয়মিন্দ্র ত্বায়বোঽভি প্র নোনুমো বৃষন্।
বিদ্ধী ত্বা স্য নো বসো ॥ ৮।

বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি, পূর্ণ কর মোর অভিলাষ।
তোমার দর্শন মাগি, হৃদে মোর নাহি অন্য আশ ॥
অন্তর্যামী নারায়ণ তোমা মোরা করি আরাধন।
অভীষ্ট পুরাও নাথ, অজ্ঞানতা করহে বারণ ॥

আ ঘা য়ে অগ্নিমিন্ধতে স্তৃণন্তি বর্হিরানুষক্।
যেষামিন্দ্রো যুবা সখা ॥ ৯।

উদ্বুদ্ধ প্রবুদ্ধ কর আত্মারাম আরামের স্থল।
হৃদয় বিস্তৃত হ'ক শুদ্ধভাব হউক অটল ॥
বিকাশি জ্ঞানের ভাতি, নাশি মোর অরাতি নিচয়।
আত্মার বোধন যজ্ঞে, পুরোহিত তুমি সর্ব্বময় ॥

ভিন্ধি বিশ্বা অপ দ্বিষঃ পরিবাধো জহী মৃধঃ।
বসু স্পার্হং তদা ভর ॥ ১০।

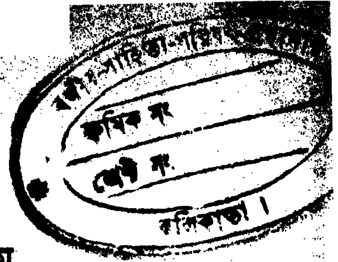
দুর্ব্বার রিপুর বল কেমনে হে করিব দমন।
তোমার প্রসাদ বিনা রিপুগণ না হয় নিধন ॥
নাশি মোর অজ্ঞানতা, কামশূন্য কর হে হৃদয়।
তোমার প্রসাদে ধন্য হৃদি মোর হইবে নিশ্চয় ॥

তোমার প্রকৃত স্বরূপ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হে মহাত্মন্! জানিও তোমার প্রকৃত স্বরূপ সেই অনাদ্যনন্ত চিদ্‌ঘন পরমপদ বা পরমতত্ত্ব। উহা সর্ব্বদা ব্রহ্মভাবে বিরাজমান। তন্নিষ্ট হইলে আর মৃত্যু ও শোকের বশীভূত হইতে হয় না; প্রাণধারণোপযোগী ভোজনাচ্ছাদনাদির দ্বারা প্রপীড়িত হইতে হয় না। তিনি সত্তাসামান্তরূপে ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবনিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া পশুপক্ষিকীটপতঙ্গাদি সকলেরই আনন্দ বিধান করিতেছেন। তিনি দেবের দেবত্ব, মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, চেতনের চেতনত্ব, ঘটের ঘটত্ব, কালের কালত্ব, কৃষ্ণবর্ণে কৃষ্ণতা, শুক্লবর্ণে শুক্লতা ইত্যাদি কত রূপে না বিরাজ করিতেছেন। তিনিই বাল্য-কালে বাল্যভাবে, যৌবনে যুবভাবে, বার্দ্ধক্যে জরাভাবে, মৃত্যু সময়ে মৃত্যুভাবে বর্ত্তমান আছেন। সেই পরমেশ্বরই স্থিতিতে স্থিতিরূপে, নাশে নাশরূপে, উৎপত্তিতে উৎপত্তি-রূপে বিরাজমান। তিনিই সকল পদার্থ; তাঁহা হইতে পদার্থের কোন ভেদ নাই। এই সকল নানাত্ব বৈচিত্র্য মিথ্যা। শিশু যেমন বেতালের কল্পনা করে, সেই রূপ সত্যস্বরূপ আত্মচিৎস্বভাবে এই মিথ্যা কল্পনার সৃষ্টি হইয়াছে। সম্যক্‌দর্শনবিরোধী অজ্ঞান হইতে এই জীবাত্মক সংসার প্রকাশ পায়। সম্যক্ দর্শন ঘটিলে সংসারের অস্তিত্ব লোপ হয়; অর্থাৎ উহা মিথ্যারূপে, স্বপ্নের মত অলীক বলিয়া বোধ হয়। অজ্ঞানের অঘটনঘটন পটীয়সী শক্তি আছে। কারণ ভ্রমে যাহা হয় না, তাহা জগতে নাই; ভ্রমবশতঃ এই জগতে বিচিত্র বিচিত্র বস্তু দৃষ্ট হয়, অসম্ভবও সম্ভব হয়, সম্ভবও অসম্ভব হয়। জল মধ্যে অগ্নি, শিলাতে পদ্ম, শূন্যে নগর, প্রস্তর মধ্যে জল প্রভৃতি দেখা যায়, নিমেষমধ্যেই ঘট পট হইয়া যায়, স্বপ্ন জ্ঞানেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। চন্দ্রাতপের স্তায় আকাশে জল অবস্থান করে, স্বর্গনদী গঙ্গাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আত্মস্বরূপ বিমুগ্ধ জীব বিষয়রাগাদিমোহে আচ্ছন্ন হইয়া ভ্রমে ভ্রমাক্রান্ত হইতেছে, স্বপ্নের পর স্বপ্নে অভিভূত হইতেছে এবং তাহাতেই স্থির প্রত্যয়হেতু ধর্ম্মাক্রান্ত দেহাদিবিবরে প্রবেশভ্রমরূপ মোহে আচ্ছন্ন হইতেছে ও হইয়া থাকে। হে জীব! মায়ামোহাদির কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে তোমার চির-শান্তিময় শুদ্ধ বুদ্ধ অপাপবিদ্ধ প্রকৃত স্বরূপে আস্থা স্থাপন কর।

(ক্রমশঃ)



তুকারাম

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

"জীবে দয়া নামে রুচি ভক্তি নারায়ণে সকল ধর্ম্মের সার রাখিও স্মরণে।" আত্মমোক্ষ ও জগতের কল্যাণ সাধনই ভক্ত-জীবনের বিশিষ্ট লক্ষণ। ভক্ত যখন ভগবৎপ্রেমে মাতুয়ারা হইয়া যান, তখন তিনি সর্ব্বভূতের প্রতি আপনার হৃদয়ের গভীর ভালবাসা জ্ঞাপন করেন। তখন তিনি সর্ব্বভূতে ঈশ্বরকে দেখেন। তখন সকল জীবই ভগবানের সন্তান বলিয়া তাহার চক্ষে প্রতীত হয়। তুকারামের জীবনেও জীবে প্রেম ও নারায়ণে ভক্তি সম্যগ্‌রূপে দেখা দিল। তিনি আহার্য্য দ্রব্যাদি পিপীলিকা প্রভৃতির বাসস্থানে রাখিয়া দিতেন। পশু পাখীকে আহারে নিরত দেখিলে কখনও তাহাদিগকে বিতাড়িত বা ভয় প্রদর্শন করিতেন না। ক্ষুধিতে অন্ন দান করিতে তিনি সর্ব্বদা উৎসাহী। তাহার অর্থসামর্থ্য ছিল না বটে কিন্তু তাহার চেষ্টার ক্রটি ছিল না। তিনি ভিক্ষার দ্বারা যাহা লাভ করিতেন, তদ্দ্বারা ক্ষুধিতের অন্নসমস্যা দূর করিয়া দিতেন, ক্লান্ত ব্যক্তিকে দেখিলে তাহার পদ প্রক্ষালণ করিয়া দিতেন। যথাবিধি তাহার পদ সেবা করিতে কখনই বিস্মৃত হইতেন না। গ্রীষ্মকালে পথিকদিগের জন্য বারিকুম্ভ বহন করিয়া আনিতেন; যাহাতে মন্দিরে আসিতে ভক্তগণের ক্লেশ না হয়, তজ্জন্য তিনি পথের কণ্টক সকল তুলিয়া ফেলিতেন; তাহারা ভজনায় রত থাকিলে তিনি তাহাদিগের পাদুকা রক্ষা করিতেন; তাহাদিগের পথের কষ্ট দূর করিবার জন্য অন্ধকারে আলোক হস্তে দাঁড়াইয়া থাকিতেন; বৃদ্ধ লোকদিগকে হাটে যাইতে দেখিলে, তিনি তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়া স্বয়ং হাট হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া স্বীয় স্কন্ধে করিয়া উহা পৃথক্ পৃথক্ গৃহে বহন করিয়া লইয়া যাইতেন। তুকারামের মনে অভিমান বা অহঙ্কার ছিল না। তিনি সম্পূর্ণরূপে নিরভিমান ছিলেন। সুতরাং এ সকল কর্ম্মে-এইরূপে জীব সেবায় তাহার আনন্দ লাভ হইত। কিন্তু তাহার পত্নী অবলাঈ তাহা সহিতে পারিতেন না। তিনি দেখিতেন, সুস্থকায় ব্যক্তিগণও তাঁহাকে বৃষভের ন্যায় পরিশ্রম করাইয়া লইতেছে। এ কারণে তিনি তাহার স্বামীর নির্বুদ্ধিতার জন্য তাহাকে যথেষ্ট গঞ্জনা ও তিরস্কার করিতেন। যাহা হউক, দিনমানে তুকারাম

এইরূপ কঠোর পরোপকার ব্রতে নিযুক্ত থাকিতেন। রাত্রিকালে তিনি নয়নাভিরাম "শ্যামসুন্দরের" সৌম্য মূর্ত্তি নিরীক্ষণে ও ধ্যানে অতিবাহিত করিতেন। ভাবাবেশে কোথা হইতে তাহার দিবারাত্র অতিবাহিত হইত, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন না। এইরূপে তুকারাম মহাপুরুষ পদবী লাভ করিলেন। দেবতা তাহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন।

যে মহৎ কর্ম্ম সাধন করিবার জন্য তাহার জন্ম এইবার তাহার সূত্রপাত হইল। এক্ষণে আত্মমোক্ষ লাভ হইয়াছে; ভগবান্ তাহাকে লোকের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত করিবার অধিকার প্রদান করিতে তাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। পরম আনন্দের বিষয়, এক দিন বিঠোবা তদীয় পরলোকগত পরম ভক্ত নামদেবকে সঙ্গে করিয়া তাহার নিকট স্বপ্নযোগে আবির্ভূত হইলেন ও বলিলেন, তুকারাম, নামদেব যে "অভঙ্গ" অপূর্ণ রাখিয়া দিব্যধামে চলিয়া আসিয়াছে, তুমি তাহা পূর্ণ কর। তোমাকে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি প্রদান করিতেছি। তুমি আমার "প্রসাদবাণী রচনা কর।" দেবতা এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তুকারামের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি জাগ্রত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। দেবতা আজ তাহার প্রতি অযাচিত করুণা বর্ষণ করিয়া তাহাকে চিরস্মরণীয় কীর্ত্তির অধিকারী করিলেন; জ্ঞানমিশ্র ভক্তি দানে কৃতার্থ করিলেন। তাহার আনন্দসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। দেবাশীর্ব্বাদে তাহার অন্তরে দিব্য ভাব ও দিব্য জ্ঞানের আবির্ভাব হইল। ভগবানের মহিমাব্যঞ্জক ভাবময়ী কবিতা সকল সমুদ্রে তরঙ্গের পর তরঙ্গের ন্যায় তাহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইতে লাগিল। তাহার পদাবলী শ্রবণ করিয়া সকলে যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়াভিভূত হইলেন। অনেকেই তাহাকে দেবমানব বলিয়া সম্মান ও পূজা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাগবতের দশম স্কন্দের শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ও বহু পদাবলী রচনা করিলেন। সেই সকল পদাবলীতে তুকারামের অপূর্ব্ব ত্যাগ, ভগবৎ ভক্তি, নির্ভরশীলতা প্রভৃতি প্রকাশ পাইয়াছে। ক্রমশঃ তুকারামের গৌরব ও প্রতিষ্ঠা দেশময় ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তাহার সুখ্যাতি বিস্তার দর্শনে অসহিষ্ণু হইয়া "মম্বাজী বাবা গোঁসাই" নামক জনৈক প্রতিপত্তিশালী সাধুর বিশেষ ঈর্ষার উদয় হইল। ঈর্ষার কারণ, এক্ষণে দেশের অধিকাংশ লোক তাহার নিকট না আসিয়া তুকারামের নিকট যাইতেছে। তিনি তুকারামকে অপদস্থ করিবার

সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তুকারামের অনুপস্থিতিতে তাহার একটি মহিষ গোঁসাই মহাশয়ের বাগানে প্রবেশ করিয়াছিল। এ কারণ তিনি তাহার প্রতি যারপরনাই কটূক্তি করিতে লাগিলেন। অতঃপর একদিন মন্দিরে বহু লোকের সমাগম হওয়ায় তুকারাম গোঁসাইএর বাগানের পথ রোধকারী বেড়া ভাঙ্গিয়া ফেলেন। তাহাতে ক্রোধান্ধ হইয়া মম্বাজী একটা কণ্টকযষ্টি লইয়া তাহাকে বিষম প্রহার করে। তুকারামের সর্ব্ব শরীর ক্ষত বিক্ষত হইলেও তিনি মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন। প্রহরান্তে তিনি বিঠোবার নিকট গিয়া সকল দুঃখ নিবেদনপূর্ব্বক বলেন, প্রভু! অসতের নিকট সৎ লোক কিরূপে নিগৃহীত হয়, তাহা অদ্য আমায় জানাইলে। আমায় দৃঢ়তর বিশ্বাস ও ভক্তি দাও; যেন তোমায় না ভুলি। পাপ-কার্য্যের জন্য এই দিন হইতে মম্বাজীর গাত্রদাহ আরম্ভ হইল। তিনি বহুরূপ চেষ্টা করিলেন; কিছুতেই উহা নিরস্ত হইল না। অবশেষে তিনি রোগের উপশম কামনায় জ্ঞানেশ্বর মহাদেবের পূজা করেন। স্বপ্নযোগে মহাদেব তাহাকে জানাইলেন, "তুমি তুকার প্রতি পাপাচরণ করিয়াছ, তজ্জন্য তোমার এইরূপ কষ্ট ভোগ হইতেছে। তুমি তুকারামের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা কর। তাহার প্রসাদে তুমি রোগমুক্ত হইবে।" তখন তিনি তুকারামের নিকট ক্ষমা চাহিয়া রোগমুক্ত হন।

(ক্রমশঃ)

প্রাণের প্রাণ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যোগের অধিকারী কে? সংসার বাসনা যাহার বিলীন হইয়াছে, বিষয়ে বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে, অন্তরে যাহার অহোরহঃ মৃত্যু ভয় উপস্থিত হইতেছে, স্ত্রী পুত্র পরিবার যাহার নিকট পান্থনিবাসীর মত বোধ হয়; প্রবৃত্তি মার্গ যাহার হেয় বোধ হয়, বৈরাগ্যই অভয়প্রদ, সুখদ, মঙ্গলকর বলিয়া যাহার জ্ঞান হয়, সংসারে একমাত্র ঈশ্বরই সার, শ্রেষ্ঠ ও জ্ঞাতব্য বস্তু, এইরূপ যাহার ধারণা জন্মিয়াছে, ঈশ্বর দর্শনই মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ইহাতে যাহার স্থির বিশ্বাস হইয়াছে,

তিনিই যোগের অধিকারী তিনিই প্রকৃত যোগী। কিন্তু যাহাদিগের মন ও মুখ এক হয় নাই, ভিতরে এক প্রকার ভাব ও বাহিরে অন্যরূপ ভাব, তাহারা প্রবঞ্চক। তাহাদিগের ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকই বিনষ্ট হয়। লোকদেখান ধর্ম্ম-ভাব প্রকৃত পক্ষে আদৌ কার্য্যকর নহে। তাহারা ভোগের সুবিধাই সকল সময় অন্বেষণ করে। যখন বিপদ আপদ দুঃখ কষ্ট ইত্যাদি ঘটিয়া থাকে, তখন তাহারা ঈশ্বরের নিকট মানৎ করে, বিপদুদ্ধারের জন্য তাঁহার নিকট নানারূপে প্রার্থনা করে; স্বকৃত দুষ্কর্ম্মের জন্য কত রোদন করে, এইরূপে তাহাদিগের অন্তরে ক্ষণিক সত্ত্বগুণের উদয় হয়। আবার বিপদ উত্তীর্ণ হইলে পর তাহারা প্রায় পূর্ব্বাবস্থা লাভ করে। তাহারা সত্যের পথ পরিত্যাগ করিয়া যেরূপ পথ অবলম্বন করুক না কেন, কৃত কর্ম্মের দরুণ অনুশোচনাহেতু অন্তরে সত্ত্বের চিহ্ন ও সংস্কার জাগ্রত হয়। এইরূপে কালে তাহারা সত্ত্বের অধিকারী হইয়া থাকে। প্রকৃত সত্ত্বগুণীর বিশ্বাস রজস্তমোগুণী ব্যক্তির ভাব হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন। সত্ত্বগুণী বীরহৃদয় সত্য সন্ধ; জীবন সংগ্রামে জয়ী হইতে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পুনঃ পুনঃ অকৃতকার্য্য হইয়াও তিনি কখনও উদ্দেশ্যচ্যুত হন না। কখনই তাহার সঙ্কল্প ত্যাগ করেন না। তাহার আশা ও আত্ম-বিশ্বাসের অন্ত নাই। তিনি পর্ব্বতকে উঠাইতে চান; সমুদ্রকে শোষণ করিতে চাহেন। যাহারা সত্ত্ব গুণের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছেন, তাহারা বলেন অস্থি মাংসের এই দেহটার নাম কখনই 'আমি' নহে। অগ্নি আমাকে দহন করিতে পারে না কারণ আমিই অগ্নির মধ্যে দাহিকা শক্তি। জল আমাকে সিক্ত করিতে পারে না কারণ আমিই জলের জলীয় ভাব; বায়ু আমাকে শোষণ করিতে পারে না, কারণ আমি বায়ুর বায়ুত্ব; কোথাও আমার ভয়ের কোন কারণ নাই কারণ আমি সর্ব্বত্র বিরাজমান। দেহ বিনষ্ট হইলেও আমি কখনই বিনাশপ্রাপ্ত হই না। আমি অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ পুরুষ। আমার উদ্দেশ্য নিশ্চয় সিদ্ধ হইবে। আমাকে কিছুতেই লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারিবে না। সত্ত্বগুণী ব্যক্তি সাহস পূর্ব্বক বুদ্ধদেবের ন্যায় বলিয়া থাকেন—

মেরুঃ পর্ব্বতরাজ স্থানাৎ চলেৎ সর্ব্বং জগন্নোভবেৎ।
সর্ব্বে সত্ত্বা ভবেযুরেকমতয়ঃ শুষ্কেন্মহাসাগরো,
নত্বেব ক্রমরাজমূলোপগতশ্চাল্যেত অস্মদ্বিধঃ॥

যদি পর্ব্বতরাজ মেরুস্থানভ্রষ্ট হয়, সমস্ত জগৎ শূন্যে বিলীন হয়, আকাশ হইতে

সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র প্রভৃতি খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে পতিত হয়, এই বিশ্বে যত জীব আছে, সকলে যদি একমত হয়, মহাসাগর যদি শুকাইয়া যায়, তথাপি এই যে বৃক্ষ-মূলে আমি বসিয়া আছি, এখান হইতে কেহ আমাকে কিছু মাত্র বিচলিত করিতে পারিবে না। পুনরায় মার অর্থাৎ সয়তান যখন শ্রীবুদ্ধদেবের ধ্যানভঙ্গ করিতে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি যেমন সাহস পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, সত্বগুণী লোকও তদ্রূপ বলিয়া থাকেন :—

সর্ব্বেয়ং ত্রিসাহস্রমেদিনী যদি মারৈ প্রপূর্ণা ভবেৎ।
সর্ব্বেষাং যদি মেরুপর্ব্বতবরঃ পাণিষু খড়্গো ভবেৎ।
তে মে ন সমর্থা লোমচালিতুং প্রাগেব মাং ঘাতিতুং।
কুর্য্যাচ্চাপি হি বিগ্রহে স্ম বর্ম্মিতেন দৃঢ়ং।

এই তিন সহস্র মেদিনী যদি মারে পরিপূর্ণ হয়, আর প্রত্যেক মার যদি মেরুর মত প্রকাণ্ড খড়্গ হস্তে ধারণ করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হয়, তথাপি তাহারা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিলেও আমি যখন দৃঢ়রূপে বর্ম্মিত আছি তখন আমাকে আঘাত করা দূরে থাকুক কিছু মাত্র টলাইতেও পারিবে না। সত্য সত্যই মার তাহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিল। যাহারা সত্বগুণী তাহাদিগের অন্তরে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, অটল অধ্যবসায়, অক্লান্ত পরিশ্রম, নির্ভীক স্বভাব, অমানুষিক আত্মনির্ভরতা প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সত্বগুণ ভিন্ন আর কিসে এত শক্তি, এত গুণ, এত উপকারিতা দেখা যাইবে। যেখানে সত্ব, সেখানে বিজয়।

সত্বগুণী ব্যক্তি বলিতে পারেন :—

আয় মা সাধন সমরে দেখি মা হারে কি পুত্র হারে।
আরোহণ করেছি পুণ্য মনোরথে, ভজন পূজন দুটী অশ্ব জুড়ি তাতে॥
দিয়ে জ্ঞান ধনুকে টান, ভক্তি ব্রহ্মবাণ বসে আছি ধরে।
(ওমা) তোমার রণে, শঙ্কা কি মরণে ডঙ্কা মেরে লব মুক্তি ধন॥
(আমার) রসনা ঝঙ্কারে, কালী নাম হুঙ্কারে কার সাধ্য আমার রণে র'ন।
বারে বারে রণে তুমি দৈত্যজয়ী, এবার আমার রণে এস ব্রহ্মময়ী
(ভক্ত) 'রসিকচন্দ্র' বলে, মা, তোমারি বলে, জিনিব তোমারে সমরে॥

জীব কখনও এক দিনে সত্বগুণের চরম সীমায় উপনীত হয় না। যাহারা

ভাগ্যবান্ পুণ্যাত্মা, তাহারাই পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিবলে উক্তরূপ সত্বগুণের অধিকারী হইতে পারে। ইতর সাধারণে স্তরে স্তরে, চেষ্টা ও অধ্যবসায় বলে ক্রমশঃ উত্তম সত্বগুণী ব্যক্তি হইতে পারে। তামসিক ব্যক্তি প্রথমতঃ জড়স্বভাবাপন্ন থাকে; অপরের অনিষ্ট সাধনে, আলস্যে ও ইন্দ্রিয় সেবায় কালাতিপাত, তাহার নিকট আনন্দদায়ক বলিয়া বোধ হয়। তাহার পর তমঃ রজোগুণে পরিণত হয়। তখন মনুষ্য লৌকিক আচার, ব্যবহার ইত্যাদি পালন করে ও সম্মান প্রার্থনা করে। ক্রমশঃ তাহার উন্নতি হয়। তিনি সত্ব গুণের অধিকারী হন। তিনি সংসারের অসারতা জানিয়া মৃত্যুর ধ্রুবতা ইত্যাদি বুঝিয়া ভব-ভয়হারী ভগবানের আশ্রয় লন ও জীবকে তদুদ্দেশ্যে আহ্বান করেন। তখন তিনি বলেন:—

জীব! সাজ সমরে। ঐ দেখ কাল প্রবেশে তোর ঘরে॥
ভক্তি রথোপরি, তুলি শ্রদ্ধাতূণ, রসনা ধনুতে দিয়ে প্রেম-গুণ॥
ব্রহ্মময়ী নাম (জীবরে জপ) ব্রহ্ম অস্ত্র জ্ঞান (তাহে) সংযোগ করে।
ও মন! শীঘ্র কর বিধি তোর আছে কামাদি ঘরভেদী ছ'জন দুরাশয়।
তাদের ধৈর্য্যরজ্জু দিয়ে রাখ বাঁধিয়ে, কালের হাতে না যায় এ সময়ে।
আর এক আছে যুক্তি চাইনে রথরথী, শত্রু বিনাশিতে হবে সুসঙ্গতি।
রণস্থল যদি মা! করে "দাশরথি" ভাগীরথী তীরে॥

সংসারে পুনঃপুনঃ আঘাত পাইয়া, ভোগসুখে বঞ্চিত ও ক্লিষ্ট হইয়া জগতের নশ্বরতা সন্দর্শন করিয়া মানুষ প্রশ্ন করে, "কে প্রাণের প্রাণ? কাহাকে জানিলে অমৃতত্ব লাভ হয়?"

উপনিষদ্ বলেন, "যিনি প্রাণ বায়ুর দ্বারা জীবন ধারণ করেন না কিন্তু প্রাণকেই যিনি উৎপাদন করিয়া থাকেন, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান। তাহাকে জানিলে জীব অমৃতত্ব লাভ করিবে।"

কামস্যাপ্তিঃ জগতঃ প্রতিষ্ঠা ক্রতোরনন্ত মভয়স্য পারং।
স্তোম মহদুরুগায়ং প্রতিষ্ঠাং দৃষ্ট্বা ধৃত্যা ধীরো নচিকেত্যোঽত্যস্রাক্ষীঃ॥

যমরাজ নচিকেতাকে বলিয়াছিলেন, হে নচিকেতা কামনার সমাপ্তি, জগতের আশ্রয়, যজ্ঞের অনন্ত ফল, অভয়ের পার, স্তবনীয় বিশাল ও বিস্তীর্ণ কীর্ত্তি এক স্থিতিকে (প্রাণের প্রাণকে) দর্শন করিয়া প্রজ্ঞাবান্ তুমি এই সকলকে (কৃত্রিম সুখ দুঃখকে) ধৈর্য্যের সহিত পরিত্যাগ কর।"

শ্রীদুর্গাদাস চক্রবর্ত্তী।

"দেবতার পূজা"

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সাহেব। ব্যবসা করবে—অর্থ আছে ?

তরুণ। "দরিদ্রের সন্তান, অর্থ কোথা পাব" না হয় ভিক্ষা করবো তবু সরকারের আর দাসত্ব করবো না।

সাহেব। "তাই বল—তুমি গান্ধীর চেলা হ'তে চাও। কিন্তু জান সে পথ কি ভীষণ, কত ত্যাগ চাই সে পথে। এতটুকু শক্তি আছে তোমার যে তুমি সে পথে চলবে।"

তরুণ। "যেটুকু আছে সেটুকু ত করতে পারবো। সবাই যার যতটুকু করলেই ত হয়—এতেই একটা দেশের পক্ষে যথেষ্ট।"

সাহেব। আমার এ বিষয় একটু বলবার আছে শোন। আমার নিজের কথা যদি জিজ্ঞাসা কর তবে বলব আমি মহাত্মাজীকে দেবতার মত ভক্তি করি, কিন্তু তার পন্থা আমার পছন্দ হয় না। একটা জাতি ধীরে ধীরে তার স্বাধীনতা শক্তি শিক্ষা সব হারিয়ে দুর্ব্বল ভীরু অজ্ঞান হ'য়ে আছে। আজ এক দিনের উত্তেজনায় সে যদি একবার জেঁকেও উঠে তবু আবার সে অবসন্ন হ'য়ে পড়বে। তোমাদের চেয়ে ইতিহাস আমি অনেক বেশী পড়েছি, চাকুরীই করি আর যাই করি। এমন একটা জাতি যার গত জীবন এমন মহিমায় ভরা, আজ ত যার বুকে এত মহত্ত্ব গরিমা, সে এমন হ'য়ে আছে ভাবতে আমার কষ্ট হয়। কিন্তু তোমরা যাই বল, আমার মনে হয় এ তার নিজের অপরাধ। কেউ কাউকে অপরাধী করতে পারে না। শত্রু এসে লুঠ করতে পারে কিন্তু ঘরে জেঁকে বসে তখনই যখন তার মধ্যে কোন শক্তিই না থাকে। ইংরাজ গেলে আরেক জাত আসবে যতদিন তার প্রাণে সে চেতনা না আসে—আর তা যে দিন হ'বে সে দিন জগতে কেউ নেই যে তাকে পরাধীন করে রাখতে পারে। তবে ইংরাজ লড়ছে লড়বে, স্বার্থের জন্যে জগতে কে না লড়ছে। এতে তার দোষ নেই। তোমার শক্তি থাকে তুমি হটাবে, কিন্তু এভাবে চীৎকার করলে হ'বে কিছু? অসম্ভব। সো

তোমার শিক্ষা নিয়েছে। জাতির সে শিক্ষা আবার গড়তে হ'বে তার একেবারে ভিত্তি থেকে। যে সভ্যতা গিয়েছে সে সভ্যতার আবার পত্তন করতে হ'বে—সে সম্ভ্রম গর্ব্ব যখন জানবে, বাণিজ্য সম্পদ আপনা থেকেই জেঁকে উঠবে আর ধীরে ধীরে আপনা থেকেই পরাধীনতার শৃঙ্খল খসে পড়বে। ধীরে ধীরে দেখবে একবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবে। এই-হ'ল পথ, ধীরে ধীরে নিজের সাহিত্যে, নিজের সমাজের মধ্যে ঐ সব মুক্তির ভাবকে ফুটিয়ে তুলতে হ'বে, তবে ধীরে ধীরে তার সবই সে ফিরে পাবে। তোমরা এত হীন জান যে তোমাদের হীনতা দেখে আমরা ঘৃণা করি তোমাদের। এক ভাই আরেক ভাইকে জব্দ করতে পুলিস ডাকছে। একি সরকারের দোষ? দুই ভাই মিলে থাকতে পার না; ঝগড়া হ'লে পাঁচ জন ডেকে মীমাংসা করতে পার না, এ আমাদের দোষ? ঐ একটা উপাধির আশায় দশটা দেশের লোককে মিছিমিছি কষ্ট দেও যদি তুমি, সে দোষ কার? কোন লোক চাকরীর উন্নতির জন্য অন্যের উপর অত্যাচার যদি করে এ কি সরকারের দোষ? ব্যাং যদি সাপকে ডেকে এনে জাত ভাইদের খেতে বলে সে দোষ কার? এ রাজ্য জয়, শাসন, যা বল এ দোষ কার? সেই সব দোষ আবার সংশোধন কর। এমন ভাবে তোমরা চল দেখবে আমরাই তোমাদের কত খাতির করবো। নিত্য তোমরা একজন অন্যের নামে এক কথা এসে বল। আমরা যে তোমাদের শাসন করি শুধু আমাদের মধ্যে এ দোষ তোমরা পাবে না। অপরাধ তোমাদের নিজের এত হীনতা এত দুর্ব্বলতা যত দিন তোমাদের জাতির না যাবে, যতদিন দেশকে এতটুকু ভাল তোমরা না বাসতে পারবে, যত দিন নিজের দেশের লোককে এতটুকু ভাল তোমরা না বাসতে পারবে, যত দিন নিজের উন্নতির চেয়ে নিজের হীন স্বার্থের চেয়ে দেশটা জাতভাইটা বড় না মনে হ'বে তোমাদের এ চীৎকার শুধু বিড়ম্বনা মাত্র। সে প্রাণ কৈ যে জাতি স্বাধীন হ'বে, সে ক্ষমতা কৈ যে সে নিজের দেশ নিজে শাসন করবে। এই বলবে আমরা ত সেটুকু হ'তে দিচ্ছি না। যদি তাই হয় তবু আমাদের দোষ নগণ্য। কত স্বার্থ আমাদের আজ এদেশে। লক্ষ লক্ষ টাকা এদেশে খাটিতেছে, চাকুরী, পেন্সন, ব্যবসা এতে আমাদের কত উপকার হ'চ্ছে আমাদের পক্ষে কি সহজ যে ছেড়ে যাব? তোমরা একটা উপাধি কি একটা চাকুরীর জন্য এত হীনতা স্বীকার করতে পারবে আর আমরা একটা স্বার্থের জন্য একটু অন্যায়ই বা না করব কেন? আজ তুমি চাকরী ছাড়লে কি হ'বে? কত

চাকরে এসে জুটবে। তোমার মধ্যে যেটুকু কর্ত্তব্য জ্ঞান আছে হয়ত তা থাকবে না। তুমি দেশ-হিতৈষী, হয়ত ন্যায়বিচার কর; সে স্বার্থের জন্য দেশের ভাইদের উপর এর চেয়ে বেশী জুলুম করবে। তাতে আমাদের কি? আমাদের শাসন চলা চাই এই মাত্র। ভেবে দেখ। তোমার দরখাস্ত তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও। সাত দিন তুমি ভাব তার পর যা হবে কর। তোমাদের জাত বড় ঝোঁকে চলে—এ ভাল নয়। আর আমার মত যদি চাও, চাকরী ছেড় না; নিজের ছেলে পিলেকে ভাল শিক্ষা দেও, সে ভাবে গড়ে তুল যাতে সব দুঃখ দূর হয়। হীন স্বার্থের জন্য মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দেওয়া পাপ, ক্ষণিক উত্তেজনায় একটা যা তা করাও অন্যায়। যথেষ্ট আমাদের মধ্যে আত্ম-মর্য্যাদা জ্ঞান আছে। আজ আমার সম্মানে কেউ আঘাত করুক দেখবে চাকুরীর মায়া আমি এক মুহূর্ত্তে ছেড়ে দেব। সে শক্তি তোমাদের মধ্যে নেই। তোমাদের বিলাসিতা আছে, শ্রমসহিষ্ণুতা নেই, কিন্তু আমাদের বিলাসিতার সঙ্গেও শ্রমশীলতা ও কর্ত্তব্যজ্ঞান যথেষ্ট বর্ত্তমান। দোষ আমাদের মধ্যেও অনেক। ধর্ম্ম, জ্ঞান, পতি-ভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ, এ সব গুণ তোমাদের যা আছে, আমাদের মধ্যে তার সামান্য থাকলে আমরা ধন্য হ'তাম। কিন্তু বাস্তব জগতে স্বার্থের জগতে যে ত্যাগসহিষ্ণুতা, নিপুণতার প্রয়োজন তোমাদের সেটুকু বড় অভাব। আমরা স্বার্থ বলি জাতির স্বার্থকে আর তোমরা একের স্বার্থের জন্য দশের স্বার্থে নিজ হাতে কুঠারের আঘাত কর। ভেবে দেখবে একবার আমার কথাগুলি ?

তরুণ দরখাস্ত হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিল। অনেক ভাবিয়া একটা সঙ্কল্প সে করিয়াছিল ঠিক কিন্তু আবার সাহেবের কথায় সে সঙ্কল্পচ্যুত হইয়া পড়িল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কথার মধ্যে যথেষ্ট সত্যবস্তু ছিল আর এমন ভাবে এতগুলি কথা বলিবার স্বার্থ তার কিছুই ছিল না—শুধু তরুণের জন্যই তিনি এত কথা উঠাইয়াছেন। বাস্তবিকই তরুণের জন্য তার যথেষ্ট সহানুভূতি নতুবা এত সব কথা তিনি উঠাইবেন কেন। আর এমন সব সত্য কথা এই উপদেশের মধ্যে ছিল, যা তরুণও কখনও ভাবিতে পারে নাই। সে শুধু এক পক্ষের কথাই ভাবিতেছিল কিন্তু অপর দিকেও কত দুর্ব্বলতা কত ক্ষুদ্রান্তঃকরণতা। সে এ সবের জন্য দায়ী তা সে ভাবিতে পারে নাই। দোষ ইংরাজের আছে, যথেষ্ট আছে কিন্তু ভারত-শাসনের এ অপরাধ শুধু তাদের নয়, এদেশীয়দের? সহস্র অপরাধ

আজ সমস্যাটীকে এত জটিল করিয়া তুলিয়াছে। ভারতের পরাধীনতার বুকে মিরজাফর জয়চাঁদের যে ইতিহাস সে কলঙ্ক ত ভারতীয়দের। নিত্য স্বার্থের জন্য যে জাতির উপর নিষ্ঠুর কুঠার আঘাত এ ত জাতির নিজের কলঙ্ক। এত সব দুর্ব্বলতার সুযোগেইত ইংরাজ সেই কোথা হইতে আসিয়া এদের শাসন করিতেছে এদেরই সাহায্যে।

তরুণ আরও ভাবিল কিন্তু সহসা শত চিন্তার মাঝখানে একবার জাগিয়া উঠিল একটা মহিমাময় যুক্তি "প্রায়শ্চিত্ত"। শত পাপের আজ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। জয়চাঁদ মিরজাফরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত চাই, যুগযুগ ধরিয়া মাতৃভূমির প্রতি এই যে অন্যায় ভারতবাসী করিয়াছে, নিজের স্বার্থের জন্য জাতির মাথায় কলঙ্কপসরা তুলিয়া দিয়াছে, নিজের সুখের জন্য দেশের সম্পদ লুণ্ঠন করিয়াছে, জাত্যভিমানে অস্পৃশ্যকে শুধু দূরেই রাখিয়াছে, পশুর অধিকার দিতেও তাদের দূরে রাখিয়াছে, জাতির এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। আজ আত্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের মহাবোধন। বিলাসিতার প্রায়শ্চিত্ত আজ অৰ্দ্ধলগ্ন বেশ, জাত্যভিমানের প্রায়শ্চিত্ত আজ নিজ হাতে অস্পৃশ্যের সেবা, মাতৃভূমির প্রতি পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভূমি শয্যায় শয়ন, মাতৃনাম গাহিয়া কাঁদিয়া বুক ভাসান, স্বজাতি বিরোধ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাদের শাণিত অস্ত্র আজ বুক পাতিয়া লওয়া আর তার বিনিময়েও তাকে ভালবাসা আর ইংরাজের পাপের সহায়তার প্রায়শ্চিত্ত আজ নতমস্তকে সে দুর্ব্বলতার বিরুদ্ধে দাড়াইয়া তার বুটের লাথি মাথা পাতিয়া নেওয়া। সে বড় কঠোর, উঃ! সে বড় ভীষণ! বিলাসিতায় সে বড় হইয়াছে, এতকাল সুধু অন্যায়ই সে করিয়াছে, পরের জন্য যে কোন দিন ভাবিতে শিখে নাই। আজ একদিনে এত বড় ব্রত মাথা পাতিয়া নেওয়া বড় শক্ত! কিন্তু তা ছাড়া উপায় নাই। এ মহাপ্রায়শ্চিত্ত ছাড়া মরণোন্মুখ জাতির আর জীবন রক্ষার উপায় নাই, সেই পরিত্যক্ত জঙ্গলময় জনমানবহীন পল্লীতে আবার ফিরিয়া যাইতে হইবে সেই অসুবিধার মধ্যে মরণকে বুকে লইয়া আজ হৃতশ্রীকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে বাহুবলে, সে অন্নহীনের সঙ্গে বসিয়া তার আধমুঠ ভাতের আস্বাদনের মধ্যে আজ চিনিতে হইবে এ দুর্ভিক্ষকে। তাদেরই সঙ্গে থাকিয়া আজ তাদের প্রাণটা অনুভব করতে হবে নিজের মধ্যে। শত পতিতার আর্ত্তনাদে সামাজিক জগৎটা ভেঙ্গে

পড়ছে, তাদের ঘরে ঢুকে আজ দেখতে হবে কি ব্যাধি নিয়ে তারা সমাজের বুকে বাস করছে, ধীরে সমস্ত সমাজকে কি বিষে জর্জ্জরিত করে তুলেছে। তার পর শত শত প্রাণ তাদের জন্যে যদি কেঁদে উঠে তেমন শক্তিতে তাদের আবার তুলে ধরতে পারে তবে সুস্থ হবে সমাজ, সুস্থ হবে পল্লী, সুস্থ হবে দেশ। সে দিন বাস্তবিক দূর হবে দেশের দুঃখ। বিলাসিতার আসনে বসে যে ঝুকাঝুকি ও কিছু নয় তার মধ্যে দেবত্ব এতটুকুও নেই। সমাজের এ আলস্য আত্মসুখব্যস্ততাই যে দেশকে এত হীন অসার অশান্ত করেছে। তরুণ বুঝলে তাকে রাস্তায় নামতেই হবে নইলে চলবে না তাই সে ফিরে গেল সাহেবের কাছে।

সাহেব। " কি স্থির হইল, মন ?"

তরুণ। " হাঁ স্থির হয়েছি আমি।"

সাহেব। " বেশ কাজে যাও।"

তরুণ। হাঁ কাজের অনুমতির জন্যেই আপনার কাছে এসেছি। আমায় অনুমতি দিন।

সাহেব। হাঁ তুমি যাও তোমার দরখাস্ত ত ফিরিয়েই দিয়েছি, মন দিয়ে কাজ করগে।"

তরুণ। কাজ করতে হ'লে দরখাস্ত যে আপনাকে নিতে হ'বে আজ।"

সাহেব। "সে কি ?"

তরুণ। "কাজের জন্য প্রাণ কাঁদছে। ঐ বিলাসিতার বুকে বসে ধান কাটার মকোদ্দমা করলে আর চলছে না—প্রাণ এতে তৃপ্ত হ'তে পারছে না আজ আর তাই উন্মাদ মন বিলাসিতার কাছে সুখ সন্তোষের কাছে ছুটি চাইছে। আমাব অনুমতি দিন আমার চাকুরি ত্যাগের দরখাস্ত গ্রহণ করুন।"

সাহেব। "এ সঙ্কল্প তোমার স্থির।"

তরুণ। "হাঁ স্থির।"

সাহেব। জান যে জীবন বেছে নিচ্ছ তার মধ্যে, লাঞ্ছনা অশান্তি দুঃখ নিত্য তোমার জীবনকে বিপন্ন করবে। সহানুভূতি কোথাও তুমি পাবে না। কোথাও একমুঠ অন্ন কোন দিন জুটবে, কোন দিন জুটবে না। পরিশ্রান্ত দেহ নিয়ে হয়তো বিশ্রামের একটু ঠাঁই পাবে না।

তরুণ। সব জানি ; সব জেনে বুঝে আমি সঙ্কল্প করেছি, আমি অনেক ভেবেছি, মন আমার অশেষ লাঞ্ছনার জন্যও আজ প্রস্তুত। এই নিন আমার আবেদন পত্র। তরুণ সাহেবকে দরখাস্ত দিয়া অভিবাদন করিয়া চলিয়া আসিল। সাহেব তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। বাহিরে বিরাগ দেখাইলেও তরুণের প্রাণের আকুলতা সাহেবকে মুগ্ধ করিল। তারা বীরের জাতি, বীরত্বের মহিমা তারা বুঝে আমাদের চেয়ে বেশী।

(ক্রমশঃ)

ডাঃ অমলেন্দু কুমার সেন।
এম, ডি (হোমিও) এফ্, আর, এইচ, এস্, ইউ, এস্ এ।

সোঽহম্।

অনাদি অনন্ত আমি বিশ্বব্যাপী বিরাট মহান্ ;
মনোবুদ্ধি চিন্তাতীত সর্ব্বভূতে আমি মহাপ্রাণ।
স্রষ্টা আমি, পাতা আমি, রুদ্ররূপী আমি মহাকাল ;
প্রলয়ে আবর্ত্ত আমি জলধির তরঙ্গ উত্তাল।
মহাঘোর তমোরাশি হুহুঙ্কারী ক্ষিপ্ত প্রভঞ্জন ;
উন্মত্ত ভৈরব আমি, সর্ব্বত্রাসি অশনি গর্জ্জন।
জন্মমৃত্যু শাস্তা আমি, ক্ষিতি,অপ্, তেজ, বায়ু, ব্যোম,
চিদ্ঘন আনন্দ রসে মগ্ন সদা সোঽহম্ সোঽহম্।

রমণীর প্রেম আমি, শুদ্ধতায় সতীশিরোমণি,
পুত্রক্রোড়ে মাতা আমি, বাৎসল্যের সুগভীর খনি।
পালক জনক আমি, বন্ধুবর পুত্র, সহোদর,
রাজা, প্রজা, ভদ্র আমি, আশ্রিতের বিনীত কিঙ্কর।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পুনঃ অশিক্ষিত আমি নিরক্ষর,
যবন, চণ্ডাল আমি, নীতিহীন অসভ্য বর্ব্বর।
বহুরূপী আমি "সেই" দেব হ'তে ক্ষুদ্র কীটাধম ;
সচ্চিদ আনন্দ রূপে, এক আমি সোঽহম্ সোঽহম্।

পাপী, দস্যু, দ্বেষী আমি, স্বার্থপর কিবা আমি নই ;
যোদ্ধ্‌বেশে রণস্থলে, বীরবাণী আমি সেই মাভৈঃ।
প্রচণ্ড মরুভূ আমি, মহারণ্য, উচ্চ হিমাচল ;
অগ্নিগিরি যমরূপী মুহুর্মুহু উগারি অনল।
গিরিশৃঙ্গচূর্ণকারী খরস্রোতা আমি প্রবাহিত;
অমঙ্গলে ধূমকেতু মহাকাশে হই সমুদিত।
মহামারী, শনি, রাহু, জ্যোতির্ম্ময় রবি, তারা, সোম ;
রাক্ষস, দানব আমি, ব্রহ্মরূপী সোঽহম্ সোঽহম্।

জ্যোৎস্না প্লাবিত আমি, বসন্তের প্রকৃতি উজ্জ্বল ;
বিহঙ্গ-কূজন আমি, বিরহীর হৃদয় চঞ্চল।
প্রসূনে সৌরভ আমি, সুখস্পর্শ মলয়পবন ;
ভ্রমরচুম্বিত শুভ্র বিকশিত কমল কানন।
মর্ম্মভেদী পুত্রশোক, অনাথের আমি আঁখিজল ;
কবিত্বের ছন্দ, রস, বেদমন্ত্র আমি যে সকল।
সেবা, শ্রদ্ধা, সম, দম, তপশ্চর্য্যা আমি সে সিদ্ধাই ;
শুদ্ধ, শান্ত ত্যাগীশ্বর, শিবরূপী কোথা আমি নাই !

কে আমি, কি আমি বস্তু, কোথা ব'স এই চরাচরে ?
স্তিমিত নয়নে তুমি পাবে দেখা আপন অন্তরে !
স্বর্গবাসী নহি দেব, যক্ষ প্রেত, গন্ধর্ব্ব কিন্নর ;
মোক্ষ, মুক্তি, যজ্ঞ, তপ, নহি আমি দেহধারী নর।
জ্ঞান, গুণ, সীমা, কাল রূপাতীত স্বরূপ আমার ;
কালের আদিতে ছিনু, আছি এবে, রহিব আবার।
শাশ্বত অব্যয় আমি, আদি কবি, আদি বাক্য ওম্ ;
সর্ব্বভূতে বিরাজিত চিদানন্দ সোঽহম্ সোঽহম্।

—০:(*):০—

ব্রহ্মচারী নির্ম্মলচৈতন্য।

হিমালয়ে

মুনিঋষি বন্দিতচরণ চিরতুষারময় হিমালয় দর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে অনেক দিন যাবৎই ছিল, শুধু সুযোগ সুবিধার অভাবে এতদিন তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। কল্পনার নেত্রে প্রকৃত জগতের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্যের আভরণে তাঁহাকে সাজাইয়া দেখিয়াছি, বিরাট অনন্তের সবগুলি উপকরণ লইয়া তাঁহার চরণে নৈবেদ্য দিয়াছি, সর্ব্ব প্রকার কঠোরতা ও বিভীষিকার সঙ্গেও তাঁকে চিন্তা করিয়াছি কিন্তু স্বচক্ষে হিমালয় দর্শনের পর স্বতঃই মনে হইতেছে কল্পনা ও বাস্তব কত তফাৎ।

দিনের পর দিন শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে চলিতে চলিতে কখন কখন ভীষণ নদী, কখনও বা সমুন্নত বিরাট পর্ব্বত দর্শনে, কখনও বা শ্যামল প্রান্তর, পার্ব্বত্য গ্রাম বা তুষারময় পর্ব্বত শৃঙ্গে তাঁর ঐশ্বর্য্য চিন্তা করিয়া বিভোর হইয়াছি। তখনকার মত ক্ষুদ্র মান অভিমান, ক্ষুদ্র আবেষ্টনী তথা এই নগ্ন আমিত্ব যেন কোথায় চলিয়া যায়। গতানুগতিক জীবনের এই আমূল পরিবর্ত্তনে কি জানি কোথা হইতে ধৈর্য্য ধরিয়া সামনে চলিবার শক্তি পাওয়া যায়। তাই দেখিতে পাইয়াছি বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, যুবক, যুবতী, ছেলে, মেয়ে, ধনী দরিদ্র সকলেই চলিয়াছে। নানা প্রকার অসুবিধা, নূতন জীবনের অনভ্যস্ততার সঙ্গীরূপে বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া তাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। যাঁহাদের নিতান্ত চলিতে অক্ষম মনে করিয়াছি, যে সব পুরললনা কখনও রাস্তায় বাহির হয় নাই, আজ কাহার ভরসায় কোন মধুর অনুপ্রেরণায় প্রাণে অতুল বিশ্বাস সম্বল করিয়া তাঁহারা চলিতেছেন। যাত্রা পথের কষ্ট, দুরত্ব শেষে আনন্দ লাভের সহায় হইয়াছে।

নূতনকে দেখা ও ভীষণের সম্মুখীন হওয়ার আগ্রহ সকলের মধ্যেই রহিয়াছে; তাই সুযোগ পাইলে সকলেই সেই অনিশ্চিতের মধ্যে ঝাঁপ দিতে চায়, লাভালাভের বিচারের সময় ও মনোবৃত্তি তাহাদের থাকে না। তাই দেখিয়াছি সব বয়সের, সব ভাবের, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসী যাত্রী সমস্বরে "জয় কেদারনাথ, জয় বদরী-বিশাল, জয় পশুপতিনাথ, জয় অমরনাথ, জয় মণিমহেশ, জয় কৈলাসপতি হর হর বম্ বম্" রবে চারিদিকের পর্ব্বতমালা মুখরিত করিয়া পরস্পর পরস্পরকে উৎসাহিত

করিয়া তুলিয়াছে। প্রত্যেকেরই হৃদয় যেন সহানুভূতিতে পূর্ণ এবং সবাইকে আপন করিয়া লইতে ব্যস্ত। জানি না কেন এরূপ হয়, হয় ত বা হিমালয়ের বৈরাগ্যপ্রদ স্পর্শে হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা দূরে চলিয়া যায়।

কত দৃশ্যই না দেখিয়াছি। "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং" এর সমাবেশ এমন কোথাও আছে কি? কোথাও বরফময় পর্ব্বতশৃঙ্গে কাঞ্চনকিরীটিনীরূপে চণ্ডীর অবস্থানে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রভাত সূর্য্যনারায়ণছটায় কত আভরণে তাহার শুভ্র দেহ সাজাইয়া দিয়াছে, সে না দেখিলে উপলব্ধি হয়না। ভাষায় তাহার বহুরূপ ব্যক্ত করা যায় না; গঙ্গা "হর হর" রবে শৈলেশ্বরের পাদমূলে ঢলিয়া পড়িতেছেন। বিরাট ভাবে দিকবসনা প্রকৃতি; তাঁহার উপাসনার উদারতা, আত্মনিবেদন কি মহান্ ছবি! বিরাট গম্ভীরে হিমাচলের প্রশান্ত মূর্ত্তি শৃঙ্গে শৃঙ্গে তুষারস্তূপে প্রভাত রবির কাঞ্চনছটা বিগলিত করুণার নির্ঝরোচ্ছ্বাস, অতীন্দ্রিয় সুষমার শ্যাম শোভা তীর্থ যাত্রীর প্রাণে কি অপূর্ব্ব ভাবের উদ্রেক করে। অসীম অনন্তের আভাসে আনন্দের প্লাবনে দ্রবীভূত হৃদয় আত্মহারা হয়। অনিশ্চিতের যাত্রী নর নারী ব্যাকুল নেত্রে চারিদিক তাকাইয়া দেখে সকলেই যেন সেই বিরাটের পাদপদ্মে আপনাকে পরিপূর্ণ ভাবে বিলাইয়া দিতেছি। ব্যষ্টি মানবমন যেন তাঁকে সেই ভাবে হৃদয়ার্ঘ্য নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া কৃতার্থ হয়—এ যেন তাঁহারই ইঙ্গিত। ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

ব্রহ্মচারী জ্ঞান

সার্থকতা

বুনো ওল কলাগাছে ডাকি কহে "ভাই
তোমার কি দেহবুদ্ধি একেবারে নাই,
পত্র পুষ্প দেহ কাটে, নির্ব্বাকারে সহ।
আমি কত সুখে রই দেখ মোর দেহ।"

কদলী কহিছে ভাই কি ফল দেহেতে?
যে দেহ লাগে না কোন পরহিতব্রতে,
পর উপকারে যদি যায় নিজ প্রাণ
তার চেয়ে ধরামাঝে আছে কি সম্মান?"

—০:(*):০—

—হংস—

অক্রুর সংবাদ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(বর্ণনা।)

আনন্দ প্রদান করি মায়ের অন্তরে।
কারাগার হতে মুক্ত করেন সবারে ॥
মাতামহ উগ্রসেনে আনিয়া যতনে।
বসাইল মথুরার রাজসিংহাসনে ॥
উগ্রসেন আনন্দিত হইয়া তখন।
বলে কৃষ্ণ এই রাজ্য তোমার এখন ॥
দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন।
তোমা বিনা কে করিতে পারিবে এমন ॥
যদুবংশে তোমা সম কেবা আছে আর।
নিশ্চিন্ত হইয়া যারে দিব রাজ্য ভার ॥
দিতেছি তোমারে আমি আনন্দিত মনে।
রাজদণ্ড লয়ে করে বস সিংহাসনে ॥
কৃষ্ণ বলে পুত্র তব মোহে অন্ধ হয়ে।
নিয়াছিল রাজ্য তব বঞ্চিত করিয়ে ॥
মথুরার তুমি রাজা জানে সর্ব্বজনে।
কেমনে বসিব আমি সেই সিংহাসনে ॥
তবে আমি অনুগত হইয়া তোমার।
করিব সকল কার্য্য যাহা সদাচার ॥
যদুবংশ কীর্ত্তি আমি করিতে অক্ষয়।
শাসন করিব রাজ্য জানিও নিশ্চয় ॥
উগ্রসেন বলে ধন্য মহিমা তোমার।
গতি মুক্তি দাতা তুমি জানিহে আমার ॥

যেবা ইচ্ছা কর তুমি হইয়া সদয়।
দেখ যেন মোরে কভু হওনা নিদয় ॥
এই বলি উগ্রসেন ধরিয়া করেতে।
বসাইল কৃষ্ণে লয়ে আপন পার্শ্বেতে ॥
দেখিয়া মথুরাবাসী আনন্দে মগন।
কৃষ্ণের মহিমা গান করে সর্ব্বজন ॥
দেবতারা পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিল।
আনন্দ সাগরে সবে নিমগ্ন হইল ॥
কৃষ্ণ বলরামে রাখি মথুরা নগরে।
ফিরিয়া আসিল নন্দ বিষণ্ণ অন্তরে ॥
ব্রজবাসী এই কথা যখন শুনিল।
শোকসিন্ধু মাঝে সবে নিমগ্ন হইল ॥
দিনে দিনে কত দিন এল আর গেল।
তথাপি রাধার কৃষ্ণ ফিরিয়া না এল ॥
নিকুঞ্জে বসিয়া রাই লয়ে সহচরী।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কাঁদে দিবস শর্ব্বরী ॥
সখীরা আকুল প্রাণে কতই বুঝায়।
প্রবোধ না মানে রাধা কাহার কথায় ॥
রাধার নয়নজলে ধরা ভেসে যায়।
সদা বলে কেন কৃষ্ণ ত্যজিল আমায় ॥
কখন ধরিয়া গলে বলে সখীগণে।
কৃষ্ণহীন হয়ে সখী কি ফল জীবনে ॥
মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব।
কৃষ্ণহীন হয়ে প্রাণ কভু না রাখিব ॥

শ্রীরাধার উক্তি :—

পদাবলী

সখি কালি বলি কালা গেল মধুপুরে
সে কালের কত বাকি।
যৌবন সায়রে পড়িতেছে ভাঁটা
তাহারে কেমনে রাখি॥
জোয়ারের জল নারীর যৌবন
গেলে না ফিরিবে আর।
জীবন থাকিলে বঁধুরে পাইব
যৌবন মিলন ভার॥
যৌবনের গাছে না ফুটিতে ফুল
ভ্রমর উড়িয়া গেল।
আমার যৌবন বিফলে গোঁয়ানু
বঁধু ফিরে নাহি এল॥
যাও সহচরি জানিয়া এসহ
বঁধুয়া আসে কি না আসে
সেই নিঠুরের পাশ আমি যাই চলি
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে

মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব।
বঁধুর বিচ্ছেদ আর সহিতে নারিব॥
জনমে জনমে হোক সে পিয়া আমার।
বিধি পদে মাগি আমি এই বর সার॥
হিয়ার মাঝারে মোর রহি গেল দুখ।
মরণ সময়ে পিয়ার না দেখিনু মুখ॥
গোবিন্দ দাসিয়া কয় চরণেতে ধরি।
এখনি মিলিবে আসি তব প্রাণ হরি॥

—০:(*:০— (ক্রমশঃ)

বিজয় কুমার।

(১)

পল্লী প্রকৃতির লীলাভূমি ক্ষুদ্র রমানাথ পুরের একপ্রান্তে শান্তিপ্রিয় মুখুর্য্যে পরিবারের বাস। এই পরিবারের একটী সন্তান শ্রীমান্ নরেন্দ্র নাথ অল্পবয়সেই পিতৃবিহীন হইয়া এতাদৃশ দুরবস্থায় পড়িয়াছিলেন যে তাঁহাকে উচ্চ শিক্ষা হইতে বিরত হইয়া মাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়াই চাকুরীর আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। তিনি ধীরপ্রকৃতি অবহিতচিত্ত ও কার্য্যকুশল। অল্পকাল মধ্যেই চাকুরীতে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। চাকুরীর এক বৎসর পরেই রমানাথ-পুরের সন্নিকটে নবগ্রামের অতুল চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা স্বভাবকোমলা চিরহাস্যময়ী ইন্দু বালার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কালক্রমে নরেন্দ্র নাথের নবম বর্ষীয় একটী কন্যা ও দুইটী শিশুপুত্র হইল। কন্যাটীর নাম "জয়ন্তী"; সেও মাতার ন্যায় সরলা কোমলা।

বাসন্তী উষার কোমল রাগরঞ্জিত শ্যাম কানন নীহারসিক্ত ক্ষুদ্র কোমল মল্লিকা কোরকের ন্যায় নরেন্দ্র নাথের আনন্দবাসোদ্ভাসিত শান্তিপূর্ণ ভবনে জনক জননীর স্নেহাশ্রুসিক্তা আভাময়ী জয়ন্তী হাসিয়া খেলিয়া হেলিয়া দুলিয়া বিরাজ করিতেছে। বালিকার কমনীয় মুখমণ্ডল দেখিলে শরতের শুক্লাষ্টমীর অর্দ্ধ চন্দ্রমা দেখিতে আর ইচ্ছা হয় না। বালিকার কুঞ্চিত অলকনিচয় ক্ষুদ্র ললাটদেশ চুম্বন করিয়া মৃদু সমীরণে ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে। প্রতিবেশিনী বালিকার মুখ মাধুরী দেখিবে কি মনোহর অঙ্গ সৌষ্ঠব দেখিবে স্থির করিতে না পারিয়া বালিকাকে দেখিবা মাত্র ছুটিয়া গিয়া কোলে করিয়া মুখ চুম্বন করে।

(২)

চন্দ্র মাধুরী ও ফুল সুষুমায় বালিকার লাবণ্য সৃষ্টি হইয়াছে। তাই বুঝি বালিকা এত চন্দ্র-কুসুম-প্রিয়া। তাহাদের বাটীর সম্মুখস্থ আম্র কাননের অন্তরাল হইতে যখন রজত কিরণ ছটা আকাশে ছড়াইয়া পড়িয়া তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তখন তাহার আনন্দের সীমা থাকে না। সে প্রফুল্লমুখে প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়ায় ও আম্র কাননের পশ্চাতে আকাশের দিকে অনিমেষনয়নে চাহিয়া থাকে। আবার যখন

সেই চন্দ্ররশ্মি অকস্মাৎ সমুদিত মেঘভরে ভীত হইয়া পলাইতে থাকে, তখন বালিকার মুখমণ্ডলের মাধুরীও কোথায় চলিয়া যায়। জয়ন্তী চন্দ্রের ন্যায় ফুলকেও বড় ভালবাসে। সে তাহাদের বাগানের এক প্রান্তে একটী ক্ষুদ্র পুষ্পকানন নির্ম্মাণ করিয়াছে। তাহাতে সে প্রত্যহ অপরাহ্নে দুটী সহোদরের সহিত যত্ন করিয়া সুকুমার বৃক্ষমূলে জল সেচন করে। তাহার সুকোমল কররোপিতা মল্লিকা মুকুলিতা হইয়াছে। তাহা দেখিয়া সে আনন্দে অধীর; উহাদের বাগানের একদিকে একটী নাতিবৃহৎ বকুলবৃক্ষ আছে। আজকাল তাহার অনেক ফুল চতুর্দ্দিকে বায়ুমণ্ডল আমোদিত করিয়া বৃক্ষমূলে নীরবে পড়িতেছে। ক্ষুদ্র কানন বাটিকায় জল সেচন সমাপ্ত হইলে পর জয়ন্তী সেই সকল বকুল ফুল সাদরে অঞ্চলে কুড়াইয়া লইয়া বাটীতে আনে এবং অলিন্দে বসিয়া ছোটভাই দুটীর সহিত তিন ছড়া মালা গাঁথে, গাথিয়া দুছড়া তাহাদের গলায় পড়াইয়া দিয়া অবশিষ্ট ছড়া নিজের খোঁপায় জড়াইয়া দেয়। এইরূপে নিজের ক্ষুদ্র সহোদর দুটী ও প্রতিবেশিবর্গের শিশু পুত্রকন্যাগণের সহিত ধুলাখেলা করিয়া চাঁদ ও ফুল লইয়া জনকজননীর স্নেহোপচিত সুকুমারী জয়ন্তীর মধুর বাল্যজীবন কাটিতে লাগিল। কিন্তু তা বলিয়া তাহাকে সাধারণ পল্লীবালার ন্যায় নিরক্ষরা করা হয় নাই। তাহার মাতা প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে গৃহকর্ম্মাবসানে কন্যাকে একটু একটু লেখা পড়া শিখাইতেন। বুদ্ধিমতী জয়ন্তী অতি অল্পদিনের মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারত পড়িতে শিখিয়াছিল।

নরেন্দ্রনাথের বাটীর নিকটেই শ্যামধন চট্টোপাধ্যায়ের বাটী। শ্যামধন বাবুকে কলিকাতায় চাকুরী করিতে হয় না। তাঁহার যে সামান্য ভূসম্পত্তি আছে, বুদ্ধি ও পরিশ্রম প্রয়োগে নানাবিধ শস্যের আবাদ করাইয়া তাহা তিনি এরূপ আয়কর করিয়া তুলিয়াছেন, যে তাহাতে তাঁহার সংসার বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়। দুঃখের বিষয় তিনি নিঃসন্তান। তাঁহার স্ত্রী স্থূলাঙ্গী সারদা পুত্ররত্ন প্রাপ্তি মানসে নানা বার ব্রত পূজা প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিয়াও বিফলকামা হইয়া শেষে কণ্ঠে ও বাহুতে কতকগুলি মাদুলী ধারণ করিয়া বসিয়াছেন।

শ্যামধন বাবুর পোষ্যবর্গ অতি অল্প; তাঁহার বিধবা ভগ্নী যোগমায়া ও তৎপুত্র বিজয় কুমার। উচ্চ ধনী কুলেই যোগমায়ার বিবাহ হয়। কিন্তু অভাগিনী যখন আটমাস অন্তঃসত্ত্বা, তখন তাঁহার স্বামী তাঁহাকে দারুণ বৈধব্যানলে নিপাতিত করিয়া পরলোক গমন করেন। একমাত্র সহোদরা এইরূপ অচিন্ত্য আকস্মিক বিপৎপাতে শ্যামধনবাবু সাতিশয় মর্ম্মাহত হন এবং সত্বরেই তাঁহাকে নিজ আলয়ে আনয়ন করেন।

যোগমায়া মহাষ্টমীর দিনে বিধুবদন এক পুত্ররত্ন প্রসব করে; অভাগিনী পুত্রমুখ দর্শন করিয়া দারুণ প্রসব বেদনা দূর করিতে না করিতে প্রসবাশাঙ্কায় এতদিন অবরুদ্ধ পতিশোক হৃদয়ে শতগুণ জ্বলিয়া উঠিল। অশ্রুধারা নব প্রসূতির গণ্ডদেশ আর্দ্র করিয়া দরদর পড়িতে লাগিল। "কোথায় তুমি একবার দেখতে আসবে না" এই বলিয়া যোগমায়া পাগলিনীর ন্যায় ভূমিতে পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। পরে নবপুত্রের নবীন মায়াপাশে অভাগিনী শীঘ্রই সংজড়িতা হইয়া নিদারুণ পতিশোকানল হৃদয়ে কোনরূপে চাপিয়া রাখিলেন। এইরূপ অভাগিনী মায়ের একমাত্র অঞ্চলের নিধি বিজয়কুমার নিরুদ্ধ বজ্রবিকাশস্তম্ভিত বর্ষাগগনকোলে উদীয়মান সুখদর্শন শশধরের ন্যায় যোগমায়ার অবরুদ্ধ পতিবিয়োগ শোক হৃদয়তটে বিরাজ করিতে লাগিল।

শিশু বাড়িতে লাগিল। কিন্তু শিশুকাল হইতে তাহার আকৃতি ও ভাবভঙ্গিতে এক অলৌকিক বিচিত্রতা দেখা দিল। শিশু কাঁদিলে যে কেহ তাহাকে লইয়া একবার প্রাঙ্গণে গিয়া দাঁড়াইলে সে কথা ভুলিয়া যাইত; তখন সে নীল আকাশের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত। শিশুর ক্রমশঃ জ্ঞানবৃদ্ধি হইলে তাহাকে প্রায়ই বাহিরে থাকিতে, উর্দ্ধে আকাশের দিকে চাহিয়া কি এক অব্যক্ত ভাষায় আলাপ করিতে দেখা যাইত। শিশুকে কোন কিছু আহার্য্যদ্রব্য দিলে সে তৎক্ষণাৎ বাহিরে গিয়া অন্য কোন শিশুকে আনন্দের সহিত তাহার অধিকাংশ প্রদান করিত; আর কাহারও দেখা না পাইলে দৃষ্টিপথ পতিত যে কোন পশুপক্ষীর দিকে কিছু কিছু নিক্ষেপ করিত। চার পাঁচ বৎসরের শিশু একদিন মার সঙ্গে নিকটস্থ দীঘিতে স্নান করিতে গিয়াছিল। মা শিশুকে স্নান করাইয়া নিজে স্নান করিতে লাগিলেন; শিশু সোপানে দাঁড়াইয়া পুষ্করিণীর বৃক্ষগুল্মাচ্ছাদিত তটদেশ ও সূর্য্যকরোজ্জ্বল আকাশ অচঞ্চল নয়নে দেখিতে দেখিতে হঠাৎ এক অস্ফুট কাতরধ্বনি শুনিতে পাইল।

ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পার্শ্বভাগে দেখিতে পাইল যে একটী পক্ষিশাবক তটস্থ গুল্ম হইতে জলে পড়িয়া গিয়া মুমূর্ষু প্রায় হইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে। তৎক্ষণাৎ বালক জলে নামিতে লাগিল, কিন্তু তাহার অবতরণের নিমিত্ত জল সঞ্চালন উপস্থিত হওয়ায় বিহঙ্গম শিশু ক্রমেই দূরে অপসারিত হইতে লাগিল। বালকের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। সে কেবল পক্ষী লক্ষ্য করিয়া নামিতে লাগিল। অবশেষে শ্রবণমূলচুম্বিত জলে গিয়া পক্ষীকে ধরিয়া ফেলিল। কিন্তু এখন সে নিজে মগ্নপ্রায়। শুভাদৃষ্টক্রমে, ছেলে সোপানে দাঁড়াইয়া আছে কিনা, দেখিবার জন্য জননী সে দিকে মুখ ফিরাইলেন কিন্তু

দেখিতে না পাইয়া অধীরা ও ভয়াকুলা হইয়া ইতঃস্তত চাহিতে লাগিলেন ; দেখিলেন পক্ষিশাবকবদ্ধমুষ্টি একটী ক্ষুদ্র হস্ত জলের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে অন্তর্লীন মধুকর কমল কোরকের ন্যায় কম্পিত হইতেছে। "কে কোথায় আছ শীঘ্র এস, পোড়া কপালীর কপাল ভেঙ্গেছে" এই বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে সত্বর আসিয়া হতভাগিনী যোগমায়া সন্তানকে তদবস্থায় জল হইতে তুলিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে লোক ছুটিয়া আসিতে লাগিল। শিশুর তখন চৈতন্য লোপ হইয়াছে ; কেবলমাত্র ক্ষীণ নিশ্বাস নাসারন্ধ্রে প্রবাহিত হইতেছে। তৎক্ষণাৎ বিজ্ঞ ডাক্তার আনাইয়া নানা উপায়ে শিশুর জ্ঞান সঞ্চার করা হইল। শিশু চাহিয়া কথা কহিতে পারিয়াই কাঁদিয়া বলিল "পাকি কোতা।" সমাগত গ্রামবাসী এই অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়া অতীব বিস্মিত হইয়া নানা কল্পনা জল্পনা করিতে লাগিল। কেহ কেহ বলিল "এটী কোন শাপভ্রষ্ট দেবকুমার ;" কিন্তু অধিকাংশ লোকই বলিল "এটী পরে উন্মত্ত ও চঞ্চল হইবে, সংসারের কোন কাজেই আসিবে না।" যাহা হউক এই প্রকার দু' একটী অদ্ভুত ঘটনায় শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের উদার কর্ম্মপট উন্মেষিত হইতে লাগিল। ক্রমেই বালকের চক্ষে কি এক অপূর্ব্ব ভাব সমাবেশ হইতে লাগিল ; হৃদয়ে যেন প্রেমতুষার সঞ্চিত হইতে লাগিল ; বুঝি বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান রবিকরে তাহা দ্রবীভূত হইয়া করুণা মন্দাকিনীতে জগৎ প্লাবিত করিবে। অভাগিনী জননী ব্যাকুলা হইয়া পুত্রের মঙ্গল কামনায় ভগবানকে অন্তরের সহিত ডাকিতে লাগিলেন। আত্মীয় স্বজন নানা রক্ষা কবচ ঔষধাদি শিশুর কণ্ঠে পড়াইয়া দিলেন।

অজ্ঞ মানব! তোমার স্বার্থকলুষিত জীবনে নিঃস্বার্থ প্রতিমা ধারণ করিতে পারিবে কেন? তোমার শত মায়াপটাবৃত নয়নে কি দেববিভা প্রতিফলিত হইতে পারে?

(ক্রমশঃ)

পরিব্রাজক।



ভারতের জাতীয় জীবন

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যে জাতি একদিন সমস্ত জগতের আদর্শ শিক্ষা, দীক্ষা, সাধনার স্থল ছিল, যাহার সৌভাগ্য, বিদ্যা, সদ্‌গুণরাজির কণিকামাত্র অন্যান্য জাতির ভাগ্যবিধানে সমর্থ হইয়াছিল, এখন সে শ্রীহীন-ধর্ম্ম-শান্তি-সুখ-বিচ্যুত হইয়া পড়িল। অবহেলার অনুযায়ী অধঃপতন তাহাকে গ্রাস করিল। রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় ভারতের ভারতত্ব লোপ পাইল। তার শ্রী সম্পদ বিদ্যা বুদ্ধি সাগরের অতল প্রদেশে নিমজ্জিত হইল। চতুর্দ্দিকে মর্ম্মভেদী হাহাকার, আর্ত্তনাদ ইত্যাদিতে প্রতিধ্বনিত ভারতের জাতীয় শক্তি ও গৌরব আত্মকর্ম্মদোষে, গৃহবিবাদ, ধর্ম্ম বিপ্লব ইত্যাদি কারণে ক্ষীণতর হইল। আত্মরক্ষা, সমাজ সংস্কার, অভাব মোচন ইত্যাদি বিষয়ে ভারত অক্ষম হইল। সুবিধা বুঝিয়া বিদেশীগণ একে একে ভারত ভূমিতে পদার্পণ করিতে লাগিল। ভারতের তাৎকালিক বাণিজ্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে আরব পারস্য ইত্যাদি অন্যতম। সেই সময় প্রতীচ্য জাতি ভারতে বাণিজ্য লালসায় পদার্পণ করিল এবং বাণিজ্যকালে তাহারা সমগ্র ভারত জয় করিয়া বসিল। তাহাদিগের উচ্চতর শক্তির নিকট ভারতের বিভিন্ন জাতিসমূহ একে একে পরাভূত হইল। বিদেশীগণ সুচারুরূপে দেশ-শাসন করিবার যত্ন করিলেও তাহাদিগের কর্ম্মচারিদিগের স্বার্থপরতায় দেশে অশান্তি উৎপন্ন হইল। অবশেষে প্রজাকুল বণিক্‌সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মস্তক উত্তোলন করিল। প্রতীচ্য শক্তি কম্পিত হইল। অধর্ম্ম ও অবিচারের প্রতীকারকল্পে প্রতীচ্য রাজশক্তি বণিককুল হইতে ভারতের শাসনভার কাড়িয়া লইলেন এবং সাম্য, মৈত্রী ও ন্যায়ের উপর রাজ্যানুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলেন। ইহাতে ভারতের জাতীয় শক্তি কেন্দ্রীভূত হইল বটে কিন্তু অধঃপতন নিরুদ্ধ হইল না। জাতি আপন পথে সংযতভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল।

ভারতের অধঃপতনের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, ভারত অবনতির কারণ— দেশবাসিগণের বলবীর্য্যের অভাব নয়, ইহা তাহাদিগের বিদ্যাবুদ্ধির অপ্রতুলতার দরুণ নয়, ইহা তাহাদিগের অর্থাভাব, অনুন্নত আর্থিক সামাজিক ইত্যাদি অবস্থার জন্যও নহে, পরন্তু ইহার কারণ অন্যত্র নিহিত। ইহা দেশের ধর্ম্মে

শিথিলতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যখন বিদেশীগণ দেশে পদার্পণ করেন, যখন তাহারা দেশবাসিগণের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন, তখন দেশে আদৌ অর্থাভাব, অন্নাভাব জ্ঞানচর্চ্চাভাব বিদ্যমান ছিল না। দেশবাসিগণ বিজেতাগণ অপেক্ষা কোন অংশে হীনবীর্য্য ছিলেন না। ইতিহাস এবিষয়ে জ্বলন্ত সাক্ষ্য দান করিতেছে। ইতিহাসে দেখা যায়, স্বার্থপরতা, অর্থলোলুপতা, বিশ্বাসঘাতকতা, এইগুলি দেশবাসীর অবনতির ও স্বাধীনতানাশের কারণ। এই অস্বাভাবিক ভাবসমূহ কিরূপে ভারতের মনে প্রবিষ্ট হইল ? কেন এবং কোথা হইতে এই সকল দোষ ভারতের ঘরে ঘরে আধিপত্য বিস্তার করিল, ইহার কারণ কি ? ইহার একমাত্র কারণ ধর্ম্মে শিথিলতা, ধর্ম্মানুশাসনে জীবন যাপন করিতে ঊদাসীনতা। ফলে বিলাসিতা, ভেদাভেদ, স্বার্থবুদ্ধি ইত্যাদি নিকৃষ্ট দোষরাজির আধিপত্য বিস্তার। এইসকল কারণে ভারতে ভিন্ন জাতি প্রায়শঃ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে ও তাহাদের ভাবে ভারত কতকাংশে অনুশাসিত হইয়াছে কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ভারতের উপর দিয়া বিজাতীয় ভাবগুলি প্রবাহিত হইলেও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিজেতাগণের ধ্বংসের পর বহুকাল অবধি ভারত স্বায় অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। ভারতের জাতীয় ভিত্তি এখনও অচল অটল, অজেয়, হিমাচলের ন্যায় দুরতিক্রম্য। ইহার উপর অনেক ঝঞ্ঝাবাত আঘাত করিলেও বর্ত্তমান হীনাবস্থায়ও ভারত তাহার স্বতন্ত্রত্ব রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে। কালপ্রভাবে ভারতজাতির লোপ হইবে কি না জানি না, তবে ইহার অপরিবর্ত্তনশীল দৃঢ় ভিত্তির কথা স্মরণ করিলে যুগপৎ হৃদয়ে হর্ষ ও বিস্ময় উৎপন্ন হয়। মনে হয়, ইহা ভগবানের সৃষ্টি। ইহার পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী এবং ভবিষ্যৎ অবনতি বর্জ্জনের নিমিত্ত আধুনিক অবনতি এক উপাদেয় সৎশিক্ষা। ইহা ভারত কখনও ভুলিতে পারিবে না। ইহা তাহাকে অভিজ্ঞতা প্রদান করিয়া সতত সৎমার্গে বিচরণ করাইবে।

অতীত ইতিহাসের জ্বলন্ত ও সুস্পষ্ট প্রমাণ দর্শন করিয়াও যাহারা ভারতের ধর্ম্মকে বাদ দিয়া, জাতীয় বৈশিষ্ট্য ভুলিয়া যাইয়া জাতিকে উন্নত করিবার চেষ্টা করেন, তাহারা বিষম ভ্রমাত্মক। প্রতীচ্যের নবীন সভ্যতা, ভোগবাসনা রাজনীতি ইত্যাদির চাক্‌চিক্য তাহাদিগের নয়ন ঝলসিয়া দেয়। তাহারা হিতাহিত জ্ঞানবর্জ্জিত হইয়া ঐরূপ মত পোষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু ভোগ-বাসনা রাজনৈতিক মত আন্দোলনের মধ্য দিয়া ইহার লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করা

সম্ভবপর নয়। প্রত্যেক জাতির একটী বিশেষত্ব আছে, উহা তাহাকে অন্য জাতি হইতে পৃথক্ করে। উহাই তাহার জাতীয়ত্ব। তাহার জাতীয়ত্বের বিকাশ না করিয়া পরানুকরণে কখন তাহার উন্নতি লাভ সুসাধ্য নহে। প্রতীচ্যের পক্ষে যাহা উপকারী প্রাচ্যের পক্ষে তাহা কল্যাণপ্রদ ও সহজসাধ্য নহে। তাহাতে সুফল লাভ ত সম্ভবপর নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে অনেক কুফল ঘটিয়া থাকে। তাহাতে আপনার বৈশিষ্ট্য—অস্তিত্ব লোপ হইতে পারে। তাহাতে একুল ওকুল দুকুল নষ্ট হইতে পারে। শীতপ্রধান দেশের গাছ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বৃদ্ধি পায় না, আবার গ্রীষ্মপ্রধান দেশের গাছ যেমন শীতপ্রধান দেশে বৃদ্ধি পায় না, তদ্রূপ প্রতীচ্য ও প্রাচ্য পরস্পরের বিশেষত্ব পরিত্যাগ করিয়া আমূল প্রকৃতি পরিত্যাগ করিয়া অপরের অনুকরণ করিলে বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা। পাশ্চাত্য তাহার স্বভাব অবলম্বন করিয়া উন্নত হইয়াছে। প্রাচ্যকে তাহার স্বভাব আশ্রয় করিয়া উন্নত হইতে হইবে। ত্যাগই ভারতের আদর্শ, ভারতকে উঠিতে হইলে ত্যাগ, সংযম, তিতিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া উঠিতে হইবে। ভোগ ও ত্যাগের মিলন সকল সময় বিসদৃশ বিকৃত ও ভয়াবহ। সংস্কারকগণের স্মরণ রাখা উচিত, এটী ভারতবর্ষ, ইউরোপ নহে।

সৌভাগ্যবশতঃ শতাব্দীর অধিককাল পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে বিসদৃশ আশাবিরোধী ফললাভে ভারতের চক্ষু উন্মিলিত হইয়াছে। প্রতীচ্যের নেশা ঘুচিয়াছে। নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে। বিদেশী সভ্যতা অনুকরণে ও স্বধর্ম্ম ত্যাগের ফলে ভারতের যে দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে তাহার চৈতন্য হইয়াছে। এখন ভারত বুঝিয়াছে, অন্তর ভাল না হইলে বাহিরের চাক্‌চিক্যে প্রয়োজন নাই। বিদেশীর সভ্যতার বহির্ভাগমাত্র অনুকরণ করিতে যাইয়া সে অন্তঃসার শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। প্রতীচ্যে অপকার, ও দুর্গতি নিবারণের উপায় সকল বিদ্যমান থাকায়, উহা তাহাদিগের ক্ষতিকর না হইয়া পরম সুহৃদের কার্য্য করে। কিন্তু ভারতে ঐ সকল সুবিধার অভাব থাকায় ভারত তমোমলিন হইয়া পড়িতেছে। আত্মোন্নতির উপায় অবলম্বন না করায়, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস না করায় আত্মার, শক্তি বিস্মৃত হওয়ায় ভারত অকর্ম্মণ্য, শক্তিহীন, শ্রীহীন হইয়াছে। সৌভাগ্য-বশতঃ বর্ত্তমান কালে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমুখ পুণ্যশ্লোক নরদেবগণের আবির্ভাবে ভারতে এক নব আলোক নব জ্যোতি নব শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে। সমুদ্র মন্থনে অমৃত উদ্ধারের ন্যায়, নিশাপগমে উজ্জ্বল প্রভা উদয়ের ন্যায়, ভারতের

মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত মৃতপ্রায় দেহে অমৃতবারি, শান্তি সুধা মৃতসঞ্জীবনী মহৌষধ স্বরূপ সনাতন ধর্ম্ম সুসংস্কৃত ও পরিমার্জ্জিত হইয়া সম্মুখে আদর্শ স্থাপন করিয়াছে। সংসারের ভোগবাসনা বিসর্জ্জন করিয়া, কামিনীকাঞ্চনে অনাসক্ত হইয়া, হিংসাদ্বেষ পরশ্রী-কাতরতা ত্যাগ করিয়া সংযম বৈরাগ্য সাধনা ও সমন্বয় বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া আত্মোন্নতি করিতে হইবে। তাহাদের মহৎ জীবন পুনঃপুনঃ আমাদিগের পথনির্দ্দেশ করিতেছে। পাপী তাপী লম্পট সকলেই ধর্ম্মপথ অবলম্বনে ধর্ম্মের ছাঁচে জীবন গঠন করিয়া আত্মোন্নতি লাভ করিবে। ধর্ম্ম ভারতের অস্থি ও মজ্জা ধর্ম্মই ভারতের প্রাণ। ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ হইয়া, ধর্ম্মে আস্থাবান্ হইয়া ভারতকে স্বীয় নষ্ট সৌভাগ্য পুনরুদ্ধার করিতে হইবে।

শ্রীপ্রভাত কিশোর কুণ্ডু

সৎকথা

মনের কোণে যত জিনিষ সঞ্চিত থাকে, একখানা ঘরের কোণে তত জিনিষ ধরে না।

শত্রুকে জয় কর কিন্তু বধ করোনা; তাতে তোমার কাপুরুষতা বেড়ে যাবে।

সহ্য করবার শক্তি যার যত বাড়ে, অভাব অভিযোগ তার তত কমে।

সুখকে যদি আহ্বান কর, আগে দুঃখকে বরণ কর।

জগতে যত কিছু বল আছে, তার মধ্যে মনের বল সবচেয়ে বেশী।

কাঁটা দিয়ে যেমন কাঁটা তোলা যায়, তেমনি মন দিয়ে মনকে বশ করা যায়।

ভোগের সুখ ভোগে নয়, ত্যাগে।

যে যত না দেখে চলে, সে তত হোঁচট খায়।

বাড়ীর কর্ত্তাকে রাগিয়ে দিয়ে বাড়ীতে বাস করাও যা, আর মনের মধ্যে বাসনা রেখে সাধনা করাও তা।

বোকাকে বোঝান যায়, বুদ্ধিমানকে বোঝান দায়।

স্রোতের মুখে বাঁধ দেওয়ার চেয়ে দেখে শুনে জল যাবার রাস্তা করা ঢের ভাল।

শ্রীনরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়

গোপনে

অন্তরে করিতে অধিকার তোমার সে রূপ চিরন্তন,
সবাকার হ'তে আপনারে রাখি সদা করিয়া গোপন।
নীরবে জীবন পথ ধরি চলিয়াছি তব অন্বেষণে ;
ব্যর্থ হবে এ চলা কি মোর ? আমার এ কল্পনা স্বপনে
তুমি কি দিবে না ধরা কভু ? অন্তরের ওগো চিরপ্রিয় !
দাও দাও ভাষা দাও মুখে বুকে দাও ভাবের অমিয়।
জগতে করিতে সপ্রকাশ তোমার সে প্রেম ভালবাসা,
নিয়ত যে বাসনা আমার পুরিবে না কি সে মোর আশা।
তিলে তিলে প্রাণখানি মোর যদি করি তব তরে দান ;
তাহে তব কোন ক্ষতি নাই তবু তব হবে অসম্মান।
জগতের প্রতি অণুকণা তোমার করুণা লভে নিতি
আমি শুধু রহিব বঞ্চিত ? এতটুকু স্নেহ প্রেম প্রীতি।
মম তরে নাহি কি সঞ্চিত তোমার বুকের এক কোণে ?
প্রকাশে যদি গো পাও লাজ গোপনেই রেখো তাহা মনে।
মধুর সে গোপন পরশে পুলকে পুরিবে প্রাণ মন,
হোক সে গোপন তবু দিও ; তাই মোর শাশ্বত সাধন।

শ্রীমতী বন দেবী।



পুস্তকপরিচয়

ধর্ম্মধারা—শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রণীত। আদিব্রাহ্ম সমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য দুইআনা।

আমাদের দেশে ধর্ম্মসংক্রান্ত ইতিহাসগ্রন্থ অতি বিরল। সেই অভাব পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে ধর্ম্মেতিহাসের ভূমিকাস্বরূপ এই পুস্তিকাখানি প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকখানি ক্ষুদ্র হইলেও ঐতিহাসিক অনেক ইঙ্গিতে পূর্ণ। ইহা ধর্ম্মসংক্রান্ত ইতিহাস লেখকদিগের উপকারে আসিবে।

সংঘ ও বার্ত্তা

১। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবৎসরও বিগত ৮ ই ভাদ্র (২৪ শে আগষ্ট) বুধবার জন্মাষ্টমী দিবসে তত্ত্বমসি মঠের বার্ষিক মহোৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। আমরা বিশেষ আনন্দের সহিত জানাইতেছি, ঐ দিবস প্রাতে প্রভুপাদ শ্রীগৌরগোপাল গোস্বামী মহাশয় ভাগবৎ পাঠ করেন। ১০ টার পর বাঘমারী ভবানীসম্প্রদায় কর্ত্তৃক কালীনাম সংকীর্ত্তন হয়। বেলা ২ টার পর সুধাকণ্ঠ কীর্ত্তনকলানিধি শ্রীভূপেন্দ্র-নাথ বসু ভক্তিরত্ন মহাশয় "নৌকা বিলাস" কীর্ত্তন দ্বারা জন সাধারণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। অপরাহ্ণে ৫ টার পর শিবপুরনিবাসী শ্রীগৌরাঙ্গলীলাকীর্ত্তন সম্প্রদায়, নিমাইসন্ন্যাস ও রাত্রি ৯ টার পর বাগবাজার শ্যামাসম্প্রদায়, সুমধুর শ্যামা নাম কীর্ত্তন দ্বারা উপস্থিত জনমণ্ডলীকে বিশেষ আনন্দ দান করেন। এতদুপলক্ষে ন্যূনাধিক আট হাজার ভদ্র মহোদয় ও মহিলা উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। অনেকেই মঠের কার্য্যাবলী পরিদর্শন করিয়া পরম প্রীতিলাভ করেন।

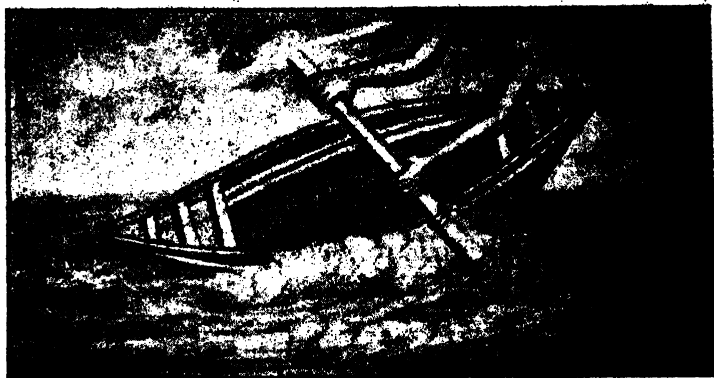
২। তত্ত্বমসি মিশনের অবৈতনিক বিদ্যালয়ে সকল শ্রেণীর বালকগণকে শিক্ষা দেওয়া হয়। যাঁহারা উক্ত বিদ্যালয় সম্বন্ধে কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মিশন সম্পাদকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সবিশেষ অবগত হউন।

৩। তত্ত্বমসি মিশনে সুযোগ্য চিকিৎসকগণের দ্বারা বিনামূল্যে চিকিৎসা করা ও ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

বিশ্বজনীন

ধর্ম্ম-নীতি-শিক্ষাসংস্কারাদি সম্বন্ধীয় বর্ত্তমান যুগোপযোগী

তত্ত্বমসি মঠের মুখপত্র



"সত্যমেব জয়তে নানৃতম্"



৩য় বর্ষ—৬ষ্ঠ সংখ্যা

আশ্বিন, ১৩৩৯ সাল।

Viswajanin

The Organ of Tattwamasi Math.

সম্পাদক—স্বামী নির্ব্বাণানন্দ

বিশ্বজনীন কার্য্যালয়।

৩২।১ রাজা দিনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য ২৲ প্রতি সংখ্যা ৵০

সূচীপত্র

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-
শ্রীচরণ ভরসা।

বিশ্বজনীন।

৩য় বর্ষ | আশ্বিন ১৩৩৯ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সামবেদ-সংহিতা।

৬ষ্ঠ আর্চ্চিকঃ। কৌথুমী শাখা। ঐন্দ্রংপর্ব্ব। ২অ, ২প্র, ২প, ৩খ. ৩দ।

ইহেব শৃণ্ব এষাং কশা হস্তেষু যদ্বদান্।
নিয়ানঞ্চিত্রমৃঞ্জাতে ॥ ১।

কর্ম্মের গহন গতি, মায়াঘেরা বিশ্বচরাচর।
দুর্ব্বার রিপুর দল, ভবনদী অতীব দুস্তর ॥
ছিন্ন কর মায়াপাশ, অবধান শাস্ত্রের বচন।
ইন্দ্রিয় সংযত হবে, বিভুপদ অভয় শরণ ॥

ইম উত্বা বি চক্ষতে সখায় ইন্দ্র সোমিনঃ।
পুষ্টাবন্তো যথা পশুং ॥ ২।

পাশবদ্ধ মৃগসম বিভু মোর সদাই আয়ত্ত।
যে তার করুণাপ্রার্থী তাহে তিনি করেন কৃতার্থ ॥
কর্ম্মজ্ঞানভক্তি পথ, মার্গত্রয় সমান সফল ॥
ভক্তের আরাধ্য যিনি জ্ঞানি-কর্ম্মি-হৃদয়-সম্বল ॥

সমস্য মন্যবে বিশো বিশ্বা নমন্ত কৃষ্টয়ঃ।
সমুদ্রায়েব সিন্ধবঃ ॥ ৩।

সাগরসঙ্গমপথে নদী যথা করিছে গমন।
প্রকৃতি বিভুরে তথা আপনারে করে নিবেদন ॥
সংসারসাগরতরী জগতের কেবল আশ্রয়।
তাহার শরণ লও, নাহি রবে সংসারের ভয় ॥

দেবানামিদবো মহত্তদা বৃণীমহে বয়ং।
বৃষ্ণামস্মভ্যমূতয়ে ॥ ৪।

অপার মহিমা যাঁর, রিপুবলে করিছে সংহার।
ইষ্টদাতা ভয়ত্রাতা ধাতা পাতা দেবসারাৎসার ॥
ডাকি তোমা সকাতরে, মোহান্ধতা করহে বিনাশ।
দুর্ব্বলের বল তুমি, নিরাশার একমাত্র আশ ॥

সোমানাং স্বরণং কৃণুহি ব্রহ্মস্পতে।
কক্ষীবন্তং য ঔশিজঃ ॥ ৫।

পরিত্রাতা জ্ঞানদাতা হর মোর কলুষকলাপ।
অহোরাত্র কাটে মোর, সংসারের করিয়া আলাপ ॥
তোমার প্রসাদে নর মুক্ত হয় সর্ব্বপাপভয়।
জীবেরে শিবত্ব দাও, তোমা সম কেবা দয়াময় ॥

বোধন্মনা ইদস্তু নো বৃত্রহা ভূর্য্যাসুতিঃ।
শৃণোতু শক্র আশিষং ॥ ৬।

সচ্চিদ্‌আনন্দরূপী অন্তর্যামী তুমি নারায়ণ।
এ মিনতি করি পদে দীনজনে দাও শ্রীচরণ ॥
ভক্তিপ্রিয় ভগবান্ ভক্তমন করগো হরণ।
সংসার ত্রিতাপজ্বালা দহিতেছে মোরে অনুক্ষণ ॥

অদ্যা নো দেব সবিতঃ প্রজাবৎ সাবীঃ সৌভগং।
পরা দুঃষ্বপ্ন্যং সুব ॥ ৭ ॥

তুমি গো মোদের পিতা, মোরা তব অকৃতী সং...।
প্রজ্ঞান পরম ধন, আমাদের কর গো প্রদান ॥
নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্ন যথা চিরতরে হয়ে যায় লীন।
প্রজ্ঞানপ্রসাদগুণে ভবভয় সদা বলহীন ॥

ক্ব। স্য বৃষভো যুবা তুবীগ্রীবো অনানতঃ।
ব্রহ্মা কস্তং সপর্যতি ॥ ৮ ॥

শিবময় শুভদাতা কোথা তব সতত আবাস।
সর্ব্বময় তুমি দেব ভক্তহৃদি কৃত অধিবাস ॥
কাহার পূজায় তুষ্ট, হও তুমি অনাদিনিধন।
সর্ব্বভূতহিতে রত আত্মপর সমদরশন ॥

উপ হ্বরে গিরীণাং সঙ্গমে চ নদীনাং।
ধিয়া বিপ্রো অজায়ত ॥ ৯ ॥

পাষাণ হৃদয় যদি তোমাধনে করে আরাধন।
সত্ত্বভাব ধর্ম্মবুদ্ধি তাহারেও করিবে ভূষণ ॥
কঠোর স্বভাব তার কোমলতা করিবে আশ্রয়।
কৃপানিধি জ্ঞানদেব অতুলন তোমার কৃপায় ॥

প্র সম্রাজঞ্চর্ষণীনামিন্দ্রং স্তোতা নব্যাং গীর্ভিঃ।
নরং নৃষাহং মংহিষ্ঠং ॥ ১০ ॥

সাধুজন সুসেবিত ধর্ম্মপথ সুখের আগার।
তাহারে আশ্রয় কর, নাহি রবে সংসার বিকার ॥
চিত্তবৃত্তি-রোধকারী সাধকের হৃদয় রঞ্জন।
দেব দেব কর মোর ভবভয় সংশয় ভঞ্জন ॥

মহামন্ত্র

মানুষ মনেই মুক্ত, মনেই বদ্ধ। যে ঠিকঠিক বিশ্বাস করে, আমি মুক্ত, সে মুক্তই হয়ে যায়। যে ভাবে আমি সংসারে থাকি বা অরণ্যে থাকি, যেখানে থাকি না কেন, আমার বন্ধন নাই, আমি শুদ্ধবুদ্ধ অপাপবিদ্ধ, তার মনে মায়া মমতা, নীচতা এ সকল কুসংস্কার থাকিলেও সেগুলি অচিরেই দূর হইয়া যায়। আমি ঈশ্বরের সন্তান, আমি রাজাধিরাজের সন্তান, আমার আবার পাপ কি, বন্ধন কি? সয়তান আমার কাছে অগ্রসর হইতে সাহস করে না, এই বিশ্বাস, এই ভাব হৃদয়ে বদ্ধমূল করিতে পারিলে, কালে হস্তামলকীর মত সিদ্ধি করতলগত হয়। আবার যে ব্যক্তি আমি পাপী, আমি বদ্ধ, বার বার এই বলে, সে বদ্ধই হয়ে যায়, তার বন্ধন কখনই মুক্ত হয় না। ঈশ্বরের নামে বিশ্বাস চাই। তার নাম কর, তোমার আবার বন্ধন কি? মঙ্গলময়ের যে শরণ লয়, তার কি আর অমঙ্গলের ভয় থাকে? ভগবানের নাম করিলে মানুষের দেহ মন শুদ্ধ হয়। তাঁর নামে অসম্ভবও সম্ভব হয়। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর। মহাবীর রাম নাম করিয়াই সমুদ্র লাফ দিয়া পার হইলেন, আর স্বয়ং রামচন্দ্রকে সমুদ্র পার হইবার জন্য সেতু নির্ম্মাণ করিতে হইল। একবার বল, ভগবান্ ভুল করিয়াছি, আর ওরূপ করিব না, তোমার শরণ লইতেছি, দেখিবে, সকল ভয় ভাবনা দূর হইবে, হৃদয় অকপটভাবে বলিতে থাকিবে:—

আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে না তার কেমনে দেখা যাবে মা শঙ্করী।
নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ, সুরাপান করি বিনাশি নারী।
এ সব পাতক না ভাবি তিলেক, ব্রহ্মপদ নিতে পারি॥

হংস।

——:•:——

শ্রীশ্রীতুকারাম

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নিরহঙ্কারই মনুষ্যত্বের লক্ষণ। অভিমান নষ্ট না হইলে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ হয় না। যিনি যত মহৎ, তাহার অভিমানও সেই পরিমাণে ক্ষয় পাইযা গিয়াছে; তিনি সেইরূপ দীনহীন ভাবাপন্ন। বৈষ্ণবগণ তৃণ অপেক্ষা নত ও তরুর ন্যায় দৃঢ় ছিলেন। তুকারামের চরিত্রে দীনতা ও বৈরাগ্য পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। তিনি দীনতার প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন বলিলে অত্যুক্তিবাদ হয় না। তিনি আপনাকে সকলের সেবক জ্ঞান করিতেন। যদিও তিনি শিক্ষায় ও সাধনায় সমসাময়িক কোন ব্যক্তির অপেক্ষা হীন ছিলেন না, তথাপি তাহার অমায়িক ব্যবহার ও সুজনতা তাহাকে শরণাগত ভক্তের ভাবসম্পদের অধিকারী করিয়াছিল। যখনই কেহ তাহার নিকট তাহার সাধুজীবনের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করিতেন, তখন তিনি কত নম্র ও বিনয়াবনত ভাষায় আত্মকাহিনী বর্ণনা করিতেন। তিনি বলিতেন "আমি ব্রাহ্মণ নহি, আমি শূদ্র; আমি ব্রাহ্মণের দাস; ধর্ম্মে আমার অধিকার নাই; আমার কোন গুণ নাই। কিন্তু ঐ সকল অগুণ সত্বেও আমাতে যে ধর্ম্মভাব লক্ষিত হয়, তাহা বিঠ্‌ঠল দেবের কৃপা ও আমার পূর্ব্বপুরুষগণের সুকৃতির ফল। আমার অভিমান করিবার কিছুই নাই; কেন না আমি পণ্ডিত নহি; আমি সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ; আমার ভাষা গ্রাম্য, আমার মত মূর্খের ভাব ও ভাষা অগৌরবের সামগ্রী। আমার বিবেক ও বৈরাগ্য নাই কেন না আমি আজন্ম ব্রহ্মচারী বা বিবেকী বৈরাগী নহি। আমি সংসারাশ্রমে ভোগরত বিলাসী যুবক ছিলাম। মাতা পিতা প্রভৃতির বিয়োগে কাতর হইয়া মৃত্যুভয়ে বিঠ্‌ঠলের শরণ লইয়াছিলাম; আমি সংসারসমরে পরাজিত, অন্নাভাবে আমার প্রথম স্ত্রী ও পুত্র ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছে। অন্নাভাবে আমার দ্বিতীয় স্ত্রী ও পুত্র কন্যা অতি ক্লেশে দিন যাপন করিতেছে। আমি আপনার গ্রাসাচ্ছাদন উপার্জ্জনে অশক্ত হইয়া সংসারীর ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছি, আমি আমার কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করিয়াছি। আমার মত দীন ও হীন ব্যক্তির কে আছে? আমি ধর্ম্মকর্ম্ম, সাধন ভজন কিছুই জানি না; আমাকে প্রশংসা করা কখনই উচিত নহে, উহা আমাকে মুগ্ধ ও প্রলুব্ধ

করিয়া অধঃপাতের গর্ত্তে পাতিত করিতে পারে। অহো সাধুগণ! আপনাদের অশেষ শুভেচ্ছা ও বিঠ্ঠলের করুণায় আমার এই অবস্থা। আমি কিছুই জানি না, বিঠ্ঠলদেবের শ্রীচরণই আমার ভরসা।"

তুকারাম কেবল বচনে বিনয়ী ও নম্র ছিলেন না, তাহার কাজ ও ব্যবহার সম্পূর্ণ-রূপে কথার অনুযায়ী ছিল। লোকমান্য ভয়ে তিনি সহর ও লোকালয় ভাল বাসিতেন না। ভিক্ষান্নেই তাহার জীবন যাপিত হইত, ছিন্নবাস তাহার পরিধান ছিল, ভক্তের চরণসুধা সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া তিনি মহানন্দে বিভোর থাকিতেন। হরিগুণগান তাহার পরম পুরুষকার ছিল। সকলের উপকার ও সেবা করাই তাহার নারায়ণসেবা ছিল। অতিথি, বৃদ্ধ, বালক, দীন ও আর্ত্তের তিনি একমাত্র সুহৃৎ। যাহারা কোন স্থানে কখনও কোনরূপ সম্মান লাভ করেন নাই, তাহারাও তাহার স্নেহাশীষ ও সেবাশুশ্রূষা লাভে বঞ্চিত ছিল না। সর্ব্বত্র সমানভাবে তাহার কৃপাদৃষ্টি প্রসারিত হইত। ছত্রপতি শিবাজী তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন কিন্তু তিনি তাহার নিমন্ত্রণ বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করিলেন। অনন্তর মহারাষ্ট্রাধিপতি শিবাজী উপহারাদি সঙ্গে লইয়া একদা তাঁহার কুটীরে উপনীত হইলেন। তুকারাম অতিশয় বিনীতভাবে তাহার উপহার প্রত্যাখ্যান করিলেন ও বলিলেন হে রাজপুত্র! যাহারা শ্রীহরির সেবক তাহা-দিগের নিকট পিপীলিকা ও রাজাধিরাজ উভয়েই তুল্য। তোমার প্রদত্ত উপহার ও মৃত্তিকায় কোন প্রভেদ নাই। সন্ন্যাসীর অপূর্ব্ব ত্যাগ অবলোকন করিয়া শিবাজী অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন। তুকারামের সদ্ব্যবহারে ও ভক্তিভাবে মুগ্ধ হইয়া শিবাজী কয়েক দিবস তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। দিন দিন সাধুর ত্যাগ ও বৈরাগ্যের উচ্চ আদর্শ তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। তিনিও রাজধর্ম্ম ত্যাগ-করতঃ সন্নিহিত অরণ্যে তাপসবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক দিন যাপন করিতে লাগিলেন। সমস্ত রাত্রি সঙ্কীর্ত্তন পূর্ব্বক প্রভাতে অরুণোদয়ে মঙ্গলারতি সন্দর্শন করিয়া তিনি একাকী অরণ্যে প্রবেশ করিতেন। এইরূপে কয়েক দিবস অতিবাহিত হইলে তাহার অনুচরবর্গ ভীত হইয়া রাজমাতা জিজিবাইকে এই সংবাদ জানাইলেন। জিজিবাই অত্যন্ত বিচলিত হইয়া তুকারামের নিকট আসিয়া তাহার নিকট আপনার একমাত্র পুত্র শিবাজীকে ফিরাইয়া দিতে প্রার্থনা করিলেন। তুকারাম প্রতিশ্রুত হইলেন। শিবাজী তাহার সমীপে আসিলে তিনি তাহাকে সংসার ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের বিহিত কর্ম্ম রাজধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলেন। শিবাজী সংসারে ফিরিয়া রাজধর্ম্ম পালন

করিতে মনস্থ করিলেন। তুকারাম বণিক্‌সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করিলেও অনেক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। তিনি জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলকেই শিক্ষা দিতেন এবং যাহাতে সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা পায়, স্বীয় মহৎ ও উদার আদর্শ চিন্তাগুলি সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়, তাহার জন্য তিনি চেষ্টা করিতেন। এতদ্ব্যতীত, তিনি সঙ্কীর্ত্তন ও অমায়িক সাধু ব্যবহারদ্বারা হরিপ্রেমও সকলকে বিলাইতেন। যাহাতে বিঠোবার শ্রীপাদপদ্মে স্থির মতি রাখিয়া লোকে সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তজ্জন্য তিনি বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। তাঁহার নিরহঙ্কার সপ্রেম অমায়িক ব্যবহার চিরদিনই সাধু ও গৃহস্থ সকলের আদর্শস্থানীয়।

(ক্রমশঃ)

আনন্দ

বিশ্বের আঙিনায় যাহারা বিশ্বকর্ত্তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলিয়া গর্ব্ব করে, সেই মানব হৃদয়ে আজ কত জিজ্ঞাসাই না সঞ্চিত হইয়া তাহাদিগকে কত সময়ে চিন্তাসমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। কে বলিবে, অসংখ্য বালুকণার মধ্যে কোথায় কোন মহামণি লুক্কাইত, যাহার সন্ধান মিলিলে সকল জিজ্ঞাসার সমাধি হয়।

মানুষ স্বভাবতঃই আনন্দ প্রয়াসী। স্বল্পায়ু ভঙ্গুর যে ক্ষণতৃপ্তিপ্রদ আনন্দের রূপ তাহার সম্মুখে ক্ষণেক ভাসিয়া পুনরায় নিমীলিত হয়, তাহা তাহার চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলে। আকাঙ্ক্ষার বন্যায় তাহার হৃদয় প্লাবিত হইয়া উঠে, সেই শাশ্বত, মুক্ত, চিরশান্তিপ্রদ মহানন্দের পরশ লাভের জন্য।

আনন্দের যে রূপ আজ তাহার মনোহরণ করিল, কাল উহাই আবার তাহার বিষাদের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। আজ যাহা সে হাস্যোজ্জ্বলা কল্যাণীর শুভাশীষ রূপে হৃদয়ে নিবিড় করিয়া পাইল, কাল তাহাই কুটীল ভ্রুকুটী হাসিয়া অশুভের রূপ ধরিয়া তাহার হৃদয় দংশন করিল; আজ যাহা তাহার নিকট পরম শান্তি-প্রদায়িনী, দীপ্তিমতী, কালই আবার উহাই নিরানন্দ-রূপিণী অশান্তির করাল ছায়ায় ম্লান। এই ঘূর্ণচক্রের বেষ্টন হইতে বেদনাপীড়িত মন কত বার সেই অবিসম্বাদী মুক্তির পথ

খুঁজিয়াছে ; কিন্তু তথাপি সেই একই শক্তি দুই রূপে ক্রমান্বয়ে দিবস-শর্ব্বরীর ন্যায় একের পর অন্যে আসিয়া হৃদয় অধিকার করিয়াছে। বিবেকযুক্ত, চেতনালব্ধ মানব এই গতানুগতিকতার মোহে পরিচালিত মন লইয়া নিস্পন্দ অচেতন হইয়া ভাবিতেছে, ইহাই বুঝি চিরন্তন রীতি, ইহা হইতে বাহির হইবার সকল পথই বুঝি বা রুদ্ধ। কিন্তু পরক্ষণেই বহির্মুখী মন সেই শাশ্বত আনন্দের সান্নিধ্য লাভের আশায় দোদুল্যমান হইয়া উঠিতেছে, বারে বারেই তাহার তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রতিহত হইয়া বেদনামুখর হিয়া ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে। একই পথে ক্রমান্বয়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে।

কিন্তু হৃদয় যাহার দিনের শুভ্র পুণ্য কিরণে অনিন্দ্য হাস্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, অথচ নিশার কলুষ কালিমা যাহার হৃদয়ে নিরানন্দের রেখাপাত করে না ; মিলন যাহার চিত্তে অদম্য শক্তির সঞ্চার করে, অথচ বিরহ যাহার শক্তিকে বিন্দুমাত্র ক্ষয় করিতে পারে না ; সুখ যাহার হিয়ার সকল আবিলতা ধৌত করিয়া পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর ন্যায় স্নিগ্ধ প্রবাহ আনিয়া দেয়, অথচ দুঃখ যাহার সেই পুণ্য শান্তি সমভাবেই অব্যাহত রাখে, তখন নিরানন্দের মূর্ত্তিকে সে বেদনার উৎস বলিয়া ভাবিতে পারে না, আনন্দেরই রূপান্তর বলিয়া হৃদয়ে গ্রহণ করে।

"হয়ে বাক্যমন অগোচর সুখে দুঃখে তিনি অধিষ্ঠান,"—এই ভাব তাহার হৃদয়ে তখন ব্যাকুল বীণার ঝঙ্কার তুলে। হয়তো বা তখন সারা ব্রহ্মাণ্ডকে সে সত্যের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ বলিয়া মনে করে, সমস্ত বস্তুতেই সে জ্ঞানের অখণ্ড রূপ কল্পনা করে, জগতের যাবতীয় সুখ দুঃখ সবই তাহার নিকট একাকার হইয়া এক মহানন্দের সুমধুর কল্লোল-গীতি বলিয়া কর্ণে অনুভূত হয়। এ অনুভূতি সহজসাধ্য কি দুঃসাধ্য সে চিন্তার স্থান তখন হৃদয়ে নাই, তখন ঐ দুইয়েরই বাহিরের এক শক্তি তাহার অধীনে। তখনও এই প্রশ্নই তাহার হৃদয়ে উঠে কিনা জানি না—আনন্দের রূপ কি? তাহার উৎস হৃদয়ের কোন স্তরে?

ব্রহ্মচারী জ্ঞান।

"জাগো"

প্রাণ প্রবাহের গভীর সুরে,
বাজ্‌লো ভেরী, বাজ্‌লো ভেরী,
বদ্ধ কেগো অন্ধকারে,
কত দেরী? কত দেরী?

—০—

নিদালি মগন ওগো পুরজন! আজি এ প্রভাতে জাগো গো জাগো:
দৃঢ়পদে ছিঁড়ি ক্রূর শৃঙ্খল, ধাতার চরণে আশীষ মাগো।
শুধু আঁখিজল, মৌনবেদনা, ব্যথিত তপ্ত দীরঘ শ্বাস,
বক্ষ শোণিতে, প্রেত-তর্পণ নহে ত পিতার এ' অভিলাষ।
সংশয় ফণী ফুঁসিছে তিমিরে বিপদঝঞ্ঝা গরজে ঘন,
লক্‌লকি' ওঠে বজ্রআগুণ,—চমকে নিখিল মন।
উত্তাল-ফেন-শোভিত সাগর, ঐ যে উছসি' উথলি' উঠে,
ভীম-সুন্দর লহরীপুঞ্জ চকিতে ধরণী গ্রাসিতে ছুটে।
তোরা রয়েছিস্ দিশেহারা হ'য়ে নাহিরে উদ্দীপনা,
বেদনা-ব্যথিত দীর্ণ পরাণ সাথী শুধু কল্পনা।
অতীত দিনের গৌরবগাথা বুঝি বা জাগেনা প্রাণে,
অনাগত কাল—জাগেনা সমুখে দীপ্ত দীপক তানে।
শুধু কালক্ষয়, শুধু মর্ম্মজ্বালা, নাহি কোনো প্রতীকার,
ওরে ভারাতুর! কোন্ অভিশাপে হয়েছ ধরার ভার?
জীবন আরাবে বাজিছে শঙ্খ, ওই শোন কলরব,
কাণ পেতে শোন্ বিজয়ী দলের পুলক মহোৎসব॥
গভীর মন্দ্রে কাঁপে জলস্থল, অন্তহীন অম্বর।
যুক্ত পবনে ভাসিয়া আসিছে রাজরথ ঘর্ঘর॥
নিখিলের প্রাণ, আজি আগুয়ান্, বাহিরিয়া নববেশে
নবীন বার্ত্তা, নব জাগরণ বহি' আনে মরুদেশে।
জড়তার মোহ বিবশ পান্থ! শোনো ঐ ঝঙ্কার,
তরুণ দলের পদ-রেখা ধরি' ঘুচাও জাড্যভার।

দানব সমান বিরাট কুহক,
সতত হৃদয়-শোণিত শোষক,
নিশিদিনমান, সঁপিয়া পরাণ,
রয়েছ অচঞ্চল,
পান করি হলাহল ॥

মরণের দেশে এত কি মাদক ?
এতই কি লাগে ভালো ?
বরিয়া লয়েছ অযুত যুগের
নিবিড় নিকষ কালো ।
নাই দীপ শিখা কোথা, গো প্রভাত ?
ঘুমন্ত পাষাণ কারা
লৌহ বপুর নিদারুণ ভারে
হয়েছে শকতি হারা ॥
নাই আশা রেখা, নাহিগো ভাবনা,
মরণ পাংশু মুখ,
কত অবিচারে জমিয়া গিয়াছে
সরস সরল বুক !

মায়া দানবীর 'ঘুমপাড়া' গান তুই কি বাসিস্ ভালো ?
চাস্ না উজ্জল অরুণ-মাধুরী, চাস্‌নে জীবন-আলো ?
তুইবে বাঁচিতে হবে গো সাধিতে মানুষের মত জীবন ব্রত,
সেই ত মানুষ—সেই ত জীবন—নির্ভীক উদ্যত ।
মরণের মোহ ঘিরেছে বেড়িয়া, লক্ষ ক্রুদ্ধ ফণায় তুলি,
কাম্য দেবতা ? —নয়, নয় কভু ওঠ্‌রে ত্যজিয়া মলিন ধূলি ।
আজি সবুজ বনের শ্যামল শোভায় তোদের উদ্বোধন ?
রইবি কি গো চিরদিনই নিথর অচেতন ?

আনন্দেরই যজ্ঞশালায়,
আয়রে আজি আয় ছুটে আয়
আত্মবোধের অনুভূতি সজাগ করুক মন ॥

বনে বনে ফুট্‌লো কুসুম,
যৌবনেরি আনন্দ ধুম,
পূব তোরণে আলোক রাশির কি অভিনন্দন ॥
সোনার কাঠির চেতন পরশ লাগুক তোমার শিরে,
দাঁড়াও সবে ঘিরে।
নিদ্‌মহলের উচ্চ প্রাচীর হোক্ ধূলায় একাকার,
চিহ্ন মুছে তার ॥
জাগ্‌রে মোদের চিন্তাবিহীন 'আল্‌সে কুঁড়ের' দল ?
বিভুর পদে হৃদয় ঢেলে চল্‌রে পথে চল্ ॥
বিপুল আশার উজল পথে হোক্ এ অভিযান,
নবীন উষার কনক কিরণ করুক বলাধান ॥
চাই আমরা সতেজ মানুষ উদ্যত যাঁর হিয়া,
'জাগর মানুষ',—নয় দেবতা—পাষাণ হৃদয় নিয়া ॥
সত্যে যাঁহার দৃঢ় নিষ্ঠা তেজ পূর্ণ প্রাণ,
পরের হিতে অনায়াসে জীবন করে দান।
দুষ্টে দলি, শিষ্টে পালে, অবিক্লব মতি,—
সেই আমাদের বরণীয়, তাঁরই পায়ে নতি ॥

অপর্ণা দেবী।

---*---

পূজায় অভাব

বিশ্বজননী দশভুজার আগমনে আজ চারিদিক আনন্দে মগ্ন। আকাশপাতাল ভেদ করিয়া আজ এক উন্মাদকর আনন্দ হিন্দুজাতির মনঃপ্রাণ মাতাইয়া তুলিয়াছে। হিন্দু-জাতি সম্বৎসর তৃষিত নয়নে মাতার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, আজ তাহার সে আশা পূর্ণ ও বলবতী হইয়াছে। আশাহীন, ভরসাহীন গতপ্রাণ জীবনেও আনন্দবন্যা বহিয়া যাইতেছে। সকলের মুখে শুনিতেছি বরাভয়প্রদা, শত্রুদলিনী, অসুরনাশিনী, ত্রিতাপহরা দশভুজা আজ আসিয়াছেন; দেশে এবার শ্রী, বিদ্যা, সিদ্ধি, শক্তি, শান্তি সকলই বিরাজ করিবে। ত্রেতাযুগে যেমন মা অঘটন ব্যাপার সম্পাদন করিয়া-

ছিলেন, তখন যেমন দুঃখে পাপে তাপে জর্জ্জরিত বসুন্ধরার দুঃখ, পাপ, তাপ দূর করিয়াছিলেন, এবারও আবার মা ধরাধামের দুঃখাদি দূর করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন। তাই দেশবাসীর আনন্দের সীমা নাই। শারদীয় শশাঙ্ক তাই কত সুন্দর, প্রকৃতির কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য মাধুরী! সর্ব্বত্র মিলন ও প্রীতির ভাব দেখা যাইতেছে; প্রবাসী, যিনি একমুষ্টি অন্নের আশায় প্রিয় জন ও স্বদেশ ত্যাগ করিয়া দূর দেশে মনঃকষ্টে দিনাতিপাত করিতেছেন, তিনিও আজ স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া প্রিয়জনের সহিত সম্মিলিত হইয়া আবার আনন্দ উপভোগ করিবেন বলিয়া আত্মহারা। দীন হীন কাঙ্গাল সন্তানগণ অনশনে অর্দ্ধাশনে দিনাতিপাত করিয়া নব নব ফুল্ল ফুল্ল মনোরম আনন্দদায়ক বস্তুতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দিগ্‌দিগন্ত পুলকিত করিতেছে। মা নূতন ভালবাসেন, তাই সকলেই নূতন সাজে সজ্জিত হইয়া মাতৃসমীপে সমাগত হইয়াছে। নদী জলে ভরা, মাঠে মাঠে ধান ধরে না, প্রকৃতি পরিপূর্ণ; যাহার যেমন ক্ষমতা, ধনী নির্ধন সকলেই মাতৃকৃপায় সামর্থ্যানুযায়ী আনন্দ উপভোগে রত হইয়াছেন। কিন্তু কৈ? আনন্দ চিরস্থায়ী হয় কৈ? বৎসর বৎসর মায়ের পূজা হইতেছে। প্রতি বৎসরই প্রকৃতি নূতন সাজে সাজিতেছে। জগদ্বাসিগণ আনন্দের অভিনয় করিতেছে, কিন্তু আনন্দ চিরস্থায়ী হইতেছে কৈ? প্রতিবৎসর কত ভাবে কত রূপে মায়ের পূজা করিয়াও কেন ভারত শ্রীসম্পদ্, বিদ্যা, শক্তি প্রভৃতি হারা হইয়া দুঃখে কষ্টে জর্জ্জরিত হইয়া জ্ঞানাভাবে অনুন্নত জীবন যাপন করিতেছে? সামান্য প্রণিধান করিলে বুঝা যায় পূজায় আন্তরিকতা নাই; পূজার জন্য পূজা নয়। পূজা প্রথাগত ব্যাপার হইয়াছে, পূজা লোকদেখান অনুষ্ঠান হইয়া পড়িয়াছে। গীতায় চতুর্ব্বিধ ভক্তের কথা উল্লেখ আছে; আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী। প্রকৃত কথা বলিতে লজ্জা হয়, আধুনিক পূজারী উক্ত চতুঃশ্রেণীর মধ্যে কোন শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত নহে। যদি আমরা প্রকৃতপক্ষে আর্ত্ত, দীন, আতুর হইতাম, যদি আমরা ধর্ম্মবিষয় জানিবার জন্য মায়ের শরণ লইতাম, চতুর্বর্গ সাধনহেতু মায়ের আশ্রয় লইতাম, তাহা হইলে আমাদের দুঃখ দূর হইত।

আমরা চাই লোকে দেখুক ও বলুক আমরা পূজা করিতেছি। আমরা লোকের নিকট সম্মানের ভিখারী। আমরা মায়ের কৃপার প্রার্থী নই, সুতরাং আমাদের দুঃখের অবসান হয় না। আমরা মাকে বিশ্বজননী বলি কিন্তু বিশ্ববাসীকে ভাই বলিতে ও ভালবাসিতে পারি না; ভাই বলিলেও ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইয়া পড়িয়াছি।

আমাদের কথায় ও কার্য্যে মিল নাই, আমরা "মা এস" বলিয়া ডাকি কিন্তু প্রকৃতই যদি মা আসেন, মায়ের সিংহ যদি জাগ্রত হয়, তাহা হইলে মাকে অভ্যর্থনা করিবার ক্ষমতা আমাদের মধ্যে কয়জনের আছে? আমরা "যঃ পলায়তে স জীবতি" এই সত্যেরই অনুসরণ করিব। মা আমার বরাভয়প্রদা; মা ভক্তের প্রতি অভয়াশীর্ব্বাদ প্রদায়িনী; মা শত্রুদলিনী কিন্তু ভক্তের প্রতি করুণাময়ী। ভক্তের প্রাণে মায়ের প্রতি নির্ভরতা কই? প্রসঙ্গক্রমে রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্রের কথা আমাদের মনে পড়ে। তিনি অকালবোধন করিয়াছিলেন। তাহার প্রাণের ঐকান্তিকতার কথা আজ আমাদের মনে আসে। মায়ের পূজার জন্য অষ্টাধিক শত পদ্ম আনীত হইলে পর যখন একটী পদ্ম পাওয়া যাইল না, তখন যেমন তিনি তাহার আঁখিপদ্ম উৎপাটিত করিয়া মাতৃ পূজায় উৎসর্গ করিতে উদ্যত হইলেন, আমাদের প্রাণে সেইরূপ উৎসাহ ও আগ্রহ কোথায়? মায়ের পূজার জন্য, প্রীতির জন্য আমরা কি স্বার্থ—মায়ের দেওয়া জিনিষ মাকে প্রদান করিতে পারি? ত্যাগ না করিলে ভোগ লাভ হয় না; উপযুক্ত না হইলে কেবল কামনা করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। পূজায় আসল অভাব মাতার প্রতি অনুরাগ নাই। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেখি সমাধি বৈশ্য ও সুরথ রাজা তাহাদের নষ্ট সম্পদ্ পুনরুদ্ধার করিলেন। তাঁহারা মাতার দর্শন লাভে ধন্য হইলেন। তাহাদিগের সিদ্ধির মূলে ছিল কঠোর সাধনা, মাতার পূজায় আত্মদান। আর আমরা পূজায় পশুবলি প্রদান করি, নিজেদের অন্তরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামনা বাসনা ত্যাগ করিতে পারি না, মায়ের পেটের ভাইকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিতে পারি না। সুতরাং পূজায়ও সুফল পাওয়া যায় না। বিশ্ববাসীর প্রতি প্রেম উদ্বুদ্ধ না হইলে বিশ্বজননী প্রীত হন না।

শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ দেব



তোমার প্রকৃত স্বরূপ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হে বোধাত্মন্! জানিও তোমার প্রকৃত স্বরূপ চিদেকরস ব্রহ্ম। উহাই সর্ব্বভূতান্তর্ভূত আত্মা। বুঝিও ব্রহ্মভিন্ন আর কিছুই নাই। তদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই, সমস্তই তাহার কল্পিত রূপ ও তাহাই জীবপদবাচ্য। উঁহাতে যে জগদাকার জড়তা প্রতীয়মান হয়, তাহা নিষ্কারণ। মিথ্যাজ্ঞান ব্যতীত তাহার কোন কারণ নাই। সর্ব্বদাই উহা আকাশের ন্যায় নির্ম্মল শূন্যরূপে বর্ত্তমান। সৃষ্টি বল, অসৃষ্টি বল, জ্ঞান বল, অজ্ঞান বল, বন্ধন বল, মোক্ষ বল, এ সকল আত্মায় বিরাজিত নহে। না দেখিলে যাহার নাশ হয়, তাহার নাশের জন্য আয়াস কি? তত্ত্বজ্ঞানেই স্বরূপ প্রকাশ পায়। তাহার অভাবে স্বরূপ ভ্রম জন্মে। যেমন তরঙ্গ জলের স্পন্দন মাত্র, তদ্রূপ জগৎ ও ব্রহ্ম নিয়তই অভেদ জানিবে। এ জগৎ বিবর্ত্তের উপাদান ব্রহ্মে দেশকালাদি কিছুই নাই। আরোপিত হইয়া জগৎকোটিতে দৃষ্ট হইতেছে। যে ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ চৈতন্যমাত্র, সেই ব্রহ্মই অবিদ্যাবরণপ্রযুক্ত ঈষৎ প্রকাশিতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। চিদ্রূপ আত্মার পারমার্থিক স্বরূপ জ্ঞানময়, জড় নহে। ত্রিজগৎ ভেদকষ্টকল্পিত। অজ্ঞান প্রযুক্ত উহা দেখা যায়। জ্ঞান হইলে দ্বৈতভাবাদি কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট উপায়ে কৃত্রিম অজ্ঞানের উপসংহার কর। সদ্‌ভাবনা অভ্যাসবলে তত্ত্বজ্ঞানে পরিণত হইবে। যে বিষয়ে অভ্যাস করা যাইবে, তাহা বাধাবিঘ্ন কাটাইয়া উদিত হইবে। এমন কি, মধ্যে জন্ম সহস্র থাকিলেও উহা জীবকে পাইয়া থাকিবে। পুরুষকার বিনা কেবল ইচ্ছায় বা সাধুসঙ্গের প্রভাবে আত্মোপলব্ধি হয় না। পুরুষকারের প্রভাবে সদ্বাসনার দৃঢ়তায় অশুভকামনা দূর হইয়া যায়। অনাত্মচিন্তা পরিত্যাগ করতঃ আত্মস্বরূপের অনুক্ষণ ধ্যানাভ্যাস করিলে দেখা যায়, এই অসন্ময়ী মিথ্যা স্বভাবস্বরূপা জগদাকার ভাবনা কেবল কৌতুকের জন্য প্রবর্ত্তিত ও প্রাতিভাসিক সত্তায় বর্ত্তমান। তখন আত্মা সংসার বাসনা নির্ম্মুক্ত হয়। তখন অহংতা ও মমতা দূরীভূত হয়। হে মতিমন্! এইরূপ সংসার হইতে উদাসীন আত্মাকে অবলোকন করতঃ সর্ব্বভূতের সহিত একীভূত স্বরূপে অবস্থান কর। পরমার্থতঃ জীব ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া অনন্ত ও সর্ব্বশক্তিমান্।

জীব যাহা ইচ্ছা করে, সেই ইচ্ছানুসারে চিদাত্মার সঙ্কল্পমাত্রেই তাহা সম্পন্ন হইয়া থাকে। ধ্যানধারণাদির সাহায্যে স্বেচ্ছানুসারে যথাতথায় একরূপে ও নানারূপে অবস্থিতি ঘটে। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন গৃহে অবস্থান করিয়াও যোগবলে তস্করাদির সমীপে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বিষ্ণু ক্ষীরোদ সাগরে অবস্থান করিয়াও পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। দেবরাজ স্বর্গসিংহাসনে উপবেশন করিয়াও মর্ত্ত্যে যজ্ঞভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভগবান্ রামচন্দ্র এক হইয়াও সহস্রমূর্ত্তিতে এককালে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভগবান্ জনার্দ্দন এক হইয়াও ষোড়শ সহস্র মূর্ত্তিতে অবস্থান করিয়াছিলেন। হে প্রবুদ্ধাত্মন্! আত্মস্বরূপে আস্থাবান্ হইয়া প্রকৃতির অধীশ্বররূপে পূর্ণানন্দে স্বীয় মহিমায় বিরাজ কর।

(ক্রমশঃ)

সুখ

"সুখ কোথা" বলি তুমি খুঁজিয়া বেড়াও,
এ জগতে সুখ, শান্তি দেখিতে কি পাও?
ভিক্ষুকের পাশে যাহা পরম আনন্দ,
তোমার নিকটে তাহা অতি ঘৃণ্য মন্দ;
মহানন্দ অতি সুখ পাও তুমি যা'তে,
নাসিকা কুঞ্চিয়া রাজা ধিক্ দেয় তা'তে।
ভাব বুঝি রাজভোগ অতি মনোহর,
না না, মিথ্যা তা' আশাবিষে সবে জর্জ্জর।
একমাত্র সুখ নিজ পরিতৃপ্ত মন,
অসন্তুষ্ট কুমনই দুঃখের কারণ।

শ্রীবিজয়চাঁদ মান্না

—০—

পূজা

শরতের পাগল হাওয়া আছাড় খেয়ে পড়ছিল হাসানোহেনার গায়। তাই পাগল গন্ধে ঘুমের মাঝেও কেঁপে কেঁপে উঠছিল ফুলবধুর রঙ্গিন পাখা; কিন্তু তার চোখ ভরা ঘুম, দেহ অবস। তবু পাগলিনী নিজের গরবে নিজেই লুটিয়ে পড়ছিল, যেন কত আদরে সোহাগে। রজনী গন্ধার অত ভাল লাগেনি, পথের ধারে যাওয়ার পথে হাওয়ার সাথে যেথায় দেখা সে শুধু ইসারায় কইছিল "ভাল আছত"! অত গরব কিসের? বয়সে বড় তা নয়, মানলাম, কদর বেশী, বেশ ত তাইতে অত অহঙ্কার ভাল নয়।

গোলাপ চেয়েছিল ঐ চাঁদের পানে। ছোটদের সঙ্গে ঐ সব ছোট কথায় যেতে নেই বড়র, তাই গম্ভার। দম্ভ নয় ত? আসে পাশে যারা ছোট, তারা তাকে সম্মান করে, আদর করে, তারা তার অধিকার মেনে নেয় মাথা হেঁট করে। এত পেলে কার বা না হয় অমন অহঙ্কার।

বড় লোকের বাগান বাড়ী তাই রূপসীরা এল সেই নিঝুম রেতে সব প্রণয়ীদের নিয়ে সাধের ফুল বনে। হেনার গন্ধ চায়। তাই তারা বসলো দূরে গোলাপের পাশেই সেই বাঁধান জায়গাটায়। শিউলি দেখছিল সব চুপে চুপে। সে ফোটে সবার শেষে গভীর নিশীথে আর ঝরে সবার আগে, বলবে কেন? এসব আদর সোহাগ তার ভাল লাগেনা বলে। দেখেছে শুনেছে সে অনেক; তাই ঐ বারবনিতার রূপের হেঁয়ালি, অন্ধ যৌবনের ঐ যে রূপের নেশা এ তার ভাল লাগে না। সে চেয়ে থাকে ঐ তুলসী মঞ্চের দিকে যেখানে তপস্বিনী তার ঐ মঞ্জরীর ধ্বজা ধরে পবিত্রতাকেই বরণ করেছে শত সৌভাগ্য রূপ যৌবনের লালসাকে পরিত্যাগ করে। তারই দিকে সে চেয়ে থাকে, তাকেই তার ভাল লাগে বেশী।

রূপসীরা বসে গল্প করলে মাঝ রাত অবধি; তার পর, বিলাসের অঙ্গ সব শিথিল হ'য়ে উঠলো চাঁদনি রাতে, ফুলের সুবাস, এত সোহাগও তার সয় না বেশীক্ষণ। সার বেঁধে তারা চলে গেল ঘরে ফিরে। গোলাপ আগলেছিল, বেঁধেছিল কোন রূপসীর সাড়ীর মাঝে, শোনেনি তারা—ভাল লাগেনি তাদের, কেউ বা দুটিফুল, কেউ বা দুটী ডাল, কেউ বা দুটী পাতা ভেঙ্গে মালতী আর ভূঁইচাপাকে পায় চেপে তারা চলে গেল

টলতে টলতে ঘরে। বাতাস রোধ করেছিল, হেনা আকুল হয়ে ডেকেছিল "ওগো, আরো আছে, বস আমরা যা আছে সব উজর করে ঢেলে দেব তোমাদের কাছে। তারা শুনলে না। গরবিণীরা সব নিজের গরবে ম্লান হ'য়ে উঠলো। পাপড়ী খুলে খুলে পড়লো গোলাপের, হেনা বাড়তে থাকলে রজনীগন্ধার গন্ধ ম্লান হ'য়ে এল, শিউলি চোখ মেলে হাসলে। এমনি দেখে সে নিত্য। এমনি এরা নিত্য নিজের পিপাসায় শুকিয়ে উঠে। বিলাসিতা প্রাণের আগুনকে জ্বালিয়ে দেয় মাত্র। হেনার পাপরী সব আছাড় খেয়ে খেয়ে সারা বাগান ঘুরে মরছে, যেন মৃত্যুতেও শান্তি নেই; এমন নিদ্রাতেও ব্যথার অবসান হয় নাই তার। হায়রে রূপের পিয়াসা।

কে এল আলুথালু কেশ; স্থির চরণভঙ্গিমা, সন্ন্যাসিনীর বেশ। ধীরে এসে সে দূরে সেই তুলসীমঞ্চের পাশে ঐ সবুজ ঘাসের পরে বসলো। তার মন স্থির, প্রাণ শান্ত। তুলসীকে সে প্রণাম করলে স্থির হ'য়ে চেয়ে রইল ঐ অনন্ত আকাশের দিকে। ঐ অনন্ত আকাশের মধ্যে তার মনটা ধীরে ধীরে কোথায় গিযে যেন হারিয়ে গেল। ধ্যানধরা যোগীর মত দেহটা স্থির—স্পন্দন বয় সেও ধীরে। পাগল হাওয়া ধীরে এসে লুটিয়ে পড়লো ঐ শ্রীচরণের নীচে, সাহস হয়নি আর কৌতুক করতে। শিউলি চেয়ে দেখলে ঐ রূপ, বাঃ কি সুন্দর কি মহিমাময়! কি বিপুল ঐ প্রাণ, কি মধুর ঐ সাধনা! ঐ অনন্ত আকাশের মধ্যে কার সন্ধানে সে হারিয়ে গেল অমন আপন ভুলে।

রজনী ধীরে অবসান হ'য়ে এল ঐ স্বপ্নের মধ্যে। এ মহিমাকে বুকে করে ধরণী ধন্যা হ'ল। তুলসী আশীর্ব্বাদ করলে, পূবে হাওয়া মঞ্জরীকে এনে ঢেলে দিলে সাধ্বীর মাথার 'পরে। প্রণাম করে সতী উঠলেন। চোখ গড়িয়ে দুফোঁটা অমৃত-বিন্দু ঝরে পড়লো ধরণীর পবিত্র বুকে। শিউলি সময় বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়লো নারীর গায় মুখে, চোখে পায়। রাঙ্গা হ'য়ে উঠলো দেবীর শ্রীচরণ, রঙ্গিণ হ'য়ে উঠলো আবরণ আকুল হ'য়ে রমণী চুম্বন করলো সে ফুলকে দেবতার আশীর্ব্বাদ জ্ঞানে।

নিত্য হেনা যৌবন খোয়ায়। রজনীগন্ধা কাঁদে হায়! গোলাপ মরে নিজের কাঁটার ঘায়। মালতী সে চরণ ঘায় প্রাণ হারায়। তবু নিত্য ঐ অভিসার ব্যর্থ জাবনকে আরো ব্যর্থতায় ভরে তুলে, কেন কে জানে? শেফালীর জীবন সফল, তুলসীর আশীর্ব্বাদে ধন্য সে। সবার শেষে এসে আগে থাকতেই সে যায়। কেউ জানেনা তাতে তার ব্যথা নেই, কেউ দেখে না তাতে তার দুঃখ নেই, অমনি ঝরে পরে সে নিত্য নিজেকে মহিমান্বিত করে, এই তার স্বভাব, এই তার সম্পদ।

মানুষ পেতে চায় শুধু ফাঁকি দিয়ে। ও রূপে কি ভুলে মন অরূপ রতন? সে যে সাধনার ধন, প্রেমিকেরে দেয় ধরা সারা নিশি শেষে। যে থাকে ব'সে তার আশে তারই প্রিয় সে।

শ্রীঅমলেন্দু কুমার সেন,

এম, ডি (হোমিও) এফ, আর এইচ, এস, ইউ, এস, এ।

অক্রূর সংবাদ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(বর্ণনা)

কৃষ্ণ বিরহের তাপে স্বর্ণকমলিনী।
শুকায়ে যাইতে যেন লাগিল আপনি॥
কপালে হানিয়া কর বলে সখীগণ।
শঙ্কট হইল রাখা রাধার জীবন॥
অন্ন জল নাহি খায় সদা ভাসে আঁখি।
কেবল কাঁদিয়া বলে কৃষ্ণ আন সখী॥
পলকবিহীন নেত্রে উর্দ্ধ পানে চায়।
কোথা কৃষ্ণ বলি পুনঃ লুটায় ধরায়॥
সখীরা রাধার ভাব হেরিয়া নয়নে।
নীরব হইয়া কাঁদে আপনার মনে॥
হেন কালে বৃন্দাদেবী আসি সেই স্থানে।
রাধার দশমী দশা হেরিয়া নয়নে॥
বক্ষে করাঘাত করি করে হায় হায়।
বলে বুঝি এইবার সকলি ফুরায়॥

মলিন কমলমুখে ঈষৎ হাসিয়া।
তখন বলিল রাই বৃন্দারে ডাকিয়া॥
এখন রেখেছি প্রাণ আশায় তাহার।
সে আমারে বলে গেছে আসিবে আবার॥
শত নিরাশার মাঝে এই আশা লয়ে।
রাখিয়াছি প্রাণ আমি দেহেতে ধরিয়ে॥
অচল টলিবে সখি সাগর শুখাবে।
তথাপি তাহার কথা মিথ্যা নাহি হবে॥
সে আমারে বলে গেছে আবার আসিবে।
নিকুঞ্জে বসিয়া পুনঃ বাঁশী বাজাইবে॥
(সখি) তার মত কৃপানিধি কে আছে কোথায়।
এক বিন্দু প্রেম পেলে সব ভুলে যায়॥
প্রেমের প্রদীপ জ্বালি আরতি করিয়া।
নিশ্চয় মথুরাবাসী রেখেছে ধরিয়া॥
তা' না হলে সে কি মোরে ভুলিবারে পারে।
আমার সর্ব্বস্ব আমি দিয়াছি যে তারে॥
সিদ্ধি ঋদ্ধি ষড়ৈশ্বর্য্য কতই আনিয়া।
আমার চরণতলে দিয়াছে ঢালিয়া॥
আমি ত কখন সখি নয়নের কোণে।
কৃষ্ণ বিনা দেখি নাই অন্য কোন ধনে॥
মোর অনুরোধে সখি যাও একবার।
নিবেদিতে দুটী কথা চরণে তাহার॥
বলিও তাহারে তুমি আমার হইয়া।
আমার দুর্ভাগ্যে সিন্ধু গেছে শুকাইয়া॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যাঁরে ধ্যানে নাহি পায়।
কোন্ গুণে গোপী আমি পাইব তাহায়॥

নিজ গুণে করুণাতে আপনি আসিয়া।
বাড়াইল মোর মান সবারে রাখিয়া॥
সাগর সঙ্গমে আমি বারি না পাইনু।
শ্যাম নবঘন হেরি তৃষ্ণায় মরিনু॥
বলিও তাহারে সখি মধুর বচনে।
রেখেছি জীবন শুধু শ্যাম দরশনে॥
একবার বলো তারে আসিয়া হেথায়।
তাহার জীবন যেন নিজে নিয়ে যায়॥
তার প্রাণে তার দেহ আমি কি করিব
আমার ইচ্ছায় কিছু করিতে নারিব॥
জোর করে বলিওনা কোন কথা তারে।
জোরের কেহই নয় জানি আমি তারে॥
ইচ্ছা যদি হয় তার আপনি আসিবে।
মথুরাতে শত বাধা রাখিতে নারিবে॥
মা যশোদা পিতা নন্দ আকুল হইল।
কিন্তু কৈ ধরিয়া কি রাখিতে পারিল॥
মায়ার অতীত কৃষ্ণ আমি জানি তারে।
মায়ায় ডুবায়ে সবে থাকে নির্ব্বিকারে॥
যাও সখি যাও তুমি মথুরা নগরে।
বলিও সকল কথা বুঝায়ে তাহারে॥

শ্রীরাধার উক্তি

(পদাবলী)

সখি কহিব কানু পায়।
সে সুখ সায়র দৈবে শুখাইল॥
পিয়াসে পরাণ যায়॥

সখি ধরিবি কানুর কর।
আপনা বলিয়া বোলন ত্যজিবি
মাগিয়া লইবি বর॥
সখি ছিল যত মনে সাধ।
শয়নে স্বপনে করিনু ভাবনা,
বিধি সে সাধিল বাদ॥
সখি অবলা বুঝিয়া হায়!
বিরহ আগুন, হৃদয়ে দ্বিগুণ,
সহনে নাহিক যায়॥
সখি বুঝিয়া কানুর মন,
চণ্ডীদাস কহে কহিবারে কথা
যেন আসিতে হয়গো মন॥

(ক্রমশঃ)

—০ঃ(*)ঃ০—

চাতক হও

এ সংসারে অনেক নদ-নদী, খাল বিল আছে; সে সকল জলে পরিপূর্ণ হইতে পারে। তাহাদিগের শীতল স্বাস্থ্যপ্রদ জল পান করিয়া কত পশু পাখীর প্রাণঘাতী তৃষ্ণা দূরীভূত হয়। তাহাদিগের জল কত জীবের না জীবনস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু চাতক তাহাদিগের বিমলতা, উপকারিতা ইত্যাদির দ্বারা প্রলোভিত বা মুগ্ধ হয় না। চাতক চায় বৃষ্টির বারিধারা পান করিতে, পতনশীল জলধারাই তাহার প্রিয় ও পেয়। যে জলধারা কখনও পৃথিবীর সংস্পর্শে আসে নাই, চাতক তাদৃশ বারিধারা কামনা করিয়া থাকে। তৃষ্ণায় তাহার ছাতি ফাটিয়া যাইবে, তথাপি সে আত্মবিস্মৃত হইবে না; সে কখনই নদ নদী, খালবিলের জল পান করিবে না। এ সংসারেও অনেক লোক আছেন, যাহাদিগের কোন মহৎ ও উচ্চ অভিলাষ নাই,

জীবনে একটা নির্দ্দিষ্ট আদর্শ নাই, গড্ডলিকা প্রবাহে গতানুগতিকের অনুসরণে তাহারা জীবন অতিবাহিত করিতে চান, জীবনকে উন্নত করা, তজ্জন্য পুরুষকার, অধ্যবসায় ইত্যাদি অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রম স্বীকার করা ও আপাতরমণীয় ভোগসুখে উদাসীন হইয়া মহৎ জীবনের জন্য আয়াসকে বরণ করিয়া লইতে অনিচ্ছুক, ঠাকুরের কথায় এইরূপ জনসাধারণকে " চিঁড়ের ফলার " বলা যাইতে পারে ; তাহাদের আঁট অর্থাৎ তেজ, ও মনের জোর নাই সুতরাং তাহারা কোন মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে না ; যাহাদিগের মহৎ উদ্দেশ্য বা কামনা নাই, তাহারা কিরূপে মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। সংসারে যাহারা মহৎ পদবী লাভ করিয়াছেন, তাহাদিগের সকলকে উদ্যম সাহস ও শ্রমশীলতাকে বরণ করিয়া লইতে হইয়াছিল, বিপদের ভ্রূভঙ্গে কখনই তাহাদিগের চিত্তবিকার বা চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয় না, কাপুরুষের মত দেহত্যাগের পূর্ব্বে কখনও তাহারা ভয়ে পুনঃপুনঃ মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করেন না। তাহাদিগের দৃষ্টি স্ব স্ব আদর্শের প্রতি স্থিরভাবে পতিত হইয়াছিল, আদর্শ ব্যতীত আর কিছুই তাহাদিগের মনঃপ্রাণ হরণ করিতে পারে নাই। যাহারা মহৎ জীবন লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদিগকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও আদর্শের একনিষ্ঠ ভক্ত হইতে হইবে। যাহারা নগণ্য অজ্ঞাত ও অধঃপতিত, তাহারাও যদি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, অধ্যবসায় ও আদর্শের প্রতি একান্ত অনুরাগ ও নিষ্ঠার আশ্রয় লন, তাহা হইলে কালে তাহারা মহৎ ও বরণীয় হইতে পারিবেন। উন্নতির মূল একনিষ্ঠা ; কর্ত্তব্যসাধন, উদ্দেশ্যসাধন, মহিমা অর্জ্জনের জন্য অনুকূল আপাতসুখভোগে আত্মবিস্মৃত না হওয়া, মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন ইহাই উন্নতির মূলমন্ত্র। শ্রেয়ঃসাধনে বহুবিঘ্ন, মঙ্গললাভের পথে বিপদ্ অনেক। কর্ম্মী তাহা জানেন এবং ঐ সকল বিপদ্‌কে বরণ করিতে তিনি সতত প্রস্তুত। উদ্দেশ্য লাভ হইল না বলিয়া উদ্দেশ্যের বিরোধী সুখসম্ভোগে কখনই তিনি নিরত হন না।

স্বামী বিবেকানন্দজী বহুকাল অবধি কঠোর সাধনায় নিরত থাকিয়াও যখন আপনার অভিলাষমত উন্নতি সাধন করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন, তখন তাহার কোন বিশিষ্ট বন্ধু তাঁহাকে সন্ন্যাসজীবন পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ প্রদান করিলে তিনি তাহার কথার উত্তরে বলেন, "রামের মত হইতে পারিলাম না বলিয়া কি শ্যামের মত হইতে হইবে। সন্ন্যাসের আদর্শ লাভ হইল না বলিয়া কি গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিতে হইবে ? " কখনই নয়। " বুদ্ধদেব যখন বহুকাল পর্য্যন্ত কঠোর সাধনা করিয়া

সত্যলাভ করিতে পারিলেন না, তখন তিনি বিপদের ভয়ে ভীত না হইয়া, সঙ্কল্প ত্যাগ না করিয়া বরং অধিকতর সাহস অবলম্বন পূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, আমার প্রাণ শুষ্ক হউক, আমার শরীর শুষ্ক হউক, মেরু ও গ্রহগণ স্থানচ্যুত হউক, তথাপি আমার সাধনা ও ধ্যান কিছুতেই ভগ্ন হইবে না। প্রকৃত সাধক যখন তাহার ইষ্টদেবতার দর্শন পান না, তখন তাহার প্রাণের মধ্যে ভগবদ্দর্শনের জন্য ভীষণ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। তিনি বলেন, হে ঈশ্বর, আমি তোমা ছাড়া কেমনে জীবন যাপন করিব? সংসারের সুখ যে আমার কাছে অসুখ স্বরূপ বোধ হয়, আমি যে আর বাঁচিনা; তুমি কৃপা করে একবার এসে আমার তাপিত হৃদয় জুড়াও। আমি যে তৃষিত নয়নে তোমার আশাপথ চেয়ে বসিয়া আছি; ইষ্টলাভ হইল না বলিয়া তিনি কখনই স্ব মত ও স্ব ভাব পরিত্যাগ করেন না। যাহার লক্ষ্য স্থির, যিনি প্রেমিক, তিনি বিষয়সুখকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন, তিনি পরমেশ্বরের আশাপথ পানে চাহিয়া জীবন যাপন করিতে অভিলাষী; বরং জীবন ব্যর্থ হইবে, উদ্দেশ্য কখনই সফল হইবে না, তথাপি বস্তন্তর সেবনে জীবনকে চরিতার্থ করিতে তিনি নিতান্ত নারাজ। যাহা অপরের (অপ্রেমিকের) নিকট অমানিশার মত অন্ধকারময়, তাহা প্রেমিকের কাছে চিরআলোকময়, ঈশ্বরের পথে ত্যাগ বৈরাগ্য তাহার পরম আদরের সামগ্রী, এখানে তিনি বিভীষিকা দেখেন না। যিনি একবার ভগবৎপ্রেম আস্বাদন করিয়াছেন, তিনি কি কখনও তাহা বিস্মৃত হইতে পারেন? সংসারের সুখভোগ তাহার নিকট উপাদেয় বোধ হইবে কেন? যিনি মিছরির সরবৎ পান করিয়াছেন, তিনি কি কখনও চিটেগুড়ের সরবৎ প্রার্থনা করেন? তিনি বলেন:—

কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব, তোমার রসাল নন্দনে।
কবে তাপিত এ তনু শীতল করিব, তোমার করুণা চন্দনে॥
কবে তোমাতে হয়ে যাব আমার আমি হারা
তোমার নাম নিতে নয়নে ববে ধারা
এ দেহ শিহরিবে ব্যাকুল হবে প্রাণ, বিপুল পুলক স্পন্দনে।
কবে ভবের সুখ দুখ চরণে দলিয়া
যাত্রা করিব গো শ্রীহরি বলিয়া
চরণ টলিবে না, হৃদয় গলিবে না, কাহারো আকুল ক্রন্দনে॥

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও তদনুরূপ চেষ্টা ব্যতীত কখনই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। মনমুখ এক না হইলে কখনই সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় না। যতক্ষণ না সর্ব্বতোভাবে আত্মনিবেদন করা যায়, ততক্ষণ পূর্ণভাবে তাঁহাকে জানা যায় না। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সকল সময় অনুরূপ।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন বিশ্বাস।

—০—

বিজয় কুমার

(দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

কয়েক বৎসর হইল রমানাথপুরের ক্ষুদ্র ইংরাজী বিদ্যালয়ে একটী অদ্ভুত ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে। ছাত্রটীর নাতিগৌর শ্যামকান্তি বদনমণ্ডলে বিনয়চ্ছবি সদা বিরাজিত থাকায় কি এক ত্রিদিবের শোভা ঢালিয়া দিয়াছে। দীর্ঘ নয়নযুগল কি এক ভাবনায় উদাসীন; প্রশান্ত ললাটাভ্যন্তরে যেন শত অমূল্য জ্ঞানরত্ন নিহিত রহিয়াছে। কেহ কোন বাক্যালাপ করিলে তাহার হৃদয় যেন প্রবল স্নেহতরঙ্গে উদ্বেলিত হইতে থাকে তাই সে তাহার মধুর বাক্যালাপে সহধ্যায়িগণের শ্রবণে সুধা ঢালিয়া দেয়। এইরূপ বিনয়ী ও সুশীল ছাত্রের সদ্গুণসৌরভে বিদ্যালয় ও পার্শ্বস্থ পল্লী আমোদিত। ছাত্র বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকের ও ছাত্রবৃন্দের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছে। বার্ষিক পরীক্ষায় প্রতিবৎসর সে শ্রেণীর সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া থাকে। শিক্ষকের উপদেশে সে সর্ব্বদাই অবহিত থাকে এবং প্রত্যহ যথাবিধি পাঠাভ্যাস করে কিন্তু বিদ্যালয়ে একটু সামান্য অবকাশ পাইলেই গবাক্ষের নিকট গিয়া ছল্ ছল্ নয়নে আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে; কিম্বা সমীপস্থ শস্যশ্যামল ক্ষেত্রে এবং তৎপার্শ্বস্থ আম্র নারিকেল, গুবাক বৃক্ষ শোভিত বিহঙ্গ কূজিত কাননের দিকে উজ্জ্বল নয়নের অনিমেষ দৃষ্টি প্রসার করিয়া থাকে। কোন নির্ধন গৃহস্থের পুত্র কেবল একখানি চাদর গায়ে দিয়া বিদ্যালয়ে আসিলে এই অভিনব ছাত্র তাহার নিকট গিয়া তাহার দুঃখ কাহিনী মন দিয়া শুনে এবং

ছুটীর সময় নিজের জামা ও জুতা গোপনে অকাতরে তাহাকে প্রদান করে। এইরূপ ঘটনা মধ্যে মধ্যে সংঘটিত হইতে থাকে কিন্তু তাহাতে তাহার অভিভাবক বিশেষ অসন্তুষ্ট কিম্বা বিরক্ত হয়েন না। কেন না, মা কমলার কৃপায় তাঁহার অবস্থা বেশ স্বচ্ছল; আর বালকটী তাঁহাদের বাটীর একমাত্র সন্তান—দয়া ও কোমলতার মানুষী প্রতিমূর্ত্তি।

একদিন বেলা দুই ঘটিকার সময় জলযোগের জন্য যখন ছাত্রগণের যথারীতি অর্দ্ধঘণ্টা অবকাশ দেওয়া হইল, তখন এই বালক একমনে কি ভাবিতে ভাবিতে মাঠের মধ্যস্থানে গিয়া পড়িল। তাহার সঙ্গে আরও দু'চারিটী সহপাঠী ছিল। তখন গ্রীষ্মকাল—প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে ধরিত্রী যেন অবসন্ন হইয়া নীরব ভাব ধারণ করিয়াছেন; মাঝে মাঝে দু একটী কর্কশ কা কা রবে যেন তাঁহার হা হুতাশ ধ্বনি প্রকটিত হইতেছে। বালকটী ক্ষেত্রের মধ্যস্থ এক বটবৃক্ষের ছায়ায় সঙ্গীদের গল্প শুনিতে শুনিতে অন্যমনস্ক হইয়া দেখিল যে একটী কঙ্কালসার বৃদ্ধা গাভী নিকটস্থ শুষ্কপ্রায় জলাশয়ে জলপান করিতে গিয়া কর্দ্দমে প্রোথিত হইয়া করুণ চীৎকার করিতেছে। তাহার কাতরধ্বনি বালকের কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র সে সঙ্গিগণের সহিত সত্বর তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে সাহসবচনে উৎসাহিত করতঃ প্রাণপণে বিপন্না গাভীকে উদ্ধার করিল এবং কতকগুলি বৃহৎ পত্রপুট নির্ম্মাণ করিয়া তদ্দ্বারা জল আনয়ন পূর্ব্বক গাভীকে যত্নের সহিত পান করাইল। নির্ব্বাক্ জীব নির্নিমেষ নয়নে বালকের দিকে চাহিয়া যেন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে লাগিল। এ করুণহৃদয় বালক কে, তাহা কি বলিতে হইবে? এই সেই দেব-অবতার বিজয়কুমার—অভাগিনী যোগমায়ার উষর জীবনে প্রস্ফুটিত, দিগন্তসুরভি একমাত্র চম্পক-কুসুম।

আজ কাল বিজয়কুমারের বয়স ষোড়শবর্ষ। শরতের অমল ধবল পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় সুগঠিত দেবদেহ বিজয় আজ রমানাথপুরের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের হৃদয়ে স্নেহ সুধাধারা ঢালিয়া দিতেছে। তাহার মাধুরী বিজড়িত বদনমণ্ডলে তেজ উদ্ভাসিত নয়নযুগল দেখিলে মনে হয় যেন জ্ঞানরবি অন্তরে সমুদিত হইয়া নেত্রপথে নিজরশ্মি বিকীর্ণ করিতেছে। আর চিরহাস্যবিজড়িত অধরের মধুর আলাপন শুনিলে মনে হয়—যেন হৃদয়তটে প্রেম প্রস্রবণ ফুটিয়া উঠিয়া স্নেহশীকরে পল্লীবাসিজীবন শীতল করিতে অধরপথে ছুটিতেছে। বিজয়কে দেখিলে প্রতিবেশীরা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া

পড়ে ; তাহারা নিজ নিজ কর্ম্ম ভুলিয়া যায় এবং অযাচিতভাবে তাহার সহিত আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হয়। বিজয়ের সুধাবাণী শুনিলে তাহারা আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করে, তাহাকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত তাহাদের হৃদয় যেন আবেগে প্রসারিত হইতে থাকে। সকলেই যেন তাহার সুখে সুখী ; তাহার দুঃখে দুঃখী—সে যেন সকলের আনন্দদুলাল, সকলেরই সুখদর্শন শরৎশশী।

এ বৎসর বিজয়কুমার রমানাথপুরের স্কুল হইতে মধ্য ইংরাজী পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে। তখন নিকটস্থ গ্রামে কোন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল না। শ্যামধন বাবু প্রিয়তম ভাগিনেয়ের উচ্চ শিক্ষার জন্য চিন্তিত হইলেন। গৃহের একমাত্র আদরের ধন, বালবিধবা ভগিনীর একমাত্র জীবননিধিকে উচ্চ শিক্ষার জন্য দূরদেশে রাখিতে কাহারও ইচ্ছা নাই। বিশেষতঃ চাকুরী করিবার জন্য তাহাকে লেখাপড়া শিখাইবার প্রয়োজন নাই। ভগবৎকৃপায় নিঃসন্তান শ্যামধন বাবুর বিপুল সম্পত্তিতে তাহার কয়েক পুরুষ নির্ব্বিবাদে চলিতে পারে। আর এক কথা ছেলেটী এক অপূর্ব্ব ভাবের—যেন কি এক অপার্থিব মোহে সর্ব্বদাই বিভোর, যেন কি এক প্রেমানন্দে মুখপদ্ম সদাই বিকশিত, যেন কি এক সুখস্বপ্ন চক্ষুতে নিয়তই বিজড়িত। এ হেন দেবশিশুকে ছাড়িয়া থাকিতে কোন পাষাণ-হৃদয় বিগলিত না হয়? শ্যামধন বাবু স্থির করিলেন যে নিজের বাটীতে একজন উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিবেন, এবং যাহাতে বিজয়কুমারের প্রাইভেট প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়া হইতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন।

একদিন গ্রামের কোন প্রধান ধার্ম্মিক ব্যক্তির নিকট হইতে বিজয় শুনিল যে শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দনিঃসৃত সুধাধারা শ্রীমদ্‌ভাগবদ্‌গীতা সকল ধর্ম্মশাস্ত্রসার ও সমগ্র জ্ঞানের আকর। একমাত্র গীতাশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিলাভ করিলে হিন্দু ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বসকল উপলব্ধি করা যায়। ইহা শুনিয়া বিজয় একখানি গীতা সংগ্রহ করিয়াছে, এবং বাহিরে পাঠাগারে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে তাহা অধ্যয়ন করিতেছে। সংস্কৃত ভাষা জানা নাই—তথাপি বঙ্গানুবাদ পাঠে তাহার অপার আনন্দ। আশে পাশে কেহ আছে কি না তাহা লক্ষ্য নাই। পুস্তকখানির কিছু দূর পাঠ করিয়া এমন ভাবসমুদ্রে নিমগ্ন যে যেন বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত। বিস্ফারিত নয়নযুগল হইতে বারিধারা দরদর প্রবাহিত হইতেছে—মৃদু তপনতাপেই তুষার স্তূপ বিগলিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, কত বিশুষ্ক প্রান্তর নবীন জলস্রোতে সরস হইবে। হৃদয়

অভিষিক্ত করিয়া অশ্রুধারা ক্রোড়স্থ পুস্তকপত্র আর্দ্র করিল। সে হৃষিকেশের মহামূল্য উপদেশরাজি চিন্তনে আত্মহারা; তাঁহারই রাজীব চরণ কান্তিতে যেন ভক্তের হৃদয় কানন উদ্ভাসিত। নেত্রনীর যেন সেই রাতুল চরণযুগলকে অভিষিক্ত করিতে ছুটিতেছে।

অন্য দিনের ন্যায় জয়ন্তী আজও জানালার ধারে তাহার ছোট ছোট সহোদরের সহিত খেলা করিতেছে। তাহার মাতাপিতা ও পল্লীস্থ সকল লোক যেমন সর্ব্বগুণাধার বিজয়কে ভালবাসে, সেও তেমনি তাহার বিজয় দাদাকে ভালবাসে, তাহার কথা শুনিতে ভালবাসে, তাহার মধুর হাসি দেখিলে সব ভুলিয়া যায়। বিজয় যখন কোন পুস্তক আগ্রহের সহিত পড়ে, তখন সে তাহার অলক্ষিতে বাতায়নের ধারে দাঁড়াইয়া পাঠকালীন তাহার অধরৌষ্ঠ প্রকম্পন একচিত্তে লক্ষ্য করে। বিজয় যদি কোন কিছু সামান্য আদেশ করে, সে তাহা তৎক্ষণাৎ পালন করিয়া আনন্দ উপভোগ করে; বিজয় যদি কখনও বলে "দেখি জয়ন্তী, কেমন বকুল ফুলের মালা গেঁথেছ" অমনি সে হৃদয়ের যাবতীয় আবেগ উৎসাহ যেন মালাটীর সহিত সংজড়িত করিয়া বিজয়ের হস্তে অর্পণ করে এবং তাহার দাদা কি বলে শুনিবার জন্য তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। সৌম্যবদন বিনয়ভূষণ বিজয়ের নিকট সুকোমলা সরলা জয়ন্তীকে বেশ মানাইত। নয়নরঞ্জন শ্যামতমাল শিশুর নিকট মনোহারিণী কচি কনকলতাটীকে বেশ দেখাইত; তাই বুঝি নটশঠ সমীরণ সুবিধা পাইলেই উভয়েরই কোমল কিশলয় উভয়ের দিকে আন্দোলিত করিতে চেষ্টা পাইত। আজকাল জয়ন্তী পূর্ব্বাপেক্ষা একটু বড় হইয়াছে। তাহার চক্ষুঃপ্রান্তে মাঝে মাঝে মধুর সরমছায়া প্রকাশ পায়, আবার মাঝে মাঝে বালিকাসুলভ অনিন্দ্যহাস্যবিভা ফুটিয়া উঠে। নেত্রানন্দদায়িনী দেহলতা পরিপুষ্টা হইতে চলিতেছে। মুখপদ্মে নবীন রাগ প্রতিভাত হইয়াছে, সেই রাগ বুঝি এইবার অধরপলাশপথে অন্তরে প্রবেশ করিয়া হৃদয় কমলকোরক নির্ম্মাণ করিতে চেষ্টা করিবে।

অন্য দিনের ন্যায় আজও জয়ন্তী বিজয়ের পাঠাভিনিবেশ লক্ষ্য করিতেছে। কিন্তু আজ সে বিজয়ের অপূর্ব্ব ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছে। সে বহুক্ষণ জানালার ধারে দাঁড়াইয়া আছে, তথাপি তাহার দাদা তাহার দিকে চাহিতেছে না; সে দেখিল তাহার দাদার নিমীলিত চক্ষু দিয়া অনবরত অশ্রুধারা প্রবাহিত হইয়া

বক্ষঃদেশ আর্দ্রকরতঃ ক্রোড়দেশে স্থাপিত একখানি পুস্তককে আর্দ্র করিতেছে। সে ইতিপূর্ব্বে বিজয়কে এরূপ ভাবে কখনও কাঁদিতে দেখে নাই। তাহার সুকোমল শিশুহৃদয় বিজয়ের এই ভাবান্তর দেখিয়া স্বতঃই গলিয়া গেল, সে আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া বাষ্পাকুল নয়নে উচ্চে বলিয়া ফেলিল "দাদা, তুমি কাঁদছ কেন, তোমার কি হয়েছে।" দাদা তবুও নীরব ও নিমীলিত আঁখি। জয়ন্তী আবার অধিক উচ্চে ডাকিল, এবার বিজয়ের সমাধি ভঙ্গ হইল। চক্ষু চাহিয়াই সম্মুখে দেখিল—নয়নাসারধৌত মুখশোভা সরলতার প্রতিমূর্ত্তি জয়ন্তী। ঈষৎ বিক্ষুব্ধ হইয়া বলিয়া ফেলিল "ছিঃ জয়ন্তী, কেন তুমি এখন ডাক্‌লে, এমন শান্তির স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিলে।" জয়ন্তী উত্তর করিল "তুমি বড় কাঁদ্‌ছিলে তোমার কান্নায় বইয়ের পাতা ভিজে যাচ্ছিল, তাই আমি তোমায় ডেকে দিলুম।" পরে দুঃখ ও অভিমানভরে বলিয়া ফেলিল "দাদা! আমার উপর তুমি কখনও রাগ করনি, এবার রাগ করলে; তোমাকে দেখতে ইচ্ছা করে বলে মাঝে মাঝে আসি, আচ্ছা আর কখনও আসব না।" এই বলিয়া তাহার সহোদর দুটীর সহিত জয়ন্তী শীঘ্রই সেই স্থান ছাড়িয়া দ্রুতগমনে চলিয়া গেল। বিজয়কুমার জয়ন্তীর সকল কথা শুনিতে পাইল না; তখনও তাহার তন্দ্রা ভাঙ্গে নাই, তখনও তাহার নেত্রপথে আবেশ জাল জড়িত রহিয়াছে। "জয়ন্তী, জয়ন্তী, শুনে যাও, আমি রাগ করিনি" এই বলিতে বলিতে বিজয়কুমারের জলভরা আঁখি ক্রমশঃ বিস্ফারিত হইয়া জয়ন্তীর অনুধাবন করিতে করিতে অদূরস্থ নীল পাদপচুম্বিত নীলাকাশে নিবদ্ধ হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

পরিব্রাজক।



বাসনার পাত্র।

হে বন্ধো!

তোমার সন্ধানে ফিরি কত দেশে দেশে,
কত কাল কত যুগ ধরি বরষে বরষে।
কত ভাবে কত করি প্রাণ দিনু ডালি,
তোমার দানের পাত্র হয় না যে খালি।
ব'লেছিলে একদিন গোপনে গো মোরে,
দেখা হবে মোর সাথে মরণের পারে।
মূর্খ আমি ভুল করি পাত্র বাসনার,
দান বলি লইনু তা' অপরাধ কার।
তোমার নয় হে তাহা, নয় হে তোমার,
যত কিছু অপরাধ সকলি আমার।
বলেছিলে তুমি সখা 'চাহ কোন দান,'
সব কিছু পাছে ফেলে মাগিনু এ দান।
বিদায় লইনু আমি নয়নের জলে,
বার বার মুছে ফেলি মোছে না মুছিলে।
তারপর দুজনার সেই সে বিচ্ছেদ,
দেখা আর হ'লো নাকো করে মর্ম্মভেদ।
আজ তাই বুঝিয়াছি তোমা পেতে হ'লে,
চূর্ণ করি দিতে হবে পাত্র পদে ঠেলে।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার ঘোষ।

—:০:—

পুস্তকপরিচয়

হিন্দি শিক্ষক :—শ্রীদীনবন্ধু আচার্য্য বেদশাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রণীত। ২১৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ বুক এক্সচেঞ্জ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ।।০ আট আনা।

হিন্দিকে ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভারতের শিক্ষিত, অর্দ্ধ শিক্ষিত, অশিক্ষিত নর-নারীর সহিত ভাবের আদান প্রদান করিতে হইলে হিন্দি-ভাষা ছাড়া আর গতি নাই। ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা ভারতের জনসাধারণের কর্ণে পৌঁছে না। বাঙ্গালা ভাষায় অনভিজ্ঞ শিক্ষকের নিকট হিন্দী শিক্ষার্থী বাঙ্গালী অনেক অসুবিধা ভোগ করেন। উক্ত অভাব দূরীকরণার্থ হিন্দী শিক্ষার্থী বাঙ্গালীর জন্য সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্যভাবে সংক্ষেপে উক্ত পুস্তকখানি হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষায় সুপণ্ডিত বেদশাস্ত্রী মহাশয় রচনা করিয়াছেন। ব্যাকরণের মোটামুটী সকল নিয়মই ইহাতে লিখিত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস ইহার সাহায্যে শিক্ষার্থিগণ অতি অল্প সময়ের মধ্যে ও অতি অল্প পরিশ্রমেই হিন্দী ভাষায় মোটামুটী জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন।

রস চিকিৎসা, প্রথম খণ্ড—কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল রাজবৈদ্য কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায় এম, এ, জ্যোতির্ভূষণ, ভিষগাচার্য্য প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—১৭২ নং বৌ বাজার ষ্ট্রীট, রাজবৈদ্য আয়ুর্ব্বেদ ভবন ও কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয় সমূহ। মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা।

রসচিকিৎসা ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের অন্যতম অঙ্গ। বৈদিক যুগ হইতে রসচিকিৎসা ভারতবর্ষে চলিয়া আসিতেছে। বৌদ্ধ যুগে ইহা উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ হইতে ইহা আরব, রোম, গ্রীস ইত্যাদি স্থানে প্রচলিত হয়। বৌদ্ধ জ্ঞান বিজ্ঞানের অবনতির সঙ্গে হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের যৎপরোনাস্তি অবনতি ঘটিয়াছে। সুখের বিষয় বর্ত্তমান কালে আয়ুর্ব্বেদের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি দিন দিন অধিকমাত্রায় নিপতিত হইতেছে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় যথাসময়ে রসচিকিৎসা সম্বন্ধীয় এতাদৃশ চিকিৎসাগ্রন্থ বাহির হইয়াছে। ইহাতে যাবতীয়

রস, উপরস, ধাতু, উপধাতু, রত্ন, উপরত্ন, বিষ, উপবিষ প্রভৃতির বিশদ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। পারদ ভস্ম, হরিতাল ভস্ম, স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, অগ্নিযোগ বিনা স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, পিতল, কাংশ, বঙ্গ, দস্তা প্রভৃতি ধাতু সকলের নিরুত্থ ভস্ম প্রস্তুত প্রণালী, রসশাস্ত্রের প্রকৃষ্ট পরিচয়, পারদের অষ্টাদশ সংস্কার ও রসশালার উপকরণাদির বিশদ ব্যাখ্যা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা পাঠে চিকিৎসক, চিকিৎসার্থী ও শিক্ষার্থী সকলেই উপকৃত হইবেন।

দম্পতি জীবন—কবিরাজ শ্রীদ্বারকানাথ সেন, কাব্য ব্যাকরণ তর্কতীর্থ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীভূজঙ্গ ভূষণ মজুমদার বি, এ, গয়ানাথ ঔষধালয় ১৬।১এ বিডন ষ্ট্রীট কলিকাতা, মূল্য ৷৷৹ বার আনা।

বর্ত্তমান কালে ইংরাজী শিক্ষা ও বিদেশী প্রণালীতে শিক্ষার বহুল প্রচলনহেতু শাস্ত্রের যথাযথ অনুশীলনের অভাব হওয়ায় দাম্পত্য বিষয়ের শাস্ত্রসম্মত উপদেশ পাওয়া বিশেষ কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। বাল্যকালে জাতীয় ভাবসঙ্গত ধর্ম্মসম্মত মনুষ্যত্ব গঠনোপযোগী সংশিক্ষার অভাবহেতু সমাজের অত্যাবশ্যক জ্ঞাতব্য দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার অভাব নিবন্ধন সমাজ দিন দিন অবনতির পথে ধ্বংসের করালকবলে নিপতিত হইতেছে। হিন্দুর বিবাহ একটী ধর্ম্মসংস্কার, হিন্দুর গার্হস্থ্য জীবন উন্নতির একটী সোপান, ইহা ভোগবিলাস সাধনার অবসর নয়। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে এ বিষয়ে অনেকে অজ্ঞ। অনেকের নিকট শাস্ত্রানুমোদিত দাম্পত্য জীবনকথা নিরর্থক ও হাস্যোদ্দীপক বলিয়া বিবেচিত। শাস্ত্রসম্মত উপদেশের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিবাহ হইতে আরম্ভ করিয়া সন্তান পালন পর্য্যন্ত দাম্পত্য জীবনের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ "দম্পতিজীবন"এ সুচারুরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বিদেশী শিক্ষা ও সভ্যতার চাকচিক্যে আত্মবিস্মৃত সমাজ ইহা পাঠ করিলে বিশেষ লাভবান্ হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

সাধনা ও পরমানন্দ—শ্রীদেবেন্দ্র মোহন চক্রবর্ত্তী প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান গ্রন্থকারের নিকট, ৫৩বি, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা ও কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান পুস্তকালয় সমূহ। গ্রন্থকারের বক্তব্য, অন্তরে ব্যাকুল পিপাসা ও বৈরাগ্য জাগ্রত হইলে শরীর ও মন সুসংযত হইলে প্রেম ও নিষ্কাম কর্ম্মের সাহায্যে মানুষ সমাধি ও ব্রহ্মানন্দ লাভের অধিকারী হইয়া থাকে। সমাধি সুখ ও ব্রহ্মানন্দলাভ

করিতে বিশিষ্ট কোন সাম্প্রদায়িক মতের পোষণ বা প্রচার আবশ্যক করে না, তাহার জন্য লোকদেখান বেশভূষার পরিবর্ত্তনের আবশ্যক করে না। ধর্ম্মোপলব্ধি অন্তরের বিষয়। ইহার সহিত বাহ্যব্যাপারের সম্বন্ধ অতি সামান্য। মন্দির, গির্জ্জা, মসজিদ, তীর্থযাত্রা, ব্রতোপবাস এ গুলি ধর্ম্মোপলব্ধির পথে গৌণ সহায় মাত্র। মানুষের আরাধ্য দেবতা, সাধনার দুর্লভ সামগ্রী তাহার অন্তরে চির বিরাজমান। তাহাকে লাভ করাই আছে। পরমতত্ত্ব পরমপুরুষের সহিত দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট জীবের নিত্যসম্বন্ধ নির্ণয়—নির্ণীত নিত্যযোগে প্রথমতঃ বুদ্ধি স্থাপন করতঃ যোগারূঢ় হওয়ায়—আরূঢ় হইয়া পরমতত্ত্বের নিকট হইতে নিকটতর হওয়া, পরিশেষে জীবাভিমান পরিহার করিয়া ঐ পরম সত্যে ঐক্যপ্রাপ্তি; ইহাই শ্রেষ্ঠ যোগ; ইহাই সাধনা ও পরমানন্দ।

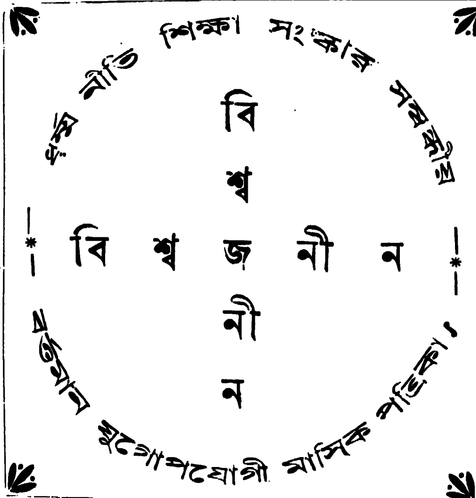
সংঘ ও বার্ত্তা

১। তত্ত্বমসি মিশন পরিচালিত অবৈতনিক "শ্রীরামকৃষ্ণ চতুষ্পাঠীর তত্ত্বাবধানে যাহারা ব্যাকরণ, কাব্য স্মৃতি, সাংখ্য, বেদান্ত, বেদ প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা সত্বর আসিয়া উক্ত মঠের সম্পাদক বা উক্ত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন। এতদুদ্দেশ্যে আমরা সকল শ্রেণীর বিদ্যার্থীকে সাদরে আহ্বান করিতেছি। বিদ্যার্থিগণ ইচ্ছা করিলে কলিকাতার সংস্কৃত এসোশিয়েশন বা অন্যত্র উপাধি পর্য্যন্ত পরীক্ষা দিতে পারিবেন।

২। তত্ত্বমসি মিশনে সুযোগ্য চিকিৎসকগণের দ্বারা বিনামূল্যে চিকিৎসা করা ও ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

কর্ম্মী
তাঁকে লাভ করেন, তাঁর ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য নীরব কর্ম্মপ্রেরণা দ্বারা।

জ্ঞানী
তাঁকে লাভ করেন, তাঁর দ্বন্দ্বাতীত সর্ব্বাত্মময় আত্মজ্ঞান দ্বারা।



ভক্ত
তাঁকে লাভ করেন, তাঁর অহৈতুকী বিশুদ্ধা ভক্তির দ্বারা।

যোগী
তাঁকে লাভ করেন, তাঁর চিত্তবৃত্তিনিরোধকারী নির্ব্বিকল্প সমাধি দ্বারা।

বিশ্বজনীন কার্য্যালয় ৩২।১ রাজা দিনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

'Phone B. Z. 2812 Viswajanin. Reg. No. C 1835.

Printed and published By Swami Nirvanananda, at the Viswajanin Press, 32-1 Raja Dinendra Street Calcutta.